প্র থ ম প্র কা শ

আশ্বিন ঃ ১৩৬০

দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র পান কর্তৃক নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

4627

শান্তিনিকেতন আশ্রমের
পরলোকগত কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের
স্মরণে

নিবেদন

এই গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের পূর্ব-ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিপত্র যা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, বহু ঘটনা ও বিবরণ, যা বিস্মৃতপ্রায়, তা এতে সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলি নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকগণের সহৃদয়তা ভুলবার নয়।

এই সকল চিঠিপত্র নিজ সংগ্রহ থেকে যাঁরা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই উপলক্ষ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে চিঠিগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল।

আমার ভগিনী শ্রীমতী সাধনা করের রচনার অনেক অংশ ও ভ্রাতা শ্রীমান সুশীলচন্দ্র করের একটি রচনা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের কাছ থেকেও এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতন
মহালয়া ১৩৬০

সূচী

"হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময় তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।"

—রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ১০

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

মনুষ্যত্বের আদর্শ বা লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট আছে। কী বিশদ্ উপায়ে নানা সময়ে নানা স্তর-অনুযায়ী পাঠ ও আচরণের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌছানো যায়, মানুষ-গড়ার সেই শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধেও লেখায় বক্তৃতায় অনেক কথা অনেক সময় তিনি বলেছেন। সেগুলি থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার দান ও সাধনার বৈশিষ্ট্য জানা যায়। সেগুলি তত্বকথার অন্তর্গত। বর্তমান আলোচনার বিষয় কয়েকটি বাস্তব ঘটনা, যে উপলক্ষে কবির কাছ থেকে ছাত্রশিক্ষা এবং জনশিক্ষারও কিছু কিছু সমস্যা এবং সমাধান-পথের নির্দেশ মেলে। ঘটনাগুলি বলতে গিয়ে মতের কথা যেটুকু বলতে হয় ততটুকু বলা হয়েছে। মোটামুটি কাল-পারম্পর্য রক্ষা করেই আলোচনা-ধারা অনুসৃত।

মনুষ্যত্বের পরিপন্থী বিজাতীয় শিক্ষার উদাহরণস্থলে কবি বলেছেন—"আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালক-বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে,...আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েক জন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে—Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming. বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে? এদের বাপ-মা এদেরকে স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে।" শিক্ষায় এ এক রকমের বিপদ, আরেক রকমের বিপদ—স্থলবিশেষে পারিবারিক কু-পরিবেশ। কবির মত হচ্ছে,—"ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।" (১৩১৩)

কবি কাল্পনিক মত নিয়ে বসে থাকেননি। তিনি এরকম একটি শিক্ষার জায়গা গড়ে তুলেছিলেন। ১৩১৮ সালে 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে কবি বলছেন. "শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশ বর্ষ জড়িত হইয়াছে।" এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে কবির

'ধর্মশিক্ষা' প্রসঙ্গে। এই সেই জায়গা, "যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-জীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ-বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবল মাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গল-কর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্ক-সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ-সংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবল মাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্ব-গৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালক-বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের ও চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।" (১৩১৮)

১৩১৯ সনে বিদেশ ভ্রমণকালে কবি তথাকার শিক্ষালয়গুলি পরিদর্শন ক'রে শিক্ষাবিধির অভিজ্ঞতা নিয়ে চ্যালফোর্ড থেকে লিখছেন,—"যেমন করিয়া হোক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।......স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ

শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" এই সঙ্গেই অতঃপর তিনি বলছেন,—"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকেই চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।" কবি-উল্লিখিত এ গুরু শুধু পাঠ্যবিষয়ের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নন, তিনি হবেন মনুষ্যত্ব-আদর্শেরও গুরু, ছাত্রদের মনের মানুষ।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা শিক্ষক-ছাত্রের বনিবনাও নিয়ে। ছাত্রবিদ্রোহ অনেকস্থলে ঘটে থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে একবার একজন য়ুরোপীয় অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। "জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক (ওটেন সাহেব) ছাত্রদের ক্লাসে ভারতীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো অপমানসূচক কথা বলেন, ছাত্রেরা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে ও তাঁহাকে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য বলে। অধ্যাপক তাহা না করায়, সিঁড়ির পথে নামিবার সময় কয়েক জন ছাত্র মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। এই লইয়া কলিকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।"—(রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় সং, ১ম খণ্ড) এ ঘটনায় ছাত্রাবস্থার সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) ছিলেন অগ্রণী। জাতীয়তাবোধের অগ্নিতেজ তাঁকে এতই উদ্দীপ্ত করেছিল। পরিণত বয়সের বিরাট আন্দোলনের স্রষ্টা নেতাজীর আত্মপ্রকাশের বিশেষ ভূমিকা ছিল এই ছোটো ঘটনাটি। দেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন এ ব্যাপারে নাড়া দিয়েছিল। ছাত্রদের কড়া শাসন করবার প্রস্তাব করেন কোনো মিশনরি কলেজের কর্তা। "বিচার-সভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন।" এ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য

করতে গিয়ে কবি বলেন—"ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধি কাল।···এই সময়েই অল্প মাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে, এবং আভাস-মাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংশ্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়। এই বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রেরা মাঝে মাঝে এক একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেন না তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।" অনেক সময় নানা দিক দিয়ে শিক্ষকের অতিমাত্র উচ্চতাবোধের বিকৃত মনোবৃত্তি ও আচরণ ছেলেদের আত্মমর্যাদা-বোধকে আহত করে; ক্রমে তাই থেকে জাগে বিদ্বেষ-বিরোধ। কবির বিশ্লেষণে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরোধসৃষ্টির মূলে ছিল ইংরেজ শিক্ষকের জাতি-গরিমা। শিক্ষকের মনের মধ্যে এই উচ্চতাবোধটি মূলগত থাকায় শিক্ষক ছাত্রদের কাছে টানতে পারেননি; ছেলেরাও প্রতিক্রিয়ায় উগ্র হয়ে উঠেছিল। এই উচ্চ মনোভাব নিয়ে কেমন করে শিক্ষক দূরে সরে যান এবং তাঁরা সে থেকে কী বিপত্তি ঘটান, অন্যপক্ষে আভাসমাত্র প্রীতি দিয়ে যে কেমন করে অনেক শিক্ষক ছেলেদের মন কেড়ে নিয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হন, ছেলেদেরও জীবন তাঁরা তাতে সুধাময় করে তোলেন, তার দু'টি পরস্পরবিরুদ্ধ উদাহরণস্থলে কবি তাঁর নিজের আশ্রমের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,—এক সময় একজন ইংরেজ শিক্ষক সেখানে ছিলেন, "তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন।" ছেলেরা "তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল।" হেডমাস্টারের শাসনেও কোনো কাজ দেয়নি, শেষে সেই শিক্ষককেই ছাড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু কবি পরে আবার দু'জন ইংরেজ শিক্ষক পান, যাঁদের পেয়ে তিনি বলেছেন, "আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে।" নাম ধ'রে নির্দিষ্ট করা না থাকলেও বুঝতে বাধা হয় না যে, এ দু'য়ের এক জন পিয়ার্সন, অন্য জন এণ্ড্রুজ। (১৩২২)

"শিক্ষাবিধি" রচনায় কবি ১৩১৯ সনে বলেছেন: "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষনের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না!" চব্বিশ বৎসর পরেও "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধে কবি যে মত ব্যক্ত করেন, তাতেও শিক্ষার প্রধান মাধ্যস্থ বলে নির্দেশ করেছেন আত্মীয়-ভাবকেই।

"গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পর-সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ বলে জেনেছি।...যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।... যিনি জাতশিক্ষক, ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোন দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব ব'লে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' তবে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না।" (১৯৩৬)

ছাত্রদের বয়সের দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে ব্যবহারে ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে যেমন শিক্ষককে তাদের অন্তর স্পর্শ করে চলতে হয়, পড়াশুনার দিক দিয়েও ছাত্রদের মনোবিকাশের ছন্দ লক্ষ্য ক'রে শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া দরকার। যে শিক্ষক সে-ছন্দ ধরতে পারেন না, তাঁরও শিক্ষাদানে ঘটে আরেক রকম অনর্থ। স্থলবিশেষে শিক্ষকের অবিবেচনাপ্রসূত রূঢ়তা ছাত্রদের ক্ষিপ্ত করে দেয়। ব্যক্তির প্রতি বিমুখতা থেকে সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত শিক্ষা এবং সব-কিছুর উপরই ডেকে আনে ছাত্রদের বিতৃষ্ণা। তাদের "মানসিক জোয়ার-ভাঁটা"র নিয়ম না ধ'রে বাঁধা-ধরা ভাবে সকলকে পাইকারী হারে এক শিক্ষা দিয়ে গেলে

শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থী-চিত্তে জন্মায় অসাড়তা। শিক্ষা সবটাই হয় ব্যর্থ। "মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনা বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে।" কবি তাঁর আশ্রমের শিক্ষকদের নিয়ে এই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার চর্চা করেছিলেন ; পরে লক্ষ্য করেন, বিলাতেও সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ চলছে। কবি লিখেছেন,—"ছেলেদের পক্ষে এগার বছর বয়সটি এঁদের মতে বুদ্ধিবিকাশের বিশেষ প্রতিকূল সময়। মেয়েদের পক্ষে জাতি বা দেশ অনুসারে এই বয়সটি বারো, তেরো বা চৌদ্দ।" ঋতু অনুসারে দেহের সঙ্গে মনেরও তারতম্য ঘটে। কবির আশ্রমে ঋতু-উৎসবগুলিও শিক্ষাধারার একটি বিশেষ অঙ্গ ব'লে পরিগণিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আশ্রমের হাসপাতালে সপ্তাহে প্রতি বুধবার নিয়মিতভাবে ছেলেদের ওজন নেওয়া হয়। "বিশেষকালে মনোবৃত্তির বিশেষ একটা শক্তি খর্ব হয়ে বিশেষ অন্য কোন শক্তির বলবৃদ্ধি হয় কি না তা হিসেব করে দেখা"র কথা কবি বলেছেন। কবি আরো বলেন,—"কী জানি সাহিত্যশিক্ষা, গণিতশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ বিশেষ চাতুর্মাস্য আছে কি না—একই ঋতুতে একসঙ্গে নানা বিচিত্র বিষয় শিক্ষা মনের পক্ষে অজীর্ণজনক ও ক্লান্তিকর কি না তা ভেবে দেখা দরকার।" একই দিনে ঘণ্টাক্রমে পর-পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পঠনপ্রণালীর সার্থকতা সম্বন্ধেও কবি সন্দিহান। কবি বলেন,—"একই বিষয়ের বিচিত্র দিক আছে,—সাহিত্যের গদ্য আছে, পদ্য আছে, প্রবন্ধ রচনা আছে, আবৃত্তি আছে, তাছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসকেও এক শ্রেণীভুক্ত করে রাখা চলে। এমনি করেই বৈচিত্র্যের দ্বারা, মনকে পূর্ণ করা সম্ভব।" অর্থাৎ কবি কতকটা এ স্থলে, এক-এক দিন, এক একটি মাত্র বিষয়চর্চার পক্ষপাতী। বিচিত্র ভাগে তিনি শুধু তারই অনুশীলন ক'রে দেখবার প্রস্তাব তুলেছেন। এক দিনে একাধিক বিষয় না পড়ানোই শ্রেয়। এটি প্রচলিত ধারার থেকে খুবই একটি অভিনব পন্থার ইঙ্গিত। এইগুলি শিক্ষার খুঁটিনাটি বিস্তারিত কার্যক্রমের দিক। (১৩২৬)

শিক্ষার্থীকে বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরবশ ক'রে তোলে, এমন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সাবধান করতে গিয়ে কবি নিজের বালক কালের ইংরেজি শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। তৎকালে জনৈক ইংরেজি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি "ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে পয়লা দোসরা তেসরা শ্রেণীবিভাগ করে একটা ফর্দ লিখিয়ে দিয়ে তাই তাদের মুখস্থ" করান। তাতে যে বিদ্যা হয়, কবি বলেন "নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না।" অথচ এদিকে আবার "এই ভরসা না থাকিলে কৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।" "এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি কাটিবে!" স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির বিকাশই কবির শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম লক্ষ্য। (:৩২৬)

পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যা যেমন একদিকে ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি পরমুখাপেক্ষী জ্ঞানও সমানই ত্রুটিপূর্ণ। এলাহাবাদের ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোন ছাত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় River শব্দের সংজ্ঞা। বালকটি নির্ভুল উত্তর দেয়, কিন্তু সে নদী দেখেছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গা-যমুনার তীরবাসী হয়েও সে জানায়, নদী সে দেখেনি। এ ঘটনাটি ধরে কবি বলেন, এরূপ একপেশে পুঁথিগত শিক্ষা সত্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। এর ফল দাঁড়ায় কূপমণ্ডুকতা। এই একপেশে প্রণালীর শিক্ষা থেকে শেষে এও দেখা যায়,—নিজের দেশকে এক-পেশে জ্ঞানে অন্ধভক্তিতে খুব মহৎ বা অজ্ঞানজাত অবজ্ঞায় তুচ্ছ করে জেনে শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্মেছে তার সম্বন্ধে আত্যন্তিক অভিমান বা অবহেলা। পুঁথি-গত দূরের জিনিসের জ্ঞান দরকার, কিন্তু কাছের জিনিসেরও পরিচয় সম্যক্‌রূপে না হ'লে কোনো জ্ঞানই সহজ ও সুগম হয় না। এই আলোচনাক্রমেই কবি বলেন, "আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে।… ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।…সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না।… ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ

জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য-সাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে।" ১৩২৬ সালের এই মন্তব্যটির মধ্যে কবির বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষটি মেলে। এখানে পূর্বোক্ত একটি কথা মনে পড়ে, ১৩১৯ সালে বিদেশ থেকে কবি লিখেছিলেন,—"যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।" তা থেকে বোঝা যায়, এই বিদ্যাসমবায় তথা বিশ্বভারতীর প্রেরণা কবির মনে বহু পূর্ব থেকেই দেখা দিয়েছিল। ১৯২১ সনের ১৫ই আগস্ট "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে কবি তাঁর এই বিদ্যাসমবায়ের পরিণত ধারাটিকেই ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে তৎসম্পর্কিত কাজের ভূমিকায় আহ্বান জানান। ঐ বছরই ৮ই পৌষ ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়"টি "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে।

জ্ঞান-প্রচারের পক্ষে বিদ্যালয়ের মতো লাইব্রেরীও একটি প্রধান পথ। মফঃস্বলের ভিতর স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীটিকে কবি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীরূপে দাঁড় করিয়েছেন। শুধু বড়োদের নয়, সেখানে শিশুদেরও পাঠের বিস্তৃত সুযোগ দিতে তিনি যত্নবান ছিলেন। লাইব্রেরীর কর্তব্য আলোচনাসূত্রে তিনি লিখেছেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা।...লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া,—গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।" (১৩৩৫)

কবি জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেছিলেন, "ধ্যানচর্চাও শিক্ষা-ব্যাপারের একটি অঙ্গ।" মনকে সংযত ও একাগ্র করবার চর্চাই এর মূলে। এই মনঃসংযম ও একাগ্রতা শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রধান আবশ্যক। সুতরাং পার্শ্বপন্থা হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্যানের উপযোগিতা উপেক্ষা করবার নয়।

"ধ্যানী জাপান" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে জাপানের অভিজ্ঞতা কবি বিশদ্ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। (১৩৩৬)

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কবির মত জানা যায় "স্ত্রীশিক্ষা" নামক প্রবন্ধটিতে। আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষার প্রতিই সকলের বেশি আগ্রহ এবং আয়োজনও রয়েছে সেই দিকেই বেশি। স্কুল-কলেজ স্থাপন ক'রে সেখানে ছেলেদের মতো সমান ভাবে মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টা দেশে কমই দেখা গেছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত, চিত্র, সেলাই এবং খেলাধূলার সর্বমুখী আয়োজন ক'রে শান্তিনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করেন। এই প্রচেষ্টার বড়ো অনুষ্ঠান তাঁর "শ্রীভবন"। শান্তিনিকেতনে সহশিক্ষা প্রচলিত। কী আদর্শে তিনি মেয়েদের গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব সেই মতটি পরিস্ফুট ক'রে বলেন "শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে" প্রাপ্ত একখানি চিঠির উত্তরে। তার উপসংহারে ভারতীয় সনাতন আদর্শটিরই সমর্থন ক'রে তিনি বলেন: "মেয়েদের ভালবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এই জন্য মেয়েদের দায় ভালবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানব-সমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু, সংস্কার যত দূর পর্যন্তই যাক্, সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তার অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।" (১৩২২)

এ পর্যন্ত আলোচনা চলে এসেছে কম-বেশি ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সমাজ লক্ষ্য করে। "শিক্ষা" গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়,—শিক্ষিত শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত বিশাল জনসমাজের সেবা ও শিক্ষার অভাবের দিকে কবির মনন-ধারাটি

একাগ্ররূপে প্রাধান্য লাভ করেছে "পল্লীসেবা" ভাষণে। মানুষে-মানুষে মেলবার অন্তরায় ঘটায় শিক্ষার ব্যবধানে। জনতা শিক্ষিত না হলে দুর্গতির মূল দেশের মাটি থেকে উঠবার নয়। কবি বলেছেন,—"ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণীর চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান,—তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়,—এমন কি, যে কামনা যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা-পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিক মতো সাড়া চলেনি।…তাদের যা আছে সেটা আমাদের নয়।…আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের দেশ নয়।" কবি বলেন,—"এই করে কি আমরা বাঁচব?" দেশের এই অধিকাংশ পল্লীবাসী জনতার দিকে কবির দৃষ্টি গিয়েছিল বহু আগে থেকেই। "রাশিয়ার চিঠি"তে কবি লিখেছেন, "আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে।…বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে।…ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পসল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি।" রাশিয়া-ভ্রমণ থেকে কবির জনশিক্ষা ও জনসেবার ব্যাপক আয়োজন সম্বন্ধে মনে সাহস ও ভাবনার প্রসার দেখা দেয়। রাশিয়ায় যাবার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই, শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে "পল্লীর প্রাণ উদ্বোধনের যজ্ঞ" স্বরূপ জনসেবার কাজ নিয়ে কবি গড়েছিলেন

"শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান।" তার নানা বিভাগীয় কাজের মধ্যে পল্লীশিক্ষা বিস্তার ছিল অন্যতম। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সে বছরই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে তিনি বলেন,—"কখনও আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। তাদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা ক'রে যেন তাদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ং—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।" (১৩৩৭)

এর পরে "শিক্ষার বিকিরণে" কবি জনশিক্ষার কথা বলেছেন কয়েকটি ঘটনাযোগে। চাষীরা একবার কবিকে গ্রামে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়, অধিকাংশই ছিল তাদের মুসলমান। কবির সম্মানে চলেছিল যাত্রাগান। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলেবুড়ো সকলেই বসে আছে শুব্ধ হয়ে। পালাটা আধ্যাত্মিক বিষয়ক। "রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে; শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ ক'রে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।" কবি বলেন, "এ রকম জনশিক্ষার ধারা আমাদের দেশে চলে আসছে আবশ্যিক নয় স্বৈচ্ছিক ভাবে।" "সে অনেক কালের। তার স্বতঃ-সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত-চলাচল হয় সর্বদেহে।" দেশে যখন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হল, আনুষঙ্গিক নানা দুর্গতি সংক্রমণের সঙ্গে জনশিক্ষার অবলুপ্তিও ঘটল শোচনীয় ভাবে। কবি যা দেখেছেন, সেটি ছিল ভাঙন-ধরা অবস্থার মধ্যেও পূর্বধারার জনশিক্ষার একটি ছবি। দেশের শোচনীয় পরিণতির ছবি দেখিয়েছেন কবি দু'টি ঘটনায়। বলেছেন,—"দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের নিকট-সংশ্রবে। গরমের সময় একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে।" "নিদারুণ জলাভাব হেতু মেয়েরা বহু দূরের নদী থেকে বহু কষ্টে বয়ে আনত জল!" "সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল মিশ্রিত।" অগ্নিদাহে ওলাউঠায় গ্রামের দুঃখের সীমা থাকত

না। মানুষের এ দুঃখ দৈহিক। আবার তার আরেক রকমের দুঃখের ঘটনাও কবি বর্ণনা করেছেন। দিনকর্ম শেষে হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মনের তাগিদে একটানা সুরে তারস্বরে একপদের আবৃত্তি ক'রে চলেছে গ্রামের কীর্তন। তার ভিতরে কবি দেখতে পেয়েছেন, লোকের অদম্য মনের ক্ষুধা, কিন্তু খোরাকের একান্ত অভাব। জোগান নেই কোনো নূতন ধারার। পল্লীবাসী সাধারণের এই দৈহিক মানসিক সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্গতিই কবিকে পীড়িত করেছে। আরেকটি ঘটনা এই পল্লীবাসকালেই কবির গোচরে আসে। বলেছেন,—"সাধু-সাধকদের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে।...তাদের কাছেই শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গ-পথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে-প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লৌল্যতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব, যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধিকে সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।" শিক্ষার অভাব এবং কুশিক্ষার প্রশ্রয় পরস্পর সাহায্যসূত্রে উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে লোকসাধারণের মধ্যে অলিতে-গলিতে যে নৈতিক সামাজিক দুর্গতি দিনের পর দিন অবাধে বিস্তারিত ক'রে চলেছে, তার থেকে ত্রাণ পাবার উপায় সুশিক্ষাবিস্তার। সেই "শিক্ষার বিকিরণ" করতে হবে দেশে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপক পন্থায়;—সে পন্থা মাতৃভাষা। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধেও কবি বলেন, ঐ পন্থাতেই তা সর্বজনমনে প্রবেশের অনেকটা সুযোগ পাবে। কবি এই প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব শিক্ষাদান-প্রণালীর উল্লেখ করে বলেছেন,—"একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা-ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে।" এই প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য হচ্ছে, "বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে

তার অনেকখান মারা যায়।" কবির আবেদন—"মাতৃভাষার অপমান দূর হোক।" (১৩৪০)

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে 'মাতৃভাষার অপমান' তিনিই অনেকটা দূর করেন। আজ এদেশে শিক্ষার বাহন বাংলা। গুরুদেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদবী বিতরণের সভায় এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষেও বক্তৃতা দেন বাংলায়। "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" শীর্ষক বক্তৃতার মধ্যে একস্থলে তিনি বলেছেন, "আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি, সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো।" (১৯৩৩)। ১৩৩২ সনের "শিক্ষার বাহন" নামক বিখ্যাত ভাষণে কবি যে আকাঙ্ক্ষাটিকে সজোরে দেশের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এত দিনে আমরা তার বাস্তব পরিণতি দেখতে পাচ্ছি।

শিক্ষার ব্যবহারিক আদর্শ ও প্রণালী নিয়ে নানা দিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবির নির্দেশ পাওয়া যায় "শিক্ষা" গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে "আলোচনা" অধ্যায়টিতে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী কর্মীর পক্ষেই আলোচনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক কথাটিই তার বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রের কথা। শান্তিনিকেতনে কবির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষাপ্রণালীতে দৈনন্দিন আশ্রমজীবন পরিচালিত হয়েছে, তারই ভিত্তিতে কথাগুলি বলা হয়েছে ব'লে বিশেষ ভাবেই তার মূল্য আছে। তার কোনো দু'-একটি কথা পৃথক্‌ভাবে এখানে উদ্ধৃত করে না দিয়ে গোটাটাই পড়ে দেখবার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। এই সঙ্গেই ঐ "শিক্ষা" গ্রন্থেরই আধুনিক সংস্করণের প্রথম খণ্ডস্থিত "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধ এবং "শ্রীভবন" ও

"পাঠভবন"-নিয়ম সংক্রান্ত পৃথক্ দু'টি পুস্তিকাও সমানই দ্রষ্টব্য। আরো একটি পুস্তিকা সকলের পড়ে নেওয়া ভালো, তার নাম "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।"

ইতিমধ্যে কবি "শিক্ষা ও সংস্কৃতি" নামক রচনায় কয়েকটি কাজের কথা বলেছেন, শিক্ষার তা শেষ পর্যায়ের বিষয়। শিক্ষাবিধি নিয়ে আলোচনা করবার কথা বিশেষ ভাবেই ভাবছেন, এমন সময় আমেরিকার একটি কাগজে স্বীয় চিন্তাটির অভিব্যক্তি কবি দেখতে পেলেন। আধুনিক শিক্ষায় সংস্কৃতির অভাব লক্ষ্য ক'রে আমেরিকান লেখক বলেছেন, চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?" কবি বলেন,—"সংস্কৃতিবান মানুষ শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে আনন্দ পায়।" দেশবাসীর ভাববার মতো একটি কঠিন সতর্কবাণী এই উপলক্ষে কবি উচ্চারণ করে বলেছেন,—"সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখতে পাই।...তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে।...সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ পূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ ক'রে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশু-কাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক্, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।" এই বিষের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কবির মতে "পরীক্ষা পাসের জন্য পড়া মুখস্থ করা নয়," তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে "মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া।"

সংস্কৃতি হচ্ছে সুশিক্ষার ফলশ্রুতি; সার জিনিস। "সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।"

এই সংস্কৃতিবান শিক্ষার্থীরই বাস্তব উদাহরণস্বরূপে কবি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আচরণ উল্লেখ ক'রে বলেছেন,—"একদিন দেখেছিলেম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল, আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে; সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন, তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না, আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকুল্য তারা কর্তব্য ব'লে জ্ঞান করত; সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে; এ সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম ক'রে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখিনি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিক মতো যাচাই করতে জানে।" (১৩৪২)

বর্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সাধনার একটি রূপধারণা মিলেছে ১৩১৮ সনের "ধর্মশিক্ষা" প্রসঙ্গে। এখানে উপসংহার অংশে দেখা যাচ্ছে সেই শিক্ষারই পরিণত ফলস্বরূপ সুগঠিত একদল মানুষের রূপ। এমনি মানুষ গড়বার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবির যা-কিছু শিক্ষাবিধির উৎপত্তি। মানুষের এই সংস্কৃতিজাত আচরণই হয়েছে কবির কাছে একই কালে ধর্মাচরণের সামিল। গোড়াকার ঐ "ধর্মশিক্ষা"তে ধর্ম বলতে যে-জিনিস কবি লোকের সামনে ধরেছেন, তা এই সংস্কৃতিরই নামান্তর, এটিও বিশেষ

ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। উপরের চিত্রটি কবির শিক্ষারও যেমন সার্থকতার মাপকাঠি, তেমনি তাঁর ধর্মেরও। এই মাপকাঠির নিরিখেই কবির শিক্ষা ও ধর্ম চিরদিন বিচার্য। ছাত্রছাত্রী-সমাজের, বিশেষ ক'রে, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই চিত্রটি বিশেষ ভাবেই এ জন্য মনের সম্মুখে ধরে রাখবার মতো। প্রত্যেকেরই জানা চাই, শিক্ষা থেকে পেতে হবে সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিবান বা শিক্ষিত বলা যাবে তাকে তখনই,—যখন, এমনি ভিতরের স্বভাবের থেকে আপনি এসে তার শিক্ষা লাগবে মানুষের সেবাকাজে।

বাংলা সাহিত্যের সম্মানিত প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৩ সালে "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" নামক প্রথম ভাষণে তিনি সাহিত্য অধ্যাপনার আদর্শ হিসাবে অধ্যাপক মর্লির কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। তখন কবির বয়স সতেরো, বিলেত প্রবাস-কালে মাস তিনেকের জন্য লণ্ডন য়ূনিভার্সিটিতে ছাত্র হয়ে মর্লির ক্লাসে তিনি যোগদান করেন, সেই সূত্রেই তাঁর শিক্ষাদান-রীতিও অনুসরণ করবার সুযোগ পান। মর্লি আবৃত্তি করে যেতেন, তার থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ত পাঠ্যাংশের ভাবার্থ। "সপ্তাহে এক দিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন। তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ বিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্য-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাশ থেকে" কবি জেনেছিলেন। উক্ত ভাষণেই কবি বলেছিলেন, "বয়স যদি পর্যবসিত-প্রায় না হোত, আর যদি আমার কর্তব্য হোত বাংলা সাহিত্য শিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম।" সমর্থ বয়সে তাঁর আশ্রমের ক্লাশগুলিতে তাঁকে অধ্যাপনায় এই রীতিই অনুসরণ করতে দেখা গেছে,—এ সাক্ষ্য তখনকার অনেকেই দেবেন।

গুরু মর্লিকে ভালো লেগেছিল। একাধিক স্থলে কবি তাঁর কথা বলেছেন। কবির ছাত্রদের নিকটও কবি পরম প্রিয় ছিলেন। গুরুদেব ব'লে জেনেও

কবিকে তাঁর ছাত্রেরা জানত তাদের বন্ধু ব'লে। হাস্য-পরিহাসে গল্প-গুজবে তিনি সময়ে সময়ে তাদেরই এক জন হয়ে যেতেন। তাদের স্বাধীন মতকে স্ফূর্তি দিয়ে তিনি তাদের অকৃত্রিম মনকে কতখানি কাছে পেয়েছিলেন, প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে তার গল্প কিছু-কিছু শোনা যায়। তাদেরই এক জন প্রৌঢ়-প্রায় শ্রীযুক্ত শিবদাস রায় বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। তিনি গল্পচ্ছলে বলছিলেন,—"এক দিন বেণুকুঞ্জে রয়েছেন গুরুদেব। আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছি, ছাত্রীও আছেন দু'-এক জন। গল্প চলছে। কথায়-কথায় মেয়েদের কথাও উঠল। বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা তখন খুবই কম। মেয়েদের বেশভূষা, চালচলন, স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের আলোচনা তুলনামূলক ভাবে দেশ-দেশ ধ'রে চলছিল। গুরুদেব নরভূপ নামক নেপালী ছাত্রটিকে দেখিয়ে বললেন, "সকলেরই তো মত শোনা গেল, এবারে ভিন্ন প্রদেশবাসী এর কথা শোনা যাক। কী হে নরভূপ, তুমি কী বল, কোন্ দেশের মেয়েরা দেখতে সুশ্রী সব চেয়ে।" নরভূপের পরিচয়ের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। পুরোনো আশ্রমের অনেক মজার গল্প আছে তাকে নিয়ে। আশ্রম-উপকণ্ঠে একাকী কুকরী দিয়ে বাঘ মারা তার অন্যতম একটি কীর্তি। সাহসের কাজে সে ছিল সবার আগে। তার সরল হৃদয়ভাব ও নিঃসংকোচ সপ্রতিভ আচরণের জন্য সকলেই তাকে সমাদর করত। এই নরভূপ গুরুদেবের প্রশ্ন শুনে অবিলম্বে এবং অবলীলাক্রমে সোজা ছাত্রীদের এক জনকে দেখিয়ে বলে দিল, "যাই বলুন, এই বাঙালি মেয়েদের কাছে আর কেউ নয়।" গুরুদেব একটু হেসে সহজ ভাবেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তাঁর আলোচনায় ছাত্রদেরও তিনি এমনি সহজ প্রবেশের স্বাধিকার দিয়ে রেখেছিলেন।

ছেলেদের সহজ নির্মুক্ত মনই তিনি চাইতেন। পেয়েও ছিলেন তাই। সমবয়সীর কাছে যেমন ছেলেরা মনের কথার ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না, এখানেও ঘটেছে তাই। এই নির্মুক্ততাকেই জানতেন কবি সকল মানসিক গ্লানির প্রতিশোধক ও প্রতিষেধক ব'লে।

সুকুমার অনেক বিষয় আছে, যার চিন্তা বা আলোচনা অনেক সময় ছোটদের মধ্যে অস্বাভাবিক গোপন-পথ নিয়ে অসুস্থ মনোবৃত্তি ও দুষ্ট স্বভাবের সৃষ্টি করে। সেগুলিকে সাধারণ তত্ত্বের পর্যায়ে এনে সহজ ভাবে আলোচনার বিষয় করলে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যায় স্তিমিত হয়ে; যেমন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-তত্ত্বের অন্তর্গত হয়ে মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সৃষ্টিক্রিয়ার কথাও সহজ ভাবেই চলে যেতে পারে,—মনে কোনো দাগ না রেখে। প্রতিক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। উপরের ঘটনাটিতে ছাত্রদের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা ছাড়াও, একটি শিক্ষা-পরিবেশে কবির দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত এই শিক্ষা-প্রক্রিয়া অনুসরণেরও আভাস মেলে।

এই নরভূপেরই আরেকটি গল্প। মণ্ডলীতে এক দিন এরূপ কথায়-কথায় কী একটা হাল্কা মন্তব্য গুরুদেব করে ফেলেছেন, বাস্তব ভিত্তিতে যা একটু অসংলগ্ন। অমনি তাঁর এই স্পষ্টবাদী মুখর ছাত্র গুরুর গুরুত্বকে অতিক্রম ক'রে বিনা দ্বিধায় বক্র কটাক্ষে বলে উঠল,—"বাঃ গুরুদেব, বেশ,—বেশ বলেছেন!" গুরুদেবের মুখের উপর এমনি জবাব শুনে আর সবাই তো হতবাক্। ক্লাশে উপস্থিত ছিলেন তখনকার ছাত্র-পরিচালক শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার মশায়। তিনি যেমনি তাঁর অভ্যাস মতো মুখাগ্রে অঙ্গুলি রেখে "হিস্" শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ছাত্রটিকে সংযত ও নীরব থাকবার ইঙ্গিত করেছেন, গুরুদেব তা লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পেরেছেন; তিনিও অমনি বলে উঠলেন, "ও কী, ওকে ওর কথা বলতে দাও। অমনি ক'রে ওদের বোবা বানাতে চাও না কি?"

১৯৩০ সনে লেখা কবির "রাশিয়ার চিঠি"-র অন্তর্গত ষষ্ঠ পত্রখানি এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে লিখছেন, "কত বার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে, সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জানতে চাইতে শেখেনি,—প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি ক'রে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।" এ সঙ্গেই কবি

একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধি সে সময় মাত্র ফিরে এসেছেন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার আগে কিছু দিন তিনি তাঁর এক দল ছাত্র নিয়ে বাস করছেন শান্তিনিকেতনে। সেই ছাত্রদের এক জনকে একদিন কবি জিজ্ঞেস করেন, আশ্রমের অদূরবর্তী পারুল বনে সে বেড়াতে যেতে চায় কি না। ছাত্রটি বললে, "সে কথা আমি জানি নে, দলপতি জানেন"। নানা ব্যাপারে নানা সময়ে কবি নিজের ছাত্রদের মধ্যেও কিছুটা ঐ রকমেরই মনের পরিচয় লক্ষ্য করেছিলেন। এই পরমুখাপেক্ষিতায় তিনি মন্তব্য করেন, "সংসারে এ রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।"

মনের জড়তার প্রতিই কবির সব চেয়ে বড়ো ধিক্কার। জড় মন শিক্ষাকে ব্যাহত করে। জড় মনেই দেখা দেয় বুদ্ধির অভাব। কবি বলেন, "কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়।" একদা আমেরিকা থেকে আশ্রমের জন্য কবি একটি "বায়ুচল চক্রযন্ত্র" (উইণ্ড্ মিল্) আনিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে তার সাহায্যে জল তোলা হত। কিন্তু এই নূতন জিনিসটা সম্বন্ধে ছাত্রমহলে ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে কবির "মনে বড়োই ধিক্কার লাগল।" আশ্রমের বৈদ্যুতিক আলোর কারখানা সম্বন্ধেও এই একই ঔদাসীন্য কবিকে ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষতা বিষয়ে হতাশ করে। তিনি বলেন, "বুদ্ধির জড়তা যেখানে, সেইখানেই কৌতূহল দুর্বল।" কৌতূহল হচ্ছে ছাত্রদের মানসিক প্রগতির প্রধান সহায়ক। কবির ইঙ্গিত-মতে শিক্ষায় সর্বপ্রযত্নে এই জিনিসটা জাগিয়ে চলাই পরম আবশ্যক। "আশ্রমের শিক্ষা" (১৯৩৬) প্রবন্ধে কবি লিখেছেন: "নিরোৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।...প্রথম থেকেই আমার সঙ্কল্প

ছিল, আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের অব্যবহিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে, যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।"

(সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দায়িত্ব-বোধও জাগানো চাই। তারা বড়ো হয়ে যেমন নিজের নিজের সংসারের ভার নেবে, তেমনি দেশের দশের কাজের ভারও নিতে হবে তাদেরই। কবি সেই বড়ো দায়িত্ব-ভার সম্বন্ধেও ছাত্রদের যোগ্য শিক্ষার কথা বিশেষভাবেই ভেবেছেন। "রাশিয়ার চিঠি"র ষষ্ঠ চিঠিখানিতেই উল্লিখিত আছে যে, তাঁর "আশ্রমের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের" অনেক বার এই কথাটি তিনি বলেছেন যে,—"লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ব-বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।"

আশ্রম একটি বড়ো সংসার; আবার বড়ো দেশের একটি ছোটো সংস্করণও তাকে বলা যেতে পারে তার নানাদেশীয় অধিবাসী ও বিচিত্র কর্মপ্রসার দিয়ে। "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি একাধারে বিদ্যালয় এবং বহু জনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ।" (মনোবিকাশের ছন্দ, দেশ, কার্তিক ১৩৪৭) 'সর্বদিক দিয়েই এর শুভাশুভে দুঃখে-দৈন্যে একে ছাত্রদের নিজের ক'রে ঘনিষ্ঠভাবে ভাবতে শেখাতে হবে, এবং তার মধ্য দিয়েই বহুর সঙ্গে মিলে বহুর জন্য করার দায়িত্ব শিক্ষাও তাদের দেবার আছে, বহু পূর্বের রচনাতেও কবির এ ধরণের চিন্তার সূত্র পাওয়া যায়।)

সতর বছর পূর্বে আশ্রমের আর্থিক দৈন্য নিয়ে এণ্ড্রুজকে লেখা একখানি ইংরেজি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন,—"আমাদের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন অনুভব করে, আশ্রমের সব সমস্যা তার নিজেরই সমস্যা।...আমাদের যা-কিছু দুঃখ-দুর্দশা, এমন কি, ক্ষুদ্র শিশুটির কাছেও যেন আমরা তা গোপন

না রাখি। আশ্রমের দায়িত্ব বহনে তাদেরও অংশ আছে, এ কথা মনে করেই তারা যাতে গৌরব বোধ করে, আমাদের তাই দেখা উচিত।”

বৃষ্টিধারা শুরু হলে ছাত্রদের সঙ্গে দল বেঁধে গুরুদেব জলে ভিজতে বেরোতেন। চড়ুইভাতিতে সঙ্গী হতেন, আবার জ্বর হলে ছাত্রদের নিজ হাতে দিতেন কুইনিন খাইয়ে। রাত জেগে করতেন সেবা। শেষ দিকেও দেখা গেছে, ছেলেদের সকালবেলার লাইনে নিয়মিত “পঞ্চতিক্ত” খাওয়ানো বিষয়ে তাঁর যত্ন ছিল জাগ্রত। খেলাধূলায়ও তাদের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ দিল। মাঝে-মাঝে ফুটবল ম্যাচের দিন খেলার মাঠে এক পাশে দর্শকদের পিছনে দেখা দিত তাঁর মোটরখানি। “সর্বেশ কাপ” জিতে ছেলেরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রসন্ন মনের প্রোৎসাহ নিয়ে আনন্দে মেতেছে। মেয়েরা আনত রান্নাঘর থেকে নানা সময়ে তাদের তৈরি নানা খাবার। দোরগোড়ায় এঁকে রেখে যেত আলপনা, রেখে যেত ফুল-পল্লব। তাদের রোগ-শোকে কবি যেমন থাকতেন উদ্বিগ্ন, তাদের সঙ্গে উৎসবে-অনুষ্ঠানে, নাচে-গানেও তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

সাধারণ লোকের ধারণায়, দুষ্ট ছাত্রদের সংশোধনাগার ছিল শান্তিনিকেতন, আর ছিল যত সব মা-মরা বাপে-তাড়ানো বড়ো লোকের ছেলের আশ্রয়স্থল। কবি এ নিয়ে রহস্যচ্ছলে গল্প করতেন। এর পিছনে সত্য কিছু না ছিল তা নয়, তবে কবির শিক্ষাবিধি এবং স্নেহ-সান্নিধ্যই ছিল দুরন্ত ও নিঃসহায় ছাত্রের যাদুকরী সংশোধনের উপায় ও সান্ত্বনাপূর্ণ নির্ভর-স্থল। ছাত্রদের ত্রুটির থেকে শিক্ষকদের দায়িত্বই ছিল তাঁর কাছে বড়ো। বড়োদের বড়োত্ব নিহিত রয়েছে ছোটদের অত্যাচার-সহনশীলতায় ও সস্নেহ ধীর পরিচালনার মধ্যে,—এটাই কবির কাছে পাওয়া শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের শিক্ষকতার প্রথম পাঠ।

গুরুদেব ছাত্রদের ভালোবাসতেন, তেমনি তাদের জড়তা-মূঢ়তাকেও করতেন কশাঘাত। তাঁর শাসন ছিল মায়ের মতো। তিনি যে লিখেছেন,—

"শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো",—তাঁর শিক্ষাবিধি ছিল সেই সত্যেরই পরিপোষক।

কবির কাছে অহরহ অভিযোগ আসত আশ্রমের রান্নাঘরে থালাগুলির তলা ক্ষয়ে-যাওয়া নিয়ে। সুদীর্ঘ পংক্তিভোজনের সময় অনবরত টানাটানি ক'রে ব্যবহার করায় মেঝের শানের সঙ্গে ঘষায়-ঘষায় এই ব্যাপারটা ঘটত। কবি এই ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে সকলের বুদ্ধি-প্রয়োগের শৈথিল্য ও কর্ম-তৎপরতার ত্রুটি নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, একটু তৎপর হয়ে মাথা খাটালেই বিড়ের মতো কিছু একটা শক্ত জিনিসের উপর পাত্রগুলি বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করবার কার্যকরী উপায় মিলত। কিন্তু উদ্যোগী হয়ে প্রতিকার করবার উদ্যমেরই ছিল অভাব।

ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্কে দেহের স্বাস্থ্য এবং তার সঙ্গে চিন্তাদর্শ সম্পর্কে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কবি কতখানি গভীরভাবে ভাবতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় আশ্রমবাসী এণ্ড্রুজকে লেখা তাঁর একখানি ইংরেজি পত্রে। পত্রখানি সংকলিত হয়েছে কবির "Letters to a friend" নামক ইংরেজি গ্রন্থে। আশ্রমের ছাত্রেরা এক সময়ে তাদের দৈহিক বরাদ্দ খাবার থেকে ঘি ও চিনি বাদ দিয়ে তার উদ্বৃত্ত অর্থে একটি দরিদ্র-সেবাভাণ্ডার খোলে। কবি বাইরে ছিলেন, 'মডার্ণ রিভিয়ু' মার্ফৎ সে খবর পান। আগ্রা থেকে অমনি এণ্ড্রুজকে লিখছেন,—"ছেলেরা এই যে কাণ্ডটা করেছে, এটা নিশ্চিত স্বাধীন বুদ্ধিতে নয়,—পরানুকরণে, তোমাদের দেশের ছেলেদের দেখাদেখি। দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের দেশে যেটা চলে, এখানে সেটা চলে না। ইংলণ্ডে চিনির পরিবর্তে আছে মাংস ও চর্বিজাতীয় আরো সব জিনিস। এ দেশে ছেলেদের খাবারে পুষ্টিকর অংশ এমনিতেই মেলে কম। পড়ার বই যেমন তারা বর্জন করতে পারে না, এই খাদ্যাংশও তেমনি,—এতই দরকারী সেটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য। দরিদ্র-ভাণ্ডারে পয়সা দিতে চায় ভাল কথা, কিন্তু তার পথ আহার্য-বর্জন নয়; তারা আত্মত্যাগের একটা কিছু কাজ যদি চায় তো,

আশ্রমের জল-তোলা, বাসন-মাজা, কূয়া-খোঁড়া, স্বাস্থ্যের অভিশাপ-স্বরূপ ঐ গর্তগুলি বোজানো ইত্যাদি দৈহিক খাটুনি কিছু কিছু করুক না,—তাতে ভাণ্ডারে কিছু যেমন জমাতে পারবে, তেমনি দিতে পারবে তাদের সততারও পরিচয়। পরানুকরণ না ক'রে আরো এমনি নিজে নিজে কী কাজ উদ্ভাবন করতে পারে তাই তারা যেন ভেবে দেখে।" (১৯১৪)

যে আহারের বিষয় নিয়ে এতখানি, সেই "আহারের রুচি ও অভ্যাস সম্বন্ধে···কদাচার" নিয়ে আবার তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করতে ছাড়েননি, গোটা বাংলা দেশই তাঁর নিকট এ অপরাধে অপরাধী। বলেছেন,—"পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত ক'রে তুলেছি।······আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাশের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।"

পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা থেকে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রণালী নয়, মানুষ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-জগতে বড়ো জিনিস। এক দীপশিখা থেকে যেমন আরেক দীপশিখা জ্বালানো হয়, তেমনি এক মানুষের ব্যক্তিত্ব-স্পর্শে জাগবে আরেক মানুষের ব্যক্তিত্ব। হৃদয়ের যোগে জাগবে হৃদয়। তখন ছাত্রের স্বভাব ও গ্রহণশক্তির যোগ্যতার পরিমাণ বুঝে দিতে হবে তাকে বিষয়ের পাঠ। দেহে ও মনে বৃত্তির স্বাধীন উন্মেষ, বাহিক আসবাব-বহুলতা থেকে আন্তরিক সম্পদের মূল্যবোধ, বিশ্বের সর্বলোক-সমাজের মধ্য থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহ এবং সকলের প্রতি মৈত্রী থেকে সকলের সেবার কাজে যথাশক্তি উদ্যোগী থাকা, বলিষ্ঠ উদার এই আদর্শের লক্ষ্যেই চলেছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে কবির পথের বাঁক সুস্পষ্ট। ক্লাসের ইট-কাঠের বেড়া ছেড়ে তিনি শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন উন্মুক্ত প্রান্তরে, গাছের তলায়, প্রকৃতির ক্রোড়ে। অথচ শহরের বিচিত্র মানব-কর্মোদ্যোগের সংস্পর্শ থেকে তা একেবারে বিবর্জিত

নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বসে-বসে পঠন-পাঠনের শিক্ষার চেয়ে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে বেশি কাজের হয়ে ওঠে সেই শিক্ষাটুকুই, যার হাওয়া আশ্রমের প্রতিদিনের জীবনের চলাফেরার মধ্য থেকে এসে নিয়তই লাগে। এখানকার শিক্ষা পুঁথিগত ততটা নয়, যতটা পরিবেশগত। এ জন্য পরিবেশকে আদর্শানুযায়ী পরিমণ্ডিত রাখাতেই কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বেশি। সেই পরিবেশে ঘরও যেমন আছে, তেমনি তার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরের যোগও আছে সমভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ যেমন সম্প্রদায়ের গণ্ডিমুক্ত, তেমনি মুক্ত তা প্রণালীর স্বদেশী-বিদেশী সংস্কার থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে যে পরীক্ষণ চলেছে, তার প্রতি মুক্তসজাগ মনে কবি ছিলেন সতত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর আশ্রমের মুখপত্র পুরানো কালের "শান্তিনিকেতন পত্রিকা"তে নিয়মিত ভাবে এই সর্বদেশীয় শিক্ষারীতি আলোচিত হত। সুধীজন-স্বীকৃত প্রণালী মাত্রেই কবি হাতে-কলমে নিজের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন এবং তার প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ক্ষয়ক্ষতি-ভয়মুক্ত। এজন্য প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারা ছেড়ে ঐতিহ্যগত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পথে গিয়েও আবার শেষটায় নিলেন তাঁর বিশ্বভারতীয় পথ। সেখানে প্রণালী বলতে বাঁধাধরা গতানুগতিক একান্ত একটা-কিছু নেই, বিশ্ব আছে, আছে ভারতও। তাঁর আয়োজন ছিল বিচিত্র; তাঁর বেগবতী প্রেরণা ছিল বহুমুখী। যে ক'দিন বেঁচেছিলেন, তাঁর মধ্যেই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য-বলে সব দিকেই জীবনের অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়েছেন; কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত পথ সকল দিকে এখনো সকলের জন্য ততটা ফলদায়ক হয়ে দাঁড়ায়নি। সেই দাঁড় করাবার ভারটা রয়েছে ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের হাতে।

জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চিন্তায় ও চেষ্টায় গড়া কর্মবিভাগবহুল তাঁর আশ্রম "শান্তিনিকেতন"। সেখানে যাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই স্বভাবের আঁচে মানুষ, অর্থাৎ শক্তিসাধনার সহজ আগ্রহ নিয়ে যাঁরা জন্মেছেন, ফাঁকি দেওয়া বা

পল্লবগ্রাহিতা যাঁদের ঘৃণার বস্তু, সেই ধরণের খাঁটি নিষ্ঠাবান স্বভাবগুণীরাই বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে একটা-না-একটা কোথাও মনোমত ক্ষেত্র পেতে পারেন শান্তিনিকেতনে, যেটা সচরাচর অন্যত্র দুর্লভ।

হাতে ধরে ছাত্রকে বসিয়ে কিছু করিয়ে নেবার তাগিদ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার পথ বাধ্যবাধকতা বা শাস্তির পথ নয়, তা হচ্ছে পরিবেশের থেকে উৎসাহ পাওয়ার পথ, স্বভাবজাত গুণ-বিকাশের সাহায্যকারী পথ।

হাতে-লেখা পত্রিকা, সাহিত্য-সভা, গানের জলসা, চিত্র-প্রদর্শনী, দৌড়-ঝাঁপ ও খেলার প্রতিযোগিতা, ছাত্রদের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, দরিদ্রভাণ্ডার, লোকসেবা ও স্বাধীনতা আদর্শের অভিনন্দন-মূলক নানা সাময়িক অনুষ্ঠান,—এগুলি শান্তিনিকেতনের দিনগুলিকে বিচিত্র রূপে-রসে জীবনপ্রবাহে ভ'রে নিয়ে বয়ে চলেছে। এর মধ্যে মানুষ আপনা থেকেই অনুভব করে কিছু সৃষ্টি অথবা সমজ্‌দারিতার তাগিদ। দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে এক-এক জনের মধ্য দিয়ে এক-একটি শক্তি বা প্রেরণা। ক্লাশের পড়ানোর চেয়ে সেটা গড়ে ওঠে আবহাওয়ার গুণেই বেশি।

নোট-সার করা যুগে 'বই পড়া'র উপরেই এখন আমাদের ছাত্রমহলে পাশ কর্‌া নির্ভর করে। অনেক স্থলে এ-ব্যাপারের মূলে আমাদের বড়রাই ; "তাঁহারা কতকগুলো বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়, ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন, এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়।" ১৩১৩ সনের "আবরণ" প্রবন্ধের পরিশেষে কবি এই প্রণালীর কুফল আলোচনা করেন। তাঁর মতে,—"বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং সেখানে আমাদেরও অধিকার আছে, এ-কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত

ছিল, তখনও তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমন করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।…বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে।"

এখানকার শিক্ষার দায়িত্ব কঠিন, এর সার্থকতাও সেই কারণেই সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হোতে সময়ের অপেক্ষা করে। শিল্পী পাবেন—কলাভবন; জ্ঞানী পাবেন—শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, চীনাভবন, হিন্দীভবন; গুণী পাবেন—সংগীত-ভবন; কর্মী পাবেন—শ্রীনিকেতন; শিশুরা পাবে—শিশুবিভাগ; মেয়েদের আছে শ্রীভবন, আর এঁদের সকলেই পাবেন গ্রন্থভবন, এর ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দের উৎস উৎসবগুলি; সম্প্রতি বাইরে থেকে সাধারণেরও এর সংস্রব পাবার দু'টি পথ খুলেছে, একটি লোকশিক্ষা সংসদে, অন্যটি "বিশ্বভারতী পত্রিকা" থেকে। গ্রন্থন-বিভাগের পথটি অবশ্য বহু-বিস্তৃত ও বহুকালের।

যিনি শান্তিনিকেতনের যেখানেই থাকুন, অল্পের মধ্যে জটিল বৃহৎ সংসারের আঁচটাও পাবেন নানা লোকের প্রাত্যহিক মেলামেশায়। এতে বিরাট প্রবাহময় বড়ো জীবনের অনুভবের মধ্যে সব সময়েই নিজের ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডিবদ্ধতাকে মুক্তি দেবার যেমন সুযোগ মিলবে, তার উল্‌টোটাও ঘটা কিছু বিচিত্র নয়, অর্থাৎ, অসমর্থের পক্ষে আত্মসংকোচে সব সময়ে অস্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে চলাও ঘটতে পারে স্বভাবতই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ এই জন্যেই সাধারণের পক্ষে দুর্গম। তিনি তো আয়োজন করেই গেছেন, কাজে লাগাতে পারে তা ক'জন? তাঁর সঙ্গে পা ফেলে চলা সকলের কর্ম নয়।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া ছাত্র-জীবনের পক্ষে বিঘ্নকর বলেই কবি বরাবর দেখেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলনে'র সময়কার লেখাগুলি থেকে তা বোঝা যায়। ১৯২১ সনের ৫ই মার্চ চিকাগো থেকে এণ্ড্রুজকে লেখা একখানি পত্রে লিখছেন,—বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় একদল যুবক ছাত্র জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' গৃহের একতলায় কবির সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে তাদের স্কুল-কলেজ বর্জনের আদেশ দিতে বলে। বললেই তারা একযোগে তাঁর আদেশ পালন করবে, এই জলন্ত উৎসাহের খরস্রোতের মুখে কবি তাদের বিমুখ করেন অধ্যয়নত্যাগে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে। তারা কবির দেশাত্মবোধ সন্দেহ করে ফিরে যায়। কবি বলেন, "তখন আমার সম্বল বলতে পাঁচটি টাকাও হাতে নেই, অথচ কেউ জানত না যে, ঠিক তখনই হাজার টাকা দিয়েছিলেম স্বদেশী একটি দোকানের পিছে। তাতে শেষটা দেউলিয়াও বন্‌তে হয়।" কবি ঐ চিঠিতেই বলেন, আশ্রমের ছাত্রেরা তাঁর কাছে প্রহেলিকা মাত্র নয়। তাদের জীবন সকলের ও তাদের নিজেদের পক্ষে একটা বড় জিনিস! কিছু না ক'রে পাততাড়ি গুটিয়ে বসে থাকা যদি সাময়িক ভাবেও হয়, সে যে-কারণেই হোক, তাকে কবি ব্যক্তির বলিদান ব'লে মনে করেন, জগত ভ'রে মোহের মুখোস-পরা নানা আদর্শের নামে এই বলিদানই নিত্য চলছে। ছেলেদের কিছু-না-কিছু শিখতেই হবে, শেখার কাজের মধ্যে ছেলেদের নিয়ে নিয়ত রত থাকতে হবে,—এই বিপুল দায়িত্ব-বোধ সব কিছুর উপরে রেখে কবি বলছেন, "আমি আমার পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, আশে-পাশের এই সহচর প্রাণীগুলিকে আমি ভালোবাসি, এদের ভালোবাসাই আমার সব। তাদের শিক্ষার ক্ষতি কিছুতেই স্বীকার্য নয়।" (Letters to a friend. P. 129—133)

স্বদেশে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র-স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যেই কবির শেষ দিনগুলি কেটেছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও কর্মী অনেকে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, কতক বাইরে গিয়ে, কতক ভিতরে থেকে। যারা বাইরে গেছে, তারা নানা কাজে কারাবরণও করেছে, যারা ভিতরে ছিল তারা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার, কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ এবং আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রেরণার একটি অনুধাবনেই রয়েছে বেশি নিয়োজিত। বাইরে-যাওয়া ছাত্র ও কর্মিগণ আন্দোলনের ভাঁটার মুখে আবার যখন তাদের স্থগিত পাঠ বা কাজ নিয়ে আশ্রমে যোগ দিতে এসেছে, তারা পেয়েছে সাদর আশ্রয়। বাধা ছিল শুধু আশ্রমে যোগ রেখে সংগ্রামমূলক প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালানোতে। পাঠে নিরত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্র-জীবনের কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়, সেই দিকে ছিল সর্বদা কবির সতর্ক লক্ষ্য। লোক-সমাগম ও আমোদ-আহ্লাদের আকর্ষণে নানা গোলযোগের আশঙ্কা ক'রেই শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে রেলওয়ের ফ্ল্যাগ-স্টেশন স্থাপন বা সিনেমা-ঘর তুলতে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ৭ই পৌষের মেলায় সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আমোদ-আহ্লাদ তিনিও চাইতেন, রাষ্ট্র-আন্দোলনের আবশ্যকতাও তিনি বুঝতেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিছু ব্যক্তিগত যোগ, সহানুভূতিও তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি কাজ নিয়েছিলেন শিক্ষার। তার বিঘ্নকর বিষয় তাঁর কাছে উৎসাহ পায়নি, এ কথাও সত্য।

শিক্ষার বিঘ্নকারী ছাত্র-নির্যাতক গুপ্ত পুলিশবাহন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী শাসনের প্রতি কবির ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশের ঘটনাও নিতান্ত বিরল নয়। "কালান্তর" গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধে লিখছেন: "দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া— —এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি! এ যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাত দুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল

ছাড়িয়া দেওয়া।...আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র ; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলাগারদে জীবন কাটাইতেছে।...পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছু কাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর কিছুই না করিয়া কেবল মাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর-বেশি কিছু করিবার দরকার নাই। উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্ন দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হটাইতে পারে না, বাংলা দেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গণি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।" ঐ প্রবন্ধেই আর একটি ঘটনারও উল্লেখ আছে। "আমাদের আশ্রমে দুটি ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুইটিকেও পীড়া দিতেছে।

এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই সকল লোকের বিদ্রূপহাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চক্‌মকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এমনি করিয়া বাংলা দেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখ আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatento বলিবে না।" (১৩২৪)

কবির মৃত্যুর বছর পাঁচ-ছয় আগে একবার বোলপুর ডাক-বাংলার মাঠে ব্রিটিশ সরকারের সৈন্য-ছাউনি পড়ে। সৈন্যরা সাধারণকে কুচকাওয়াজ ও খেলা দেখাবে। পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল তার, মফঃস্বলে আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে সরকার-বিরোধী কার্য থেকে জনসাধারণকে দূরে রাখা। দুর্লভ-দর্শন এই সৈন্যসমারোহ ও ক্রীড়াকৌতুকের প্রতি সাধারণের মতো ছেলে-মহলে স্বভাবতই ব্যগ্রতা জাগে অত্যধিক। এদিকে যেমন আশ্রমে যথেচ্ছ বিচরণশীল সরকারী চরের প্রাদুর্ভাব ছিল অসহ্য, বাইরে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং পথচারীদের উপরও ফৌজী জুলুম ও বাধা-নিষেধ চলছিল তেমনি মাত্রা ছাড়িয়ে বেপরোয়া রকমে। কবির উপস্থিতিকেও একরূপ উপেক্ষা ক'রেই অহরহ আসছিল আশ্রমে ফরমানের পর ফরমান। এই অত্যাচারের কথা নিয়ে উর্ধ্বতন মহলে লেখালেখি করতে কবির মনে ঘৃণা জাগল। কাউকে কিছু না ব'লে, বর্জন করলেন তিনি সেই ফৌজী-উৎসব। একটি ছেলেকেও যেতে দিলেন না সেখানে। ব্যাপার বুঝে দলের কাপ্তেন মেজর সাহেব সানুচর আশ্রমে এসে কবির কাছে ত্রুটি স্বীকার করে যান।

অনেকবারই আশ্রমে অনেক লাট বড়লাট এসেছেন। এ সম্বন্ধে একবার আশ্রমের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে কবি লিখছেন,—"আমাদের আশ্রমে রাজপুরুষদের গতিবিধি হতে চলল সেজন্য মাঝে মাঝে মন উৎকণ্ঠিত হয়, কিন্তু এ কথাও ভাবি যে, আশ্রমের রক্ষাভার যাঁর উপরে আছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। এর থেকে যদি কিছু ফল হয় সে ভাল ফলই হবে। কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার—এদের কারো মন জোগাবার ইচ্ছা যেন আমাদের প্রলুব্ধ না করে—আমরা যেন কোনো রকম ছদ্মবেশ ধারণ করবার আয়োজন না করি। আমাদের ভাবে আমাদের কাজ আমরা করে যাব, তাতে যদি আপনিই কারো ভাল লাগে ত ভালই, যদি না লাগে ত ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমরা নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে যেন লেশমাত্র সন্দিহান হোয়ো না।"—(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪১, পৃঃ ২৯৯) লাটদের আসার আগে ১৫।২০ দিন এমন কি মাসাধিক কাল আগে থেকেই আশ্রমে গোয়েন্দা দলের আমদানী হত। হঠাৎ দেখা যেত শান্তিনিকেতন যেন বিশেষ কতকগুলি লোকের কাছে কয়েক দিনের জন্য তীর্থ হয়ে উঠেছে; আনা-গোনা লেগেই রয়েছে অষ্টপ্রহর। মোলায়েম ভাষায় আইনজারী হত,—লাটদের আশ্রমে অবস্থিতি-কালে আশ্রমবাসীদের থাকতে হবে ঘরে বন্ধ হয়ে। তারা পথে বেরতে পাবে না। কবি অবশেষে একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে লাটের শুভাগমন দিনটিতে পাঠিয়ে দিলেন আশ্রমিকদের দূরবর্তী শ্রীনিকেতনে। লাটসাহেব দেখে গেলেন শূন্য আশ্রম, অভ্যর্থনাও পেলেন তেমনি। কবির কথা ছিল, আশ্রমে আসবেন লাট, সে আসা কি হবে আশ্রমবাসীকে অপমান ক'রে? এই যদি হয় ওদের ভদ্রতা, তবে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এরই আর একটুকু বেশি আচরণে আপনা থেকে দাঁড়ায় গিয়ে ভদ্রতার যে সুন্দর নমুনা! বলা বাহুল্য, এর পর থেকে বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি হল শিথিল, ভরপূর আশ্রমেই সকলের সুশৃঙ্খল উপস্থিতির মধ্যে চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে গেলেন পরবর্তী রাজপুরুষ।

ব্রিটিশের মার্ফৎ পাশ্চাত্যের শিক্ষার মিলনই কবি যেটুকু চেয়েছেন, চাননি ব্রিটিশের শাসন। আবার এ-ও সত্য, ব্রিটিশের আমলাতন্ত্রী দম্ভ, আর তার কৃত অপমানকর শাসনকেই কবি বাক্যে কাজে নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু সে বাধা তার জাতি বা তার মানুষকে নয়; আশ্রমে সকল মানুষের যোগই তাঁর কাম্য ছিল।

১৯১৩ সনের ১১ অক্টোবর কলকাতা থেকে এণ্ড্রুজকেই লিখেছিলেন,—"ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ ও অসংলগ্ন। এই জন্যই আমাদের মন এত প্রাদেশিকতার ভাবে বিভক্ত। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রদের ভিতর যতদূর সম্ভব প্রসার দৃষ্টি এবং বিশ্বমানবিক প্রীতি ও ঔৎসুক্য জাগাতে হবে। এ জিনিসটা বই পড়া থেকে নয়, জাগাবে তা আপনা থেকে অবলীলাক্রমে, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে।"—(Letters to a friend P, 38)

কেবল আদর্শের মোট কথাগুলি ব'লেই কবি ক্ষান্ত হননি। ব'লে বোঝাবার জন্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা তো আছেই, পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে কবির হাতে-কলমের কাজও রয়েছে নানা দিকেই। ইস্কুল চালানো এবং পড়ানোর সঙ্গে ঐ রকম কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্মের মধ্যে আরো একটি কাজ উল্লেখযোগ্য। কবি মৌলিক স্কুলপাঠ্য বইও অনেক লিখেছেন, সংকলন পুস্তকও তাঁর কৃত কয়েকখানিই আছে। অন্যের লেখা শিক্ষাগ্রন্থে তাঁর লেখা ভূমিকাও কম নেই। সংস্কৃতশিক্ষা, অনুবাদ-শিক্ষা এবং ইংরেজি-শিক্ষার প্রাথমিক প্রণালী নিয়ে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার ফল রয়েছে কয়েকখানি পুস্তিকায়; "শিশু" কাব্য থেকে "সহজপাঠ" অবধি লিখে তার দ্বারা বাংলার ছেলেমেয়েদের শুধু ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পথ সুগম করে গেছেন তাই নয়,—তাদের এক উৎসব জমিয়ে রেখে গেছেন। "ছড়ার ছবি"-তে রহস্যরসপূর্ণ "যোগীনদা" কবিতায় তাঁর ভূগোল-শিক্ষার মৌলিক প্রণালী লক্ষ্যণীয়। গল্প, গান, ছড়া, কবিতার যোগান তো আছে অসংখ্যই, বিজ্ঞানেও অনবদ্য রচনা রয়েছে তাঁর "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থে।

কেবল পুঁথিগত মানসিক শিক্ষাই নয়, দৈহিক চর্চার শিক্ষা-আয়োজনও করেছিলেন তিনি নানা দিক দিয়ে। সংগীত নৃত্য কবির কাছে শুধু একটি বিদ্যা-বিশেষ ছিল না, উপরন্তু মনকে বিশুদ্ধ, রসস্নিগ্ধ ও একাগ্র করে তুলে, সর্বপ্রকার শিক্ষার অনুকূল ক'রে দেয় বলে, সে সব বিদ্যার সার্থকতা ছিল কবির কাছে আরো বেশি; পূর্বোক্ত জাপানী 'ধ্যান চর্চার'ই মতো সংগীতের এই বিশেষ ক্রিয়ার দিকটি কবি লক্ষ্য করেছেন; 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' পুস্তকখানির একটি প্রবন্ধে তা জানা যায়।

আবার ওদিকে হাতুড়ি-বাঁটাল, ঝাঁটা-কোদাল থেকে লাঠি-সোঁটায় হাত পাকানো এবং মুগুর-ভাঁজা, দৌড়-ঝাঁপেও ছেলেমেয়েদের করিৎকর্মা করে তোলবার দিকে দেখা যায় তাঁর আয়োজন। এমন কি জাপানী যুযুৎসুর পিছনেও এ জন্য তিনি টাকা ঢেলেছেন এক সময়ে সাধ্যাতীত রকমে।

একটি কেন্দ্রে কয়েক জনকে গড়ে তোলা নিয়েই তাঁর চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই দেশের সর্বসাধারণেরও মধ্য থেকে অশিক্ষা দূর করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল ছিল। বিশ্বভারতী থেকে সাধারণের শিক্ষার জন্য লোকশিক্ষা সংসদের কাজ এখন দেশব্যাপী হয়ে দেখা দিয়েছে, এর মূলে কবিরই প্রবর্তনা। জনশিক্ষার আয়োজন জীবদ্দশায় তেমন কিছু করে যেতে না পারলেও পরিকল্পনা এবং তীব্র মনোবেদনা রেখে গেছেন নানা ভাষণের স্থানে স্থানে একান্ত আবেদনের মধ্যে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয় চালনা করত, ছাত্রীরা গ্রামের মেয়েদের মহলে শেলাই শেখাত। মেলায় জনতা-নিয়ন্ত্রণ ও সেবাকাজেও ছেলেদের উদ্যম দেখা গেছে। গুরুদেবের প্রোৎসাহে কলেজ বিভাগের অধ্যাপকগণ ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাঝে মাঝে পল্লীসমাজের তথ্য-সংগ্রহের কাজ করেছেন। গান্ধিজীর পুণা-উপবাসের সময়ে অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনের গঠনমূলক দিকটি নিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীসমাজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের কাজ করতে যেতেন! চরখার

সূত্রযজ্ঞ এবং গানের আসর উপলক্ষ্য ক'রেও তাঁরা সাধারণের সঙ্গে যোগ রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া তাদের বনভোজনের ক্ষেত্র প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণের যোগ-স্নিগ্ধ পল্লীপরিবেশে। এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মানুষের প্রাণ ও কর্মের উষ্ণ স্পর্শে-মাখা সামাজিকতার মধ্যে রেখে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনে বরাবরই চলে আসছে। কবির শিক্ষায়তন জনতা থেকে দূরে থাকলেও, জনতার কাছে দূরের জিনিস হয়ে থাকেনি।

তাঁর শেষ দিকের এই একটি নির্দেশ দেশবাসীর চিরস্মরণীয়। ১৩৪৩ সনে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর শেষ ভাষণ "ছাত্র সম্ভাষণে" কবি বলেছেন,—"আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহু শতাব্দী নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তিমূলে।...নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের।"

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ঐতিহ্য

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ঐতিহ্য

বিশ্বভারতীকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে স্বয়ং শ্রীনেহেরু জনসাধারণের নিকট অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি এখন জনসাধারণের। নিজের জিনিসকে নিজের সাহায্য করার কথা ওঠে না। কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের কথাই আমাদের মনে করে নিতে হবে। বিশ্বভারতীর স্রষ্টা একাকী সেই গুরু দায়িত্ব কী ভাবে পালন করছিলেন, কোথায় ছিল তাঁর শক্তি-কেন্দ্র, এ বিষয়ে জানা থাকলে বর্তমান দায়িত্বপালনে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও জনসাধারণের সকলেরই পক্ষে পথ সুগম হবে।

আপন-আপন সৃষ্টিকে সকলেই ভালোবাসে। নানাভাবে সে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। সৃষ্টির পিছনে কে কত ত্যাগ করেছেন, কে কত তার জন্য দুঃখকষ্ট অপমান স্বীকার করেছেন, অন্যেরা যখন বিমুখ, নানা দিক দিয়ে যখন বিরুদ্ধতা, তখনো কে তার প্রতি কত বিশ্বাসে ও অনুরাগে নিজ বক্ষের আশ্রয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছেন, এক মনে ও অশ্রান্ত চেষ্টায় তার উন্নতি ও কল্যাণের নানা পথে তাকে প্রবর্তনা যুগিয়েছেন,—এই সব দিক বিচার করতে হবে। তার যোগে দায়িত্বপালনের মান নির্ণীত হয়ে থাকে। কিন্তু, সকল উদ্যমের ইতিহাস কোন্ পরম সার্থকতার লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে উন্মুখ,—সেই ধ্যান-আদর্শটির উপরেই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের মানের তারতম্য।

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি বিশ্বভারতী। তার গড়ে-ওঠার দিনগুলির প্রতি চোখ ফেরালে দেখা যাবে, কবি তাঁর সৃষ্টিকে কী ঐকান্তিক যত্নেই না গড়ে তুলেছেন! তাঁর দায়িত্বনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পরিচালনা-প্রণালীর গুরুত্ব সমভাবে সম্বদ্ধ। তিনি আমাদের জন্য এ বিষয়ে যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, সেইটিই আজ আলোচ্য।

তাঁর এই সৃষ্টির যজ্ঞে আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে পত্নী মৃণালিনী দেবীর অলংকারও আহুতি পড়েছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন-ভাষণে সে-কথার উল্লেখ করেছেন।

সূচনাকালে আয়ের উপায় ছিল মাত্র জমিদারি থেকে পিতার ব্যবস্থায় কবির নিজের জন্য নির্দিষ্ট মাসোহারা। এর সঙ্গে চলতে থাকে নানা লোকের কাছ থেকে দানসংগ্রহের কাজ। ক্রমে গ্রন্থস্বত্ব এবং পরে নোবেল পুরস্কারের অর্থও এসে জোটে। প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শানুযায়ী ছাত্রগণকে বিনাবেতনে আবাসিক শিক্ষা বিতরণ করতে শুরু করেছিলেন। আশ্রম থেকে তাদের খাওয়া-থাকা ইত্যাদি যাবতীয় খরচও নির্বাহিত হত। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বিবরণ-স্থলে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন,—"রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের 'বোর্ডিং স্কুল' পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা এই গুরুভার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না···সুতরাং যথেষ্ট ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না, সকলেই বিরূপ।···প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণে বিদ্যাদান করিয়া অর্থ লইত না, অপ্রতিগ্রহ ছিল তাহার আদর্শ। শান্তিনিকেতনে সেইরূপ করিবার চেষ্টা হইল, অর্থাৎ ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইবে না। কিন্তু অধ্যাপকদের টাকা যোগাইতে হইল রবীন্দ্রনাথকে।"—(রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ২৮-২৯)।

এর পরে যখন থেকে ছাত্রবেতন ধার্য হয়, তখনও কাজের প্রসারের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে এবং সে সঙ্গে অর্থকষ্টের তীব্রতাও লেগে থাকে বরাবর সেই পরিমাণেই। অর্থসংগ্রহের কাজটা শ্রমসাধ্য তো নিশ্চয়ই, মানসিক উদ্বেগের চাপে অশান্তিকর আরোও বেশি। শান্তি-অশান্তি সবই কবি সঁপে দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আশ্রমের চিন্তায় ও ধ্যানে।

কবি লিখেছেন,—"অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয়নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে

ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১২৬-২৭) এ হল কাজের বাইরের দিকের কথা। বাইরের দিক দিয়ে আরো কতকগুলি বাধাবন্ধকও ছিল।

মরুপ্রান্তরসদৃশ প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার রুক্ষতা ও অনুর্বরতা ছিল শিশুদের প্রাণস্ফূর্তির ও সাধারণভাবে সকলেরই জীবনধারা বিকাশের প্রবল অন্তরায়। বন্ধুরতা দূর ক'রে জমিকে সমতলও করতে হয়েছে অনেক স্থলে। তাকে তৃণে লতায় পত্রে পুষ্পে আচ্ছাদিত সুশোভিত ক'রে তুলতে কেটেছে কত কাল। মানুষের বাসযোগ্য ক'রেই কাজ শেষ হয়নি, ক্ষয়িষ্ণু পোড়ো জমিকে পথে-ঘাটে পল্লীতে-প্রাঙ্গণে-ভবনে-তোরণে কুঞ্জে-বীথিতে সুগম ও নয়নাভিরাম করা হয়েছে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় যখন তৃষ্ণায় হানছে, তখন এই প্রান্তরে একখানি হাতপাখার আশ্রয়ে থেকে কবি ঠেকিয়েছেন দুপুরের হল্‌কা, তার পরে মিলেছে সুযোগ; তখন গেয়েছেন—"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত সৌরভ-রভসে ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা শ্যামগম্ভীর সরসা।" বাইরের সজলতার অভাবের মধ্যে কবি খুলেছেন প্রাণসত্রের বিচিত্র আয়োজন। নিজের প্রাণপ্রবাহের অনেকখানি ঢালতে হয়েছে এর পথে-পথে। তবেই না এখানে এমন দিকে-দিকে 'মরুবিজয়ের কেতন' শূন্যে শূন্যে উড়তে পেরেছে! তা, যেমন উড়েছে মাটির প্রকৃতিতে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিতেও। শান্তিনিকেতনের দিকে চাইলে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাবে সবটাতে মিশিয়ে রয়েছে মানুষের এই বাণী :—"বাধা নাহি মানি!"—('বাণী',—বীথিকা)।

বিচিত্র সৃষ্টির কাজ উপলক্ষ্য করে কবি যে মানুষকে মেলাতে চেয়েছিলেন পরম ঐক্যে, তাতেও বাধা ছিল নানাদিকে। কতবার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় উঠেছে চারদিককার মানবসমাজকে মথিত ক'রে,—কবি শান্তিনিকেতনকে কোনো দিকে হেলে পড়তে দেননি। অথচ,

যেখানে দুঃখ, যেখানে নির্যাতন,—অন্তর্গূঢ় বেদনার ধারা নিরুদ্ধ হয়ে ছুটেছে সেইদিকে। দেশের আর্তত্রাণের সঙ্গে বিদেশের দুর্গতসাহায্যেও শান্তিনিকেতনের হিতব্রতের আয়োজন দেখা দিয়েছে নানাসময়ে। রাশিয়াকে একদিন কবি এরূপ সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন আবহাওয়া ছিল বিরুদ্ধ। আন্তর্জাতিকতার মান তার মধ্যেও তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন বিদেশের বেলায়ও। তাতে অপ্রিয়তার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারংবার। তখনো কোনো সম্মান, সৌহার্দ্য বা কোনো সাহায্যপ্রত্যাশা—কোনো কিছুতেই তাঁর সত্যঘোষণায় বাধা জন্মাতে পারেনি। ইটালি থেকে যে সাহায্য অভাবিতভাবে সুলভ হয়ে উঠেছিল, মুসোলিনীর এক-কর্তৃত্ববাদের প্রতিবাদ না করলে, হয়ত অত আকস্মিক তা হারাতে হত না। তা ছাড়াও আরও দৃষ্টান্ত আছে। ইংরেজের রাজত্বে থেকে ইংরেজের দেওয়া রাজকীয় 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করা কিংবা শেষদিকে পাশ্চাত্যের 'সভ্যতার সংকট' ঘোষণা করা বিষয়বুদ্ধির দিক দিয়ে বিদেশে তো লাভজনক ছিল না মোটেই, দেশেও শান্তিনিকেতনের নিরাপত্তা তাতে বিঘ্নিত হবারই কথা ছিল প্রতিকূল সরকারী প্রতিবন্ধকতায়। তবু কবি তাঁর বাণী উচ্চারণে নিরস্ত হননি। এই কার্য্যরীতির দ্বারা একভাগ যদি তিনি বিত্তভাণ্ডারের ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে থাকেন, তার শতগুণ লাভের শক্তি জমা রেখে গেছেন শান্তিনিকেতনের চিত্তভাণ্ডারে। সে শক্তি সত্য বলার শক্তি; এই শক্তি সেখানকারই সম্পদ—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"…।

সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত কর্ম ও ভাবনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন কবি আশ্রম-আদর্শের প্রদীপটিকে বিরুদ্ধ সব বাত্যাঘাত থেকে। সরকারী নীতির পোষকতা করলে লাভের সেও একটি বড়ো সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই নজির অন্যরূপ। বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত হল বিখ্যাত স্বাদেশিক 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হাতে।

কবি লিখেছেন, "তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল,…পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক…। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌছয়নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেননি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ২৬-২৭)

বিদ্যালয় নিয়ে কবি যখন 'বিশেষ ব্যস্ত' সে সময় তিনি একবার সাক্ষীর সপিনা পান। যেতে হয় খুলনার আদালতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি একজন স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীর সংস্রবে। রাজরোষে সেই কর্মীটির জীবিকার পথ,—জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ,—বন্ধ হয়। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক করে নেন। সে বিষয়েও যখন সরকারী বাধা প্রবল হল, তখন তাঁকে নিজের জমিদারির কাজে নিয়ে শিলাইদহে নিযুক্ত করেন। অসহায় অনেক ছাত্র ও কর্মীকে এভাবে তিনি আশ্রয় ও জীবিকা দিয়ে রক্ষা করেছেন। বাংলার জনৈক প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতার পুত্রদ্বয় এককালে এই আশ্রয় লাভ করেছেন। তাছাড়াও অভিভাবক অন্তরীণে আবদ্ধ পড়ে আছেন, দেখা-শোনার কেউ নেই, আশ্রমের এমন দুটি অবাঙালী শিশু ছাত্রের জন্য কবির মর্মবেদনা একদা কী মর্মন্তুদভাবেই না পত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে! সম্প্রতি অনুরূপ আরেকটি ঘটনার কথাও (বিশ্বভারতীর গ্রন্থনাধ্যক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কথিত) শোনা গেছে। কবি একদিকে ছিলেন বজ্রকঠোর, অন্যদিকে ছিলেন আবার কুসুমকোমল। যারা একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসে পড়েছে, তাদের জন্য তাঁর স্নেহ ছিল সুগভীর। তারা যত অসুবিধেরই সৃষ্টি করুক পারৎপক্ষে তিনি তাদের দূরে সরাতেন না। ভাষণে রয়েছে—"মনে পড়ে, যে সব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে, তাদের বিদায় দিইনি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বারবার তাদের

ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই সকল ছাত্র পরে কৃতিত্ব লাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফল-লাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১২৫)।

কবির আশ্রয়স্থল ছিল তাঁর সাধনার সত্য। সত্যের নির্দেশ অপেক্ষা করে থাকতেন তিনি যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতার কাছ থেকে। শান্তিনিকেতনকেও প্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলেন সেই আত্মবলের ভিত্তিতেই।

জনসাধারণের যোগও তিনি চেয়েছেন, তবে সে যোগের পথ সাধারণ স্বাদেশিকতার আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র রকমের। সেটুকু বুঝে নিলে সকলেরই মন শান্তিনিকেতনের প্রতি সহজে অনুরক্ত হতে পারে, কবির জীবদ্দশাতে তাই হয়ে উঠেছিল। তিনি তা শেষ জীবনে লক্ষ্য করে এক ভাষণে বলেছেন: "আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি—এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে, দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩০)

অথচ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বৈদেশিক বৃটিশ প্রভুত্বের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে যেমন সরকারী সহযোগের সৌভাগ্য বর্জনে দ্বিধা করেননি, তেমনি তাঁর যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ ভিন্ন পথের স্বাদেশিকতাকেও তিনি অবলম্বন করেননি কোনো সুবিধে বা সাহায্যপ্রত্যাশায়। বলছেন, "এক সময়ে আমার কাছে

প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্য সাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের যোগান হয়ত এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই—সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩০-৩১)

ইদানীং বিগত নির্বাচনের সময় জনৈক রাজনৈতিক কর্মী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ভোটসংগ্রহে। তিনি তাঁর দলকে ভোট দিতে বললেন। যুক্তির মধ্যে এই কথাটাই শোনালেন, বিশ্বভারতীকে দাঁড়াতে হলে রাষ্ট্র-আশ্রয় চাই একান্তই। রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে যখন তাঁদেরই দল, তখন সে দলের সাহায্য পিছনে না থাকলে কে বাঁচাবে শান্তিনিকেতনকে? কথার সুরে ঝাঁজ ছিল প্রচ্ছন্ন। অগত্যা তাঁকেও স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার হল যে, সূর্য অস্ত যায় না যার রাজত্বে এমন বৃটিশসিংহের আমল পেরিয়ে এসেছিলো শান্তিনিকেতন রাষ্ট্রসাহায্য নিরপেক্ষরূপেই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের আওতায় পরাধীনতার এই মন্ত্রে যদি দীক্ষা নিতে হয় নূতন করে, তবে শান্তিনিকেতনের চেয়ে আগে আশঙ্কার কারণ ঘটবে স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজেরি। শান্তিনিকেতন সরকারী আশ্রয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে, এই ধারণার প্রশ্রয় মারাত্মক। হয়তো, সেই দুর্দৈব থেকে রক্ষা করতেই রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীনেহেরু সাহায্যের সর্বজনীন আবেদনপত্র বারবার এমন সর্বসাধারণের উদ্দেশে প্রচার করছেন, রাষ্ট্র-সাহায্যকে প্রাধান্য না দিয়ে। গুরুদেবের সাধনায় সত্য এবং তাঁর আজীবন সাধনানিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন মহাত্মাজি। জাতির পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব বহন করবার অবশ্যকর্তব্যতা তিনি মুহূর্তমাত্র বিস্মরিত হননি।

তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীনেহেরুকে তিনি এই দায়িত্বই ন্যস্ত করে গেছেন চলে যাবার আগে। টেনেবুনে কায়ক্লেশে যেমন করেই দিন চলে থাকুক, রবীন্দ্রনাথের কাজই রবীন্দ্রনাথের কাজকে সচল রাখবে, উপর থেকে কিছু চাপানো হবে না, এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে দেশের রাষ্ট্রদপ্তরে। আচার্য্য নেহেরুর আবেদনেও দেখা যায়, বিশ্বমানবের যোগযুক্ত বহুমুখী কাজের কথাই স্থান পেয়েছে তার মুখ্য যুক্তি হয়ে। শান্তিনিকেতনের আদর্শে ও কাজে শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই সাহায্য দান বা জাতীয় কর্তব্য উদ্‌যাপন করা। সকলের সঙ্গে রাষ্ট্রও তার সাহায্যহস্ত প্রসারিত ক'রে সেই মহৎ ব্রতেরই সুযোগ পাবে মাত্র। যখন যে এই শ্রদ্ধা থেকে শান্তিনিকেতনের সহযোগে যুক্ত হতে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই নিয়ে গেছেন পূজাপ্রাঙ্গণে। কারো দয়াদাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহের দানে বেদির মর্যাদা লাঘব হতে দেননি। তিনি বলেছেন,—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে"।—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫৩) তবে একথাও সত্য যে, তিনি কাউকে তুচ্ছ করেননি। সকলের কাছেই তিনি গেছেন তাঁর সত্যের বাণী নিয়ে। সাধনার অধিকারে সকলের যোগকে তাঁর দিক থেকে তিনি সহজ করতেই চেষ্টা করেছেন। যারা অন্য বিষয় রাজ্যের লোক, তাদেরও শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার জন্য এবং সাহায্য আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর যে কৃচ্ছ্রতাবরণ, সে সব ঘটনা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর মমত্ব পরীক্ষার নিদর্শন হয়ে আছে।

বাইরের দিকে প্রধানতঃ তিনি নির্ভর করেছিলেন বেশি শান্তিনিকেতনের কাজের উপরে এবং সে সঙ্গে সেখানকার মানুষের উপরেও। সেইজন্যই মানুষ সংগ্রহ করে তাদের কাজে লাগিয়ে গেছেন। আবার কাজ এবং মানুষের মধ্যে যোগসূত্ররূপে স্থাপিত রেখেছিলেন কেবল প্রেরণামূলক বাণীকেই নয়, কর্মপদ্ধতিকেও নয়, তার সঙ্গে বড় করে দেখেছিলেন মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকেও। সেই সম্বন্ধ যাতে গড়ে ওঠে, এজন্য বিদ্যালয়কে ছোটয়-বড়োয় মিলে একসঙ্গে থাকার ঘরোয়া রূপ দিয়েছিলেন ; কারখানা বা অফিস-আদালতের

শ্রেণী বাছাই করা কামরায় বিভক্ত পোশাকী রূপ দেননি। গুরুপল্লী-শ্রীপল্লীতে অধ্যক্ষ এবং কেরাণী একরকমের বাসাবাড়িতেই পাশাপাশি বাস করেছেন। ছাত্রদের নিয়ে বনভোজন তো ছিলই, মাঝে মাঝে এক এক বাসায় এক এক বর্গকে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও হত। এতে ঘরের ছেলের মতো করে শিক্ষকেরা ছাত্রদের দেখতে পেয়েছেন; ছাত্ররাও শিশুসুলভ নানা উপদ্রব করতে করতে শিক্ষকদের আপন বাড়ির লোকের মতোই অনুভব করেছে। সান্ধ্যবিনোদনে গল্পে-গুজবে, গানে-অভিনয়ে অলক্ষ্যে যে সূত্র গড়ে উঠত, সেটি ছাত্রেরা আরো বেশি স্পষ্ট ক'রে নিবিড় ক'রে বুঝতে পেত বাইরে গিয়ে। এক একজন অধ্যাপক গভীরভাবে ছাত্রদের মন আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁদের জীবনের দানে। জীবনে জীবনে বৃহত্তর শান্তি-নিকেতনের বীজ বপন করে দিয়েছেন তাঁরাই। ছেলেরা গেয়েছে

"আমরা যতই মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের প্রাণের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।"

শান্তিনিকেতনের এই গানের মধ্যে ধরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের রক্ষামন্ত্র। গুরুদেবের এই মন্ত্র অধ্যাপকেরা আবার ছাত্রদের জীবনের রক্ষাকবচে ভ'রে দিয়েছেন। সময় সময় প্রাক্তন ছাত্রদের এক একখানি চিঠিতে নিগূঢ় এই ইতিহাসটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কোন প্রাচীন অধ্যাপককে জনৈক ছাত্র বিলেত থেকে লিখছেন;

11 George Square
Edinburgh. 6/8/14

শ্রীচরণেষু

মাস্টার মহাশয়

অনেক দিন মনে করিয়াছি আপনাকে চিঠি লিখিব কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নাই, কেন হয় নাই তার ঠিক উত্তরও দিতে পারি না। আপনি হয়ত

ভাবিয়াছেন আমি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। আশ্রমের ভিতর কেবল আপনার কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। কবে আপনাকে কি যন্ত্রণা দিয়াছি, কবে আপনি কি কথা বলিয়াছেন সব মনে পড়ে। যদিও আপনার বহুমূল্য উপদেশ সকল আমার কাছে প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে তথাপি আপনার উপদেশ এখনো আমার মনের ভিতর আছে। আপনার সে সব কথা আমার মনে আছে। কোন দিন নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। আপনার এ ঋণ শোধ দেবার মত নয় এবং কোন দিনও শোধ দিতে পারিব না। যখন অনেকেই আমার আশা ছাড়িয়া বিপক্ষে ছিলেন তখন কেবল আপনি আমাকে স্নেহের সহিত কথা বলিয়াছেন, ডাকিয়া কাছে নিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, গায়ে হাত বুলাইয়াছেন। সে সকল কথা ভাবিলে চোখে এখনো জল আসে। যেখানে অন্য সকলে বকেন, গালি দেন এবং ভয় প্রদর্শন করেন সেখানে আপনি স্নেহ দেখান, কাছে ডাকেন, শান্তভাবে বুঝাইয়া দেন দোষ কোথায় এবং ইহা হইতে মুক্তি পাইবার কি উপায়। ঐ যে বুঝাইয়া দেন তাহাতে সহস্র বেত হইতে বেশি শিক্ষা হয়, সেখানে আপনি চোখে জল দেখা দেয়। যদিও আমরা আপনার স্নেহের যোগ্য ছিলাম না, যদিও আমরা আপনাকে মানিতে চাহিতাম না—আপনাকে কষ্ট দিতাম, তথাপি আপনি আমাদের স্নেহ করিতেন। আপনি জানিতেন 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো' এবং আপনি ইহা আমাদের অনেক বার বলিয়াছেন। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে আমি গত মার্চ মাসে এখানকার Matric পাশ করিয়াছি। আমার এই সফলতার দিনে আপনাকে মনে পড়িয়াছে।

আমরা এখানে বেশ ভালই আছি। চণ্ডীদার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সে Glasgowতে থাকে, সেও বেশ আছে। আপনার মঙ্গল সংবাদ সহ পত্রের প্রত্যাশা করি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি।

সেবক

সু.........

কবি নিজের ছেলেদেরও রেখে দিয়েছিলেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। একত্র খেলে বেড়িয়ে একরকম খাওয়াদাওয়ার মধ্যে একই বাসস্থানে একই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থেকে এঁরা অন্যান্য ছাত্রদেরই মতো দিনাতিপাত করেছেন। এজন্য তাঁকে একদা দুর্দৈবের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তিনি তা গায়ে মাখেননি। বরং তিনি লিখেছেন,—"উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই।...এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই।...রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে।...মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্র খায় থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোনো পার্থক্য রাখি নাই।"—(স্মৃতি পৃঃ ৭৮। পত্র ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬) অধ্যাপকদের প্রতি কবির কতখানি নির্ভর ছিল এবং অধ্যাপকেরাও কবির সন্তানদের কী স্নেহে দেখেছেন ও তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, কবির কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শমীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র থেকে তা জানা যায়। পত্রগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জনৈক অধ্যাপককে সে একখানিতে লিখেছে ঃ

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
২১এ আশ্বিন ১৩১৪
মঙ্গলবার।

শ্রীচরণেষু,

মাস্টার মহাশয়,

সব ছেলেরাই চলে গেছে—কেবল আমি আর প...দাদা আছি। আমি উপরে বাবার ঘরে শুই এবং পড়াশোনা করি। খাতা বই প্রভৃতিও এইখানেই থাকে। পটলদা, নীচের ঘরে থাকে। তারও বই প্রভৃতি ঐখানেই থাকে। শ্যামদা, মন্মথ প্রভৃতি মালদহের ছেলেরা ছিল—কাল তারা চলে গেছে।...

পশু´ আমরা চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে গিয়েছিলাম সেটা এখন থেকে ১২ মাইল দূরে। ৩টা গরুর গাড়ী এসেছিল।

ভূপেন বাবু, জগদানন্দ বাবু, তারিণী বাবু, শাস্ত্রী মহাশয়, ভূপেন বাবুর একজন বন্ধু, পূর্ণ বাবু, শ্যামদা, মন্মথ, পটলদা, হিমাংশু, ভবানীদা, আমি তাতে চড়ে ৫।৬ মাইল একটু রৌদ্র পড়লে হেঁটে আরও ৫।৬ মাইল গিয়ে নান্নুর গ্রামে পৌছলাম। নান্নুরেই চণ্ডীদাসের ভিটে। গ্রামটি মন্দিরে পূর্ণ। এক জায়গাতেই প্রায় ১৪।১৫টি মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরগুলোর পাশে একটা একতলা সমান ঢিপি। তাতে অনেক ইট প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে এখানে কোন বাড়ী ছিল। লোকে বলে সেইখানে বিশুলা দেবীর মন্দির ছিল আর সেই-খানটাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলে। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছাতনা। কিন্তু তিনি ভ্রমণ করতে করতে এই গ্রামে এসে নির্জন দেখে বিশুলা দেবীর মন্দিরে অবস্থান করেন। বিশুলা দেবীর মন্দির এখন সেই ভিটার পাশেই। সেই গ্রামটি বেশ নির্জন। যখন সেখান থেকে বাড়ী ফিরি, তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। সেখানে কিছু মুড়ি কিনিয়া খাইয়াছিলাম।

কাল ভোরে জগদানন্দ বাবুর সঙ্গে আমি আর পটলদা বারহারওয়া যাব। আপনি কেমন আছেন? ভোলা কেমন আছে? জ্যাঠামহাশয়, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি কেমন আছেন? আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি

প্রঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মামাকে চিঠি লেখা হয়নি। ২।১ দিনের মধ্যে লিখব। তাঁদের ঠিকানাটা লিখে পাঠাবেন। আপনি কি সমস্ত ছুটি ওখানে থাক্‌বেন? ইতি

প্রঃ শমীন্দ্র

এই পত্রে শমীন্দ্রনাথ তাঁর একটি ব্যক্তিগত অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেটি বাবার কাছে না লিখে লিখেছেন অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক কবির গোচরে তা নিবেদন করেন। কবি তখন পুত্রকে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেন মুঙ্গেরে; সেখানে শমীন্দ্রের বন্ধু ছিল, তারই একজন সঙ্গী। বন্ধুর কাছে কিছুদিন ছুটিটা বাইরে কাটিয়ে আসা হবে,

তাতে শরীর মন সব দিক থেকেই ভালো হবার কথা। এই বন্ধু-ছেলেটি ছিল গুরুদেবেরই পরমবন্ধু শ্রীশ মজুমদার মহাশয়ের ছেলে। সুতরাং তাদের বাসা একরূপ আপন গৃহ বলিলেই হয়, নির্ভাবনার বিষয়ই ছিল। নিয়তির চক্র,—সেই যাত্রাই কাল হল, জগদানন্দ বাবু সেখানে সুস্থ রেখে এলেন, কিন্তু দুদিন বাদেই (মাত্র ১২ বৎসর বয়সে) আকস্মিক কলেরার আক্রমণে শমীন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন। শমীন্দ্রকে মুঙ্গেরে পাঠাবার প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত অধ্যাপকের নিকট কবি যে পত্রখানি লিখেছিলেন, তা এই ঃ

ওঁ

পোস্টমার্ক ১৪ অক্টোবর
১৯০৭

কল্যাণীয়েষু

শমীকে মুঙ্গেরে পাঠানই স্থির করিয়াছি। তোমার আসিবার দেরি আছে এইজন্য জগদানন্দ তাহাকে পৌছাইয়া রাখিয়া আসিবে। পরে তুমি যদি ইচ্ছা কর ও অবকাশ পাও ত মুঙ্গেরে যাইতে পার। ইতি সোমবার

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আগামী কল্য আমি বোলপুরে যাইব।

স্বাধীন স্ফূর্তির আবহাওয়ায় অধ্যাপকদের কবি গড়ে নিয়েছেন, উদ্বোধিত করেছেন কী ভাবে, তার পরিচয় জানতে হলে এক একটি কর্মবিভাগের ইতিহাস জানতে হয়। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কাজের পথ প্রশস্ত হল বিদ্যা-ভবনে ; কবি লিখেছেন, "পরম সুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তার সাধন করা দরকার।…এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান ;…তারপর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেননি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে,

এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনি ভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।”—(বিশ্বভারতী পৃঃ ২২-২৩)

এ ছাড়া আরো যে সব অধ্যাপক আশ্রমে এসে মিলেছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই পেয়েছিলেন যোগ্য আসন। তাঁদের যোগ্যতর করে তুলতে কবির চেষ্টার বিরাম ছিল না। কবি বিশ্বভারতীর সূচনাকালের একটি আলেখ্য এঁকে ভাষণে বলছেন, “আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে! সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহা-স্থবির; ক্ষিতিমোহন বাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটেছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহন বাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।”—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৮)

কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে অনেককে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য কবি বিদেশে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, মুকুলচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রমোহন সেন প্রভৃতির কথা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেও অনেকস্থলে উল্লিখিত আছে।

এঁরা প্রত্যেকেই কৃতিত্ব অর্জন করে দেশে ফিরে এসেছেন। শান্তিনিকেতনের কর্মে এঁরা সহায়তা করেছেন এবং এঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাইরেও অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছেন। আশ্রমে তো অনেক ছাত্রকে গুরুদেব

সাহায্য করতেনই, এমন কি, আশ্রমের বাইরেও তিনি অধ্যাপকদের সংশ্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের পড়াশুনায় নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, তারও উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপকদের কথার মূল্য এবং ছাত্রসমাজের প্রতি দরদ কবির কাছে এতই ছিল। একখানি পত্রে তিনি এক অধ্যাপককে লিখছেন :—

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

কল্যাণীয়েষু

সেই ছাত্রটিকে কতদিন সাহায্য করিতে হইবে লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। আগামী মার্চ মাসে বোধ হয় পরীক্ষার সময়। ইতি

১৯শে মাঘ ১৩১২
(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী সোম মঙ্গলবারে কলিকাতায় যাইব!

আশ্রমের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা স্বভাবতঃই প্রতিভাবান, তাঁরা কবির সহায়তা ও পরিচালনা লাভে নানাদিকেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু যে-সব কর্মী কোনো এক সময়ে এসে কর্মনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা নিয়ে আশ্রমের জীবনের এক-এক কোণে স্থান লাভ করেছিলেন, কবির অন্তরের স্পর্শ তাঁদেরও নানা উপলক্ষ্যে ধন্য করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে মহৎ জীবনের সাধনায়। দীপের শিখা নিভে যেতে যেতে যজ্ঞাগ্নির জোগান পেয়ে জ্বলে উঠেছে বারে বারে। একখানি পত্রে কবি লিখছেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমাদের নববর্ষের উৎসব শেষ হইল। তুমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। যাহা হউক আমি আশীর্বাদ করিতেছি এ বৎসর তোমার

জীবনে কল্যাণ বহন করিয়া আনুক। তুমি ভক্তি লাভ কর, শক্তি লাভ কর, আনন্দ লাভ কর। রুদ্রদেবের প্রসন্নতার জ্যোতি সাধনার দুর্গম পথে তোমাকে নিত্য নিয়ত রক্ষা করুক। তুমি ভ্রমণে বাহির হইবে লিখিয়াছ তোমার ভ্রমণ সফল হউক। ইতি

শুভেচ্ছু (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখা যাচ্ছে, কাছে বা দূরে যেখানেই যিনি যখন থাকুন, গুরুদেবের কাছে সকলেরই জীবনের যোগ ছিল নাড়ির মতো অবিচ্ছিন্ন। যেতে-আসতে তাঁরাও তাঁকে না জানিয়ে থাকতে পারেননি, তিনিও তাঁদের সর্বত্র আচ্ছাদিত করেছিলেন আশীর্বাদের মঙ্গলচ্ছায়াবিস্তারে। উৎসবে আনন্দে সামান্য কাউকেও বাদ দিয়ে তাঁর মন ভরত না। সকলের কথাই তিনি মনে রাখতেন। এঁদের কোনো উদ্যোগে তাঁর সহানুভবতা কিরূপ উদ্দীপ্ত ছিল, তার বিষয়ে ধারণা করা যাবে নিম্নের এই পত্রখানা থেকে :—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার চিঠিতে আমি তোমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছি তোমার চিঠিতেও তুমি আমার নিকট সেই একই প্রস্তাব করাতে আমি আনন্দিত হইলাম। তুমি পড়াশুনা করিয়া প্রস্তুত হইতে থাক এবং তোমার জীবনকে চিরদিনের জন্য নিঃস্বার্থ মঙ্গলব্রতে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হও এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

তোমার পকেট খরচার স্বরূপ প্রতি মাসে তোমাকে পাঁচ টাকা করিয়া ভূপেনবাবু তোমাকে দিবেন। যদি পার তবে ১ ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা বিদ্যালয়ের কাজ করিয়ো। কারণ, কার্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলে তুমি ক্রমশ পিছাইয়া পড়িবে। ঈশ্বর তোমার অন্তঃকরণকে মঙ্গলে সুদৃঢ় করিয়া তোমার জীবনকে সার্থক করুন। ইতি ৪ঠা পৌষ। ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—ভূপেনবাবুকে বলিয়ো কলিকাতা হইতে ধর্মপালের পত্র না পাইলে যেন তিনি কাশী না যান। কাজের অসুবিধা করিয়া তাড়াতাড়ি যাইবারও প্রয়োজন নাই। অবসর বুঝিয়া যাইবেন।

ইতিপূর্বে জনৈক ছাত্রের এবং কবির পুত্র শমীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি ও আরো যে ক'খানি কবির লেখা চিঠি এ প্রবন্ধে সংকলিত হল, এ সবই একই ব্যক্তিকে নানা সময়ে লিখিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অধ্যাপকটি ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করতেন। অত্যন্ত আর্থিক অভাবগ্রস্ত ছিলেন এবং স্বাস্থ্যেও ছিলেন একটু দুর্বল। এক সময়ে তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত কাজের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে পড়াশুনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর দিক থেকে এতে কিছু শৃঙ্খলারও ত্রুটি ঘটে। কবি তাঁকে জানতেন। তাঁর সাময়িক মানসিক অস্বস্তি মমতার সঙ্গে লক্ষ্য করেন। ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষা করে কর্মীটি যাতে স্বস্তি পান ও দুদিন পরে নবোদ্যমে শান্ত সুস্থ চিত্তে কাজে লাগতে পারেন, তার জন্য অচিরেই আবশ্যকীয় অবসরের ব্যবস্থা তো করলেনই, উপরন্তু বিনা বেতনের স্থলে পাঁচ টাকা করে "পকেট খরচার স্বরূপ" মাসিক সাহায্যেরও নির্দেশ দেন। তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না,—কাজের যোগ রক্ষা করা যে তাঁরই কল্যাণের কারণ, তাও তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। এই অধ্যাপক ব্যক্তিটি সংসারে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে থাকুন, কিন্তু স্বীয় কর্মবৈশিষ্ট্যে শান্তি-নিকেতনের ইতিহাসের এক স্থলে এমন একটি উদাহরণ রেখেছেন, যার তুলনা কমই মেলে। হোক সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতিলীন, তবু একদিন যখন সকল কিছুর খোঁজ পড়বে তখন লোকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগিয়ে তা নীরব মহিমায় উদ্ভাসিত হবে একটি সুদূর প্রাণজ্যোতিষ্কের পুণ্যজ্যোতিরূপে।

শান্তিনিকেতনের দৈন্য অবস্থা তো লেগেই ছিল। কবিও তা নিয়ে দায়গ্রস্ত রয়েছেন বরাবরই। মধ্যে মধ্যে আশ্রমেও কর্মীদের মধ্যে আশ্রমের দুরবস্থা প্রকাশ করে দুঃখ না করতেন এমন নয়। অধ্যাপকের হাত-খরচা ছিল তখন কুড়িটি টাকা। তিনি তার থেকেই পোস্টাফিসের খাতায় জমিয়েছিলেন শ'

খানেক টাকা। একদিন কবির কাছে গেলেন। অতি সংকোচে সেই একশ'টি টাকা তাঁকে আশ্রমের সেবার কাজে লাগাতে নিবেদন করলেন। আর বললেন, মাসিক কুড়িটি টাকা থেকে দশ টাকা করে বাদ দিয়ে তাঁকে হাত-খরচা এখন থেকে দেওয়া হোক দশ টাকা। তাতেই তাঁর চলবে। পরবর্তী জীবনে তাঁর নিদারুণ অর্থাভাব ও পরিবার প্রতিপালনের দুর্বিষহ কৃচ্ছ্রতা দেখে ধারণা করা কঠিন ছিল যে এই ব্যক্তি একদিন এমন মহানুভবতাও দেখাতে পেরেছিলেন। আজকের বিশ্বভারতী সরকারী সাহায্যে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, মনে রাখতে হবে,—এই অধ্যাপকের অনুরাগ ও আত্মত্যাগের মতো ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রতিষ্ঠানের জীবন।

যতদিন নিজের ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই আকর্ষণ শান্তিনিকেতন-সংশ্লিষ্ট সকলে দেশবিদেশে অনুভব করবেন, ততদিন এর জন্য ভাবনার কারণ নেই। সামান্য কর্মীর প্রাণেও কবি দুর্লভ এই আদর্শনিষ্ঠা জাগাতে পেরেছিলেন।

আশ্রমের বাইরেও কবি আশ্রমের আদর্শের প্রতি অনুরূপ প্রীতি, সাধারণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত করে তুলছিলেন। এ সঙ্গে আরেকটি দানের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটিকে বিদ্যালয়ের কাজে সর্বপ্রথম অযাচিত দান ব'লে কবি নিজেই বিশেষিত করেছেন। ভাষণে বল্‌ছেন,—"মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আর জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই ব'লে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম···সহানুভূতি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১২৬)

"রবীন্দ্রজীবনী"-কার এ প্রসঙ্গে লিখছেন,—"এই দান অত্যন্ত অভাবের সময় কবির হস্তগত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে মোহিতচন্দ্রকে

লিখিলেন, (২৬ ফাল্গুন ১৩০১) "ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র, কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল এবং নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে। আপনি আমাকে দুঃসময়ে হঠাৎ সচেতন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৫) আমাদের উল্লিখিত আশ্রম-অধ্যাপকটির দানের কথার এরূপ কোথাও উল্লেখ নাই,—কিন্তু "রবীন্দ্র-জীবনী"-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেই প্রসঙ্গত আমরা সর্বপ্রথম এই নীরব দানের কথা শুনতে পাই, পরে সবিশেষ জেনেছি।

এবারে কবির সাধনাপর্বের একটি কার্যক্রম নির্গলিত হয়ে আসছে। প্রথমত দেখা যায় সৃষ্টিতপস্যার প্রতি খাঁটি অনুরক্তির মধ্যে কবি তাঁর পাথেয়-লাভের বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন; বাইরের উপকরণের প্রয়োজন মনে করেছেন কিন্তু প্রাধান্য দেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর একাগ্রতা ছিল বাধা-না-মানা অভিযানের দিকে। তৃতীয়ত তাঁর কর্মকৌশলের মধ্যে মেলে, কাজের প্রসার ও তদনুযায়ী সহানুভূতির সঙ্গে উপযুক্তরূপে কর্মী গঠন করা। সেই কর্মীদের মধ্যে কার্য-রীতির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের প্রতি কর্মীদের অন্তরেও অনুরাগ উপ্ত করা। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল অনেকেই। তার মধ্যে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটিও ছিল একজন। তার সাধ্য সে করেছে। ভিতরকার এই আত্মনিবেদনের শক্তি-জোগানটুকু দিয়েই কাজের মান সৃষ্টি হয়। পিছনে এই শক্তি অন্তঃসলিল না থাকলে, আকারে কাজ স্ফীত হলেও প্রকারের যাচাইয়ে তা কালের সভায় অনাদৃত হয়ে থাকে। বিরাট সেতুবন্ধনের ইতিহাসে কাঠবিড়ালী হয়তো ছিল ঐ একটিই। কিন্তু তারই দানের গৌরবেই আজো ঘটনাটি মানব-মনে অঙ্কিত হয়ে আছে শ্রদ্ধার উজ্জ্বল রেখায়। সুতরাং সাহায্যের আবেদন বাইরে যতই প্রচারিত হোক, যত সাহায্যই তাতে মিলুক, ভিতরের এই কবির কর্মকৌশলগুলির কথাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও

চাইনে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৮)

শান্তিনিকেতনের সাধনার পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। সামান্য কিছু বলতে হয়। কবির কথাতেই তা বলা যাক। "আমাদের দেশে এখানে-সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা-ঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন। রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র ...ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ-পুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত-সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৪৮-৪১)

এখানে এটুকু বলা আবশ্যক,—বিদ্যা এবং চরিত্রের সুষ্ঠু সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে; শান্তিনিকেতনে কবির সাধনায় মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ করাই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কারণ একস্থলে কবি বলছেন,—"কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫২)

বিদ্যা না হোক, শুধু চরিত্রে মহানুভব হলেও তার মূল্য অপরিসীম। পূর্বোক্ত সামান্য অধ্যাপকের ঘটনাটি বিদ্যার জৌলুষের চেয়ে বেশি করে চরিত্রের একটি বিশেষ প্রকাশে সমুজ্জ্বল। প্রতিভায় যদি বা খাটো থাকি, পণ্ডিত না হই, গুণী না হই,—আমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করলে চরিত্রের নানাদিক দিয়ে ঔজ্জ্বল্য সাধনে সফল হলেও হতে পারি। মহৎ আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পরাকাষ্ঠা। জীবনের ব্যবহারে রূপায়িত সেই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, আমাদের জন্য রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের পরম সম্পদ ও শক্তিসঞ্চয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানের মহত্ত্ব ও গভীরতা পরিমাপ করবার সর্বোচ্চ মানদণ্ড যদি দেখতে চাই তবে এসব কথাও বাহ্য হয়ে পড়ে। তিনি যে প্রতিষ্ঠানকে এত ভালোবেসেছেন, যাকে আত্মজের মতোই সযত্নে এমন সাধনায় গড়ে তুলেছেন, তার স্বাধীন বিকাশ কামনা করে তার ভাবী প্রগতির পথ নির্মুক্ত রাখবার জন্য তিনি নিজের সেই ভালোবাসার ছাপমারা সর্বপ্রকার স্বত্বাধিকারের আবরণটুকুও শেষ অবধি যেন সরিয়ে নিয়েছেন অতি সন্তর্পণে। তাকে তুলে দিয়েছেন নির্মোহচিত্তে চিরকালের হিতৈষীদের হাতে। বহু আগে থেকেই তাঁর এ সংকল্প অন্তরে নিবদ্ধ থেকে তাঁকে এই সঁপে দেওয়ার পরিণতিতে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। তিনি বলছেন,—"নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৪১) এই অধিকার ত্যাগ তাঁর সকল ত্যাগকে ছাপিয়ে গেছে। সকল লাভের মধ্যে বড়ো লাভের অধিকারী হয়েছেন তিনি এই ত্যাগের ঔদার্যে। কালের কাছে,

বিশ্বমানবসমাজের দরবারে তাঁর স্বত্বত্যাগের দলিলে তিনি তাঁর অপূর্বভাষায় পরিষ্কার বলছেন :—"যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে ; নানা ভুল-ত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে—এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়া প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে ; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্‌ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।......

নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি—সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। * * *

আমি এমন কথা কখনও বলিনি, আজও বলিনে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য—সে রকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করিনি ; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন

সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্। তারপর পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। * * *

আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। * * * অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়—তা করব না ব'লেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপর প্রাণ যেন সত্য হয়।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩৮—৪০)।

শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গাতেই আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর কার্যপদ্ধতির মধ্যে সেই ব্যবস্থারও সমাবেশ রয়েছে, যাতে সর্বত্র শান্তিনিকেতনকে সকলে কিছু না কিছু কাছে পায় আপন করে। এই বৃহত্তর শান্তিনিকেতনের প্রসারের জন্য তিনি "বিশ্বভারতী সম্মিলনী"র সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছেন,—"বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়তঃ শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয় সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্ঘাটিত রয়েছে।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ৩৮) এ ছাড়া, যাঁরা কোনো মতদ্বৈধের জন্য একটু দূরে থেকে শান্তিনিকেতনের সহিত যোগেচ্ছু,—তাঁদের জন্য যোগের পথ দেখিয়ে কবি বলেছেন,—"তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই "বিশ্বভারতী সম্মিলনী"র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ ক'রে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই,

কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। * * *

"দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে—বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সঙ্কল্প।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ৩৮—৪১)।

সেদিন কবি যে সংকল্প ব্যক্ত করে গেছেন, সে সংকল্পের মর্মোপলব্ধি করে আমরা সকলেই আশা করি, বিশ্বভারতীকে কালে কালে আপনাদের ব'লে গ্রহণ করব এবং "মূলগত একটি গভীর তত্ত্বকে" অক্ষুণ্ণ রেখে, যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও "সবার উপরে প্রাণ"কে সত্য করে, "তাকে সকল আঘাত থেকে" বাঁচিয়ে মনুষ্যের পূর্ণগৌরব-সাধনে যখন যা করবার দরকার হয় তাই সকলে মিলে করব।

রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোক

"উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দ সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তারপরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উদ্ধত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও।"

চির নবীনতা, শান্তিনিকেতন
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোক

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্র মনে করলে তাকে খণ্ডিত ক'রে জানা হবে; এটি যেমন শিক্ষায়তন তেমনি মহর্ষির তপস্যাক্ষেত্র এবং ঠিক সেইরূপই এখানে রচিত হয়েছে কবির 'আনন্দলোক'। শান্তিনিকেতনের উত্তরদিকের প্রধান তোরণের শীর্ষদেশে লৌহফলকে লেখা আছে—

'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি।'

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সৃজনীপ্রতিভার একটি ধারা শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে গড়ে তুলল এই আনন্দলোক। তার পরিচয় সর্বসমক্ষে এখনো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। বিশেষ ক'রে, আনন্দ সৃষ্টির অনেক অনুষ্ঠান আজো লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে অবগুণ্ঠিত।

বিধাতার সৃষ্টির আনন্দ তাঁর মানসলোকে ভাসমান রয়েছে একটি পরিপূর্ণ শতদলরূপে। তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে বিরাজিত তিনি নিজেই, তারই পরিচয়ে উপনিষদে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে 'রসো বৈ সঃ।' সৃষ্টিধর্মী গুরুদেবেরও শত কর্ম এবং জটিলতাময় সৃষ্টিক্ষেত্রের উপরি স্তরে ভাসমান রয়েছে এই আনন্দলোক। কাব্য, কর্ম, চরিত্র, দেশভ্রমণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন বিচিত্র দিকে প্রকাশিত। সেই সর্বমুখী প্রকাশের আনন্দ নিয়ে গড়া এই উৎসব-ক্ষেত্র। অন্য সকল খণ্ড সাধনার ক্ষেত্রে লেগে থাকে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, জেগে থাকে মতান্তরের হাজার ছিদ্র; কিন্তু এখানে যাঁরা দাতা এবং গ্রহীতা,—সবাই এসে মিলেছিলেন একটি অপূর্ব অহৈতুক আনন্দরচনার কাজে। নিজস্ব রূপে রসে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই 'আনন্দলোক'। দৈনন্দিন সুখদুঃখের ঊর্ধ্ব স্তরে অবস্থিত এর বিচিত্র সাধনা।

এর পরিচয়টি কবির আর-সব কৃতির পরিচয়ের থেকে কম কৌতূহলোদ্দীপক বা কম প্রয়োজনীয় নয়। এখান থেকে আনন্দধারার প্রস্রবণ তিনি যা বইয়ে

দিয়ে গেছেন, তাকে অব্যাহত রাখতে পারলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেইটি হবে আশ্রমের বড়ো দান। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আচার্যের আসন থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে সকলকে স্মরণ করিয়ে বলে গেলেন—"এই আনন্দলোক হচ্ছে আশ্রমেরই প্রাণলোক।"* এর ধারা অব্যাহত এবং নিয়ত প্রেরণাশীল রাখবার জন্য শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আবেদনও রবীন্দ্র-ধারাবাহীদের পক্ষে স্মরণীয়।*

এই আশ্রমের ইতিহাস আজ প্রায় শতাব্দীরই ইতিহাস। এর মধ্যে কত লক্ষ লোকের আনাগোনা ঘটেছে এর কাজে, আর কত রকম বিষয়েরই না চর্চা হয়েছে এর কর্মক্ষেত্রে। তার সমগ্র পরিচয়, সে এক মহাভারত। গোড়াতেই জেনে নেওয়া ভালো যে, 'আনন্দলোকে'র কথা তার একটি অংশমাত্র ; তবে সে অংশটি হচ্ছে মূলকেন্দ্রিক অংশ, মালার মধ্যমণিবিশেষ।

শান্তিনিকেতনে প্রথম যে উৎসবটির সন্ধান মেলে, সেটি হচ্ছে, শান্তি-নিকেতনের 'আশ্রম-প্রতিষ্ঠা'—১৮১০ শকের ঘটনা। তারপরে পাওয়া যায় ১৮১৩ শকে 'শান্তিনিকেতনে মঠ প্রতিষ্ঠা'র কথা ; এর পরের উৎসব হচ্ছে 'শান্তিনিকেতনের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব,' তা ঘটে ১৮১৪ শকের ৭ই পৌষে। সেটি মহর্ষির যুগ হলেও এই উৎসবগুলিতেও শান্তিনিকেতনে কবির প্রথম সাক্ষাৎ মিলবে উৎসবক্ষেত্রে আনন্দসৃজনে। আশ্রম-প্রতিষ্ঠা উৎসবে তিনি আচার্যের কাজ করেন, মঠ-প্রতিষ্ঠার উৎসবে 'সংগীতকার্যে' যোগদান ক'রে উপাসকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। তারপরে ১৮২৩ শকের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের একাদশ সাংবৎসরিক উৎসবে এখানে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়।

ধারাবাহিক চার অধ্যায়ে আনন্দলোকের পরিচয়টি লেখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হয়েছে উৎসবের সূচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে উৎসবের আয়োজন ও আয়োজকদের কথা। এই উপকরণ ও পটভূমিটির পরিচয় দিয়েই উৎসবের বিচিত্র দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ বা শেষ

* দ্র পরিশিষ্ট

পরিচ্ছেদটিতে উৎসবের পার্শ্বরঙ্গভূমির রূপ দেখানো হয়েছে 'বিনোদনপর্ব'-সূত্রে। এই বিন্যাসক্রমটিই সমস্ত রচনার গ্রন্থিসূত্র।

পরিশিষ্টভাগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রখানি তাৎপর্যপূর্ণ। কবির প্রবর্তিত উৎসবের মধ্যে সুকুমার দিকের সঙ্গে যে 'বীরতাব্যঞ্জক শক্তিচর্চা'র দ্বারা আনন্দলাভের আয়োজন ছিল, এইটি উক্ত পত্রের নিগূঢ় ইঙ্গিত। তা ছাড়া, নৃত্যের যে মহনীয় আবেদন রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত উৎসবে প্রকাশ পেয়েছে, তাও ঐ পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র সুকুমার কলারসিক ব'লে যাঁরা জানেন বা সেই কলারই সাধনায় উৎসাহদাতা হিসাবে দেশের দৌর্বল্য-সূচনায় যাঁরা কবিকে দোষী মনে করেন, তাঁরা এই পত্রখানি পড়ে তাঁর অন্যদিকের পরিচয় জানবার সুযোগ পাবেন।

গুরুদেবের সান্নিধ্যে অনুষ্ঠিত আশ্রমের শেষ উৎসব হচ্ছে তাঁর একাশিতম জন্মোৎসব। ১৩৪৮ সনের ১লা বৈশাখ সায়াহ্নে উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে তাঁর শেষ আশীর্বাণীতে সে উৎসব সমাধা হয়। অনুরূপ শেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে গুরুদেব কর্তৃক ত্রিপুরাধিপতি-প্রদত্ত 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি গ্রহণ, তাও সম্পন্ন হয় উত্তরায়ণেরই প্রাঙ্গণে ১৩ই মে, ১৯৪১ সালের সায়াহ্নে। এর পরে আশ্রমবাসী আশ্রম-গুরুকে সমবেতভাবে শেষ দেখা দেখেছে উত্তরায়ণে ২৫শে জুলাই, ১৯৪১। তা-ও বুঝি এক উৎসবই, কিন্তু তাকে উৎসব বলার অধিকারী আমরা নই। যিনি বলতে পারতেন, তিনি নিজেই একদিন অনুরূপ দৃশ্যের উৎসবময় রূপটিই ফুটিয়ে বলেছিলেন,—'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন' (মরণ-মিলন, উৎসর্গ)। মৃত্যুও এই আনন্দলোকের রূপকারের হাতে পেয়েছে আনন্দেরই রূপ। তাঁর জন্ম, তাঁর মৃত্যু অতঃপর সবই হয়ে রইল বিশ্ববাসীর কাছে চির-উৎসবেরই বিষয়। চলে গেলেন তিনি আরেক আনন্দলোকে।

গুরুদেব চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর এই আনন্দলোকের রূপ, রেখে গেছেন তাঁর যত সহচর কর্মীদের, যাঁরা তাঁরই জীবন্ত 'ধর্মকায়া' স্বরূপ।

ভক্ত বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, ভগবান বুদ্ধের পার্থিব কায়া বিনষ্ট হলেও তাঁর ধর্মে ও সাধনায় তাঁর 'ধর্মকায়া' এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত রয়েছে, চিরদিনই তা এরূপ থাকবে। আজ গুরুদেবের কায়িক অবর্তমান অবস্থায় তাঁর সহচর ও অনুচর, ভক্ত ও অনুরাগী এবং আশ্রম-কর্মিবৃন্দের মধ্যে সেই ধর্মকায়াই কাজ করে চলেছে জীবন্তভাবে। ভাষণে ভাষণে তিনি জানিয়ে গেছেন তাঁর আবেদন, গানে গানে রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টি-উৎসবের প্রত্যাশা। যেমন আনন্দলোক-সৃজনে আনন্দলোকের কর্মীদের পরিচয়, তেমনি একে চিরকালের জন্য সঞ্জীবিত রাখাতেই তাঁদের নিজ নিজ সাধনারও পূর্ণতা। কর্মীদের এই দায়িত্ববোধের মধ্যেই রয়েছে আনন্দলোকের ভাবী পরিণতি।

আনন্দ সৃষ্টি এবং আনন্দের অংশলাভ করাটা যে জীবনের কত বড় সৌভাগ্য এবং পরিপূর্ণতার বিষয়, তা যাঁরা গুরুদেবের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন। গুরুদেব বর্তমানে এর প্রেরণাধারা নিয়তই প্রবাহিত ছিল। এখনো প্রতিদিন সকাল বেলা ছাত্রছাত্রীদের মিলিত কণ্ঠের বৈতালিক গানে আশ্রমের মন-প্রাণ ভরে ওঠে। বিকালবেলা নীড়ে-ফেরা পাখির মুখর কলতানের সঙ্গে সম ও অসম-বয়সী ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বসিত খেলার সুর যায় মিলে। তখন মনে পড়ে তাঁরি কথা, যিনি সৃষ্টি করে গেছেন এমন 'আনন্দলোক,' যিনি লিখে গেছেন—

জীবনের দুঃখে সুখে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণ
মহানেরে খর্ব-করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

আশ্রম-উৎসবের সূচনা

শান্তিনিকেতন আশ্রমে আনন্দধারার প্রধান প্রস্রবণ উৎসব-অনুষ্ঠান। দেশের প্রাচীন উৎসব-অনুষ্ঠানের মামুলি ধারাবাহিকতা রবীন্দ্রনাথের ভাবস্রোতে পেল নতুন রূপ, নতুন প্রাণ। আজ দেশের অনেক স্থানেই ঋতু-উৎসবের প্রচলন হচ্ছে। বাইরের লোকের কাছে ঋতু-উৎসব খানিকটা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যরূপে প্রতিভাত হ'লেও গুরুদেবের কাছে এর মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। এই ঋতু-উৎসব তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে ভাবসম্পদে, প্রসারিত করেছে লেখার অজস্রতায়। একে অবলম্বন করেই তাঁর অগুন্‌তি গান ও কবিতা রচিত, কত পালা-গান, নাটক-অভিনয়ের অভ্যুদয়। শুধু তাই নয়, এই উৎসবের অসংখ্য অভিভাষণে সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বলবার। ভাবের অভিব্যক্তিমূলক সুরুচিসম্মত নাচ, ভদ্র মেয়েছেলেদের নাটক-অভিনয়ে যোগদান, এ সবও ঋতু-উৎসবের অভিব্যক্তি-ধারায় প্রবর্তিত। আমাদের দেশের ধর্ম অনুষ্ঠানগুলি যেমন কোনক্রমেই বন্ধ থাকা নিষিদ্ধ, আশ্রমে ঋতু-উৎসবও ছিল তেমনি। এর জন্য বাইরে থেকে বাধা এসেছে অনেক, নানা রকম কথা পৌঁছেছে কানে, তবু তিনি তা বন্ধ করতে নারাজ ছিলেন। 'বসন্ত-উৎসব' নামক ভাষণে তিনি বলেছেন—

"বৎসরে বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল-উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে গানে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা করে থাকি। বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে যে দৈববাণী উর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসেছে এই ধরণীর ধুলায়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয়তার উপক্রমণিকা আমাদের দ্বারের নিকট সমাগত। কঠোর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁর সেই আত্মদানযজ্ঞের আরম্ভ হয়েছে।...এই আত্মদানযজ্ঞের মধ্যে এই মহৎ অর্থ আছে যে, যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে মানুষ লাভ করে কঠিন দুঃখেরই দুর্গম পথে। ...দুঃখ-বিপদ সংশয়-আশঙ্কার অন্তর থেকেই যাঁর প্রসন্নতার আবির্ভাব, জয়ধ্বনি

ক'রে আমরা তাঁর অভ্যর্থনা করব। আজ তাঁর বাণী এসেছে বসন্তে অনাহত বীণায় অশ্রুত গানের সুরে, শালবীথিকার শাখায় শাখায়; তাকে মানুষের বাণীর শিল্প দিয়ে গ্রহণ করব।···মানুষের শ্রেষ্ঠদান দুঃখের দান। ত্যাগী পুরুষের হাত দিয়ে মানুষ এই দান ইতিহাসে সঞ্চয় করতে থাকে। সেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আহুতির আহরণ আজ দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এই আত্মত্যাগের মধ্যে যে কঠোর আছে তারই অন্তরে আছে সুন্দর, আজ আমরা তারই প্রতীক দেখব বনশ্রীর আমন্ত্রণ-সভায়। দেখব, যা কিছু জীর্ণ ম্লান তা দক্ষিণ হাওয়ায় ঝরে পড়ছে, ধরণীর ধুলায় বিলীন হচ্ছে, আর তারি থেকে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে সুন্দরের শাশ্বত রূপ চির আশ্বাস বহন করে।"

একমাত্র বংশধর দৌহিত্র নীতীন্দ্রকেও যখন মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, সে যে কী কঠিন আঘাত, তবু সেবারও (১৯৩২ সন) তিনি বন্ধ হতে দিলেন না আসন্ন 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব। নাচগানের মহড়া দিতে কেউ আর এগোয় না। কারণটা যখন তিনি বুঝতে পারলেন, সবাইকে ডেকে বললেন, আমার ক্ষতি হয়েছে, বা আমার দ্বারে এসেছে আঘাত, তাতে বন্ধ থাকবে আশ্রমের উৎসব! একে আমোদ আহ্লাদ বলে দেখো না, তা দেখলেই জাগবে সংকোচ। এ জিনিস শোক দুঃখ আঘাত আন্দোলন থেকে উর্ধ্বে; বর্ষে বর্ষে কালে কালে পৃথিবীতে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়েই হয়েছে আনন্দের আগমন। তিনি এমনি ভাবের দ্বারা এবং কর্মে ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। ১৩৪৮ সালে তাঁর তিরোভাবের পরও কাতর আশ্রমবাসী বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান সমারোহেই সম্পন্ন করলেন।

আশ্রমের জীবনের আদিপর্বে জ্ঞানালোচনার আবহাওয়া ছিল একান্ত প্রবল। অনুষ্ঠান ক'রে ঋতু-উৎসবের রেওয়াজ সে সময় এখানে প্রবর্তিত হয় নি। আনন্দ-উৎসবের উপলক্ষ ছিল গুরুদেবের নিত্যনূতন গান। তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী' আচার্য দিনেন্দ্রনাথ রাখতেন আসর জমিয়ে তা দিয়ে। তিনিও তখন (১৯০৮) অল্পদিনেরই আগন্তুক। অবশ্য সে সময় বিনোদনপর্বে প্রতি সন্ধ্যায় গুরুদেব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে

গানে, গল্পে, পাঠে ও হেঁয়ালি নাট্যাভিনয়ে থাকতেন মশগুল। সে কথা বলা হবে পরে।

তখন একটা নিয়ম ছিল, শিক্ষক এবং কর্মিগণকে ছেলেদের সঙ্গে বাস ক'রে তাদের দেখাশুনা করতে হ'ত। পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় একদল ছেলেকে নিয়ে এলেন নিজের 'ঘরে'। তারা ছিল দেশের দশের কাজে উদ্যোগী। নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে পল্লীসংগঠন, দুঃস্থদের রক্ষা করা, দেশের লোকের অবস্থা জানা ইত্যাদি কাজে সেই ছাত্রদের তিনি আকৃষ্ট করলেন। আরেক দল ছেলের উৎসাহ ছিল সাহিত্য-আলোচনায়। এদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী। এই দুই দল থেকে যারা বাদ পড়ল, তাদের একটা বড়ো দলকে নিয়ে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ভাবনায় পড়লেন। এদলে ছিলেন মুকুল দে, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, মণি দত্ত ও মণি গুপ্ত প্রভৃতি। কেমন ক'রে কী শিক্ষা এদের দেবেন! শিশুমনের 'পরে ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো শিক্ষাকে চাপিয়ে দেওয়াও গুরুদেবের শিক্ষা-রীতি-বিরুদ্ধ। ক্ষিতিমোহনবাবু এঁদের ব'লে দিলেন, আমি তো তোমাদের চালাব না, তোমরাই আমাকে চালিয়ে নেবে। দেখছ তো সারাক্ষণ বই নিয়েই আমার কারবার, তোমরা ঠিক সময়ে আমাকে উঠিয়ে দিয়ো, কাজ করিয়ে নিয়ো ব'লে ব'লে। আমাকে পরিদর্শক ব'লে জেনো না, তোমাদের কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে। ব্যাপারটাতে আশাতিরিক্ত ফল পেলেন। ছোট ছেলের দল কর্তৃত্বের অধিকারে করিৎকর্মা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন করে তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ, স্নান ক'রে এসে তাড়া লাগায় উপরওয়ালাকে। সব সময়েই তারা কাজে ব্যস্ত, আনন্দে চঞ্চল। তাদের স্ফূর্তি দেখে ক্ষিতিমোহনবাবুও অনুপ্রাণিত হলেন। বুঝতে পারলেন, এমনিভাবেই এদের চালিয়ে নিতে হবে। এখানে তখন ছাত্রদের সাহিত্যসভার পত্তন হয়েছিল, কিন্তু তখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি তার উৎসবময় রূপ। চলছে সেই বক্তৃতার অবতারণা করে সভাপতি নির্বাচন,

অন্য জায়গার মতো চেয়ার টেবিলে বসা, বাইরের পদ্ধতির অনুকরণ। সে নিয়ম প্রথম রূপ বদলালো ক্ষিতিমোহনবাবুর হাতে; তার গোড়াকার কথা ছিল ছাত্রদের কাজে লাগানো। তিনি কাশীর লোক। মন্দিরে মন্দিরে কথকতায়, ঋতুবিশেষে উৎসব-অর্চনায়, এবং দেউলের গাত্রোৎকীর্ণ পটে সাজসজ্জার বিচিত্র সমারোহ দেখে এসেছেন তিনি ছেলেবেলা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি নতুন পরিবেশে সভা-সংগঠনে অগ্রসর হলেন। আশ্রমে তখনো চিত্রকলা প্রবর্তিত হয় নি, কোনো শিল্পীরও হয় নি আগমন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র যদুকিশোর চক্রবর্তী, সুধীর মিত্র, মুকুল দে, যতীন দে, যতীন দাস, মণিভূষণ গুপ্ত প্রভৃতিকে সভা সাজানো, আল্‌পনা দেওয়া ইত্যাদি কাজে ক্ষিতিমোহনবাবু উৎসাহিত ক'রে তুললেন। তখন ফুলে পাতায় সভাঘর হল সুসজ্জিত, ধূপে-ধূনায় আমোদিত হল চারিদিক, ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারা-অনুসরণে আসন আর বেদী এল, এল মালাচন্দনে সভাপতি-বরণ। অভ্যাগতদের নমস্কার দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। এ সবের নতুনত্ব নেশা ধরিয়ে দিল ছেলেদের। সারা দিন ব'সে তারা সুন্দর ক'রে জাঁকিয়ে তোলে সভা, দু-তিন মাইল দূর থেকে কাঁধে করে নিয়ে আসে কেয়া, জলপদ্ম আর সাপলার বোঝা। ফুলের সন্ধানে তারা শ্রান্তিক্লান্তিহীন; গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রোদবৃষ্টি অগ্রাহ্য করে চলে যায় দল বেঁধে, সভা সাজাবার আগ্রহ ছিল এতই অদম্য। এ নিয়ে কত মজার ব্যাপার ঘটেছে। গুরুদেব প্রীত হয়েছিলেন। এদের শিল্প ও সৌন্দর্য-অভিমুখী কাজের উৎসাহ আর স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দের স্ফূর্তি দেখে তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহে সভার জন্য এই নিয়মই আশ্রমে অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। সাহিত্যে আর দেশীয় শিল্প-শ্রীতে ঘটল মিতালি।

গুরুদেব তখন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, প্রত্যেক সপ্তাহে সাহিত্য সভা হবে এবং এক-একবার এক-একটা 'ঘর'কে তার ব্যবস্থার ভার নিতে হবে। ছেলেরা নিজেদের ঘরে সভা ডেকে সাহিত্য আর শিল্পসজ্জার প্রতিযোগিতা চালাত।

সুন্দর সুরম্য হত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরগুলি। ঘর সাজানোর ইতিহাসে প্রথমেই আছে শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী-সম্পাদিত হাতে-লেখা 'বীথিকা' পত্রিকার উদ্বোধন। তখন একটা হাতে-লেখা পত্রিকা এখানে প্রকাশিত হত, নাম ছিল 'শান্তি'। আর একখানি পত্রিকা বেরত কালীমোহন বাবুর ঘরের থেকে। ঘরের নামানুসারে পত্রিকাটির নাম ছিল 'বাগান'। এই দুই মণ্ডলীর বাইরের ছেলেরা ঠিক করল তাদেরও একটা পত্রিকা প্রয়োজন। সুধাকান্তবাবু ছিলেন এই দলের দলপতি, তাঁরা থাকতেন শালবীথির 'বীথিকা'-ঘরে। সেই ঘরেই ক্ষিতিমোহনবাবুর নেতৃত্বে তাঁরা তাঁদের ঘর সাজিয়ে সভা ডেকে খুব জাঁক ক'রে প্রকাশিত করলেন 'বীথিকা' পত্রিকা। সেই সাজানো থেকেই ঘর সাজানোর রেওয়াজ চলছে। 'বীথিকা' পত্রিকাতে গুরুদেবের কনিষ্ঠ সন্তান 'শমীন্দ্রনাথে'র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। আশ্রমে তখন ফুলে পাতায় সভা সাজানোর ধূম পড়ে গিয়েছিল। বীথিকার এই আকস্মিক জাঁকজমকের অনুষ্ঠান দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীহিসাবে 'বাগানবাড়ি'র ছাত্ররা খুব জাঁকিয়ে করল তাদের 'প্রভাত' পত্রিকার জন্মোৎসব। তাতে সুন্দর ক'রে সাজানো হ'ল বাগানবাড়ির মাটির ঘর, এমন কি তার খড়ের চাল অবধি সজ্জা-বৈচিত্র্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আশ্রমবাসীদের এবং স্বয়ং একেবারে গুরুদেবকেই তারা নিয়ে এসে বসাল সেদিন সভাপতির আসনে। শুনেছি, এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার ছাত্র আজকের বিদেশপ্রত্যাগত চিকিৎসক ডাঃ জ্যোতিষ রায় এবং সিমলার বর্তমান ইনকম্‌ট্যাক্স কমিশনার শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

এ সব সভানুষ্ঠান ছাড়াও বিশেষ-বিশেষ উৎসবের সময় রান্নাঘরে খাবার জায়গা অবধি পদ্মফুল পদ্মপাতা ধূপধুনায় সুশোভন করবার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। এই ফুলের জন্য আশ্রমের ছেলেদের অনেক কীর্তি জমা আছে তখনকার আশ্রমবাসীদের স্মৃতির খাতায়। একবার কালীমোহন বাবুর ভাগ্নে মণি দত্তের ঘরে ছিল সভার আয়োজন। 'বীথিকা' ঘরের ছাত্র মণি দত্ত আরো দু-একটি

ছেলেকে নিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে গেলেন ফুল আনতে। সারাটা দিন কেটে যায়, তাঁদের আর দেখা নেই। সবাই মহা চিন্তিত। আশেপাশের গ্রামে খোঁজ করা হল, সন্ধান মিলল না। তারপরে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, দেখা গেল, ফুলের গন্ধমাদন কাঁধে নিয়ে তাঁরা এসে হাজির। শোনা গেল, আদিত্যপুর ছাড়িয়ে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কোন্ এক গ্রামে, সেখানে দুপুর বেলা মুড়িগুড় চেয়ে খেয়ে নিয়েছেন। একটা পুকুরে অনেক পদ্ম ছিল, কিন্তু তা সংগ্রহ করা ছিল দুঃসাধ্য। সেগুলি ছিল একেবারে পুকুরের মাঝখানে। সেখানে পৌছবার একটা নৌকা বা ডোঙা কিছুই ছিল না। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা এখো-গুড়-জাল-দেওয়ার কড়াই জোগাড় করলেন। সেইটে চেপে তবে গেলেন ফুল আনতে এবং শেষটা পুকুর উজাড় ক'রে এই ফুলের স্তূপ নিয়ে এসেছেন এতখানি পথ ভেঙে। এদিকে তাঁদের সভাঘর তখন সাজানো হয়ে গিয়েছে। এত ফুল দিয়ে কী করা যায়। একজন পরামর্শ দিলেন পদ্মফুলের পাহাড় তৈরি করা যাক। তাই ঠিক হল। সুন্দর এক জলপদ্মের পাহাড় সেদিন পরিতৃপ্ত করেছিল দর্শকদের। আশ্রমের এক যুগ যে এমনি সভা করার আড়ম্বরে কেটেছে, সে-বিষয়ের অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গত সন্তান শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (মুলুর) জীবনী 'প্রসাদ' গ্রন্থে। আশ্রমের স্বর্গত অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় তাতে লিখেছিলেন—

"একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন বোধ হয় কোন সভার জন্মোৎসব। সকালে আর কয়েকটি ছেলে লইয়া মুলু ঘর সাজাইবার জন্য ফুল আনিতে বাহির হইয়া গেল। দুপুর চলিয়া গেল, মুলুর দেখা নেই। আশ্রমস্থ সকলের আহারের পরে বিশ্রাম হইয়া গেল, মুলু ফিরিল না। মুলুর অভিভাবকগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার ছোট দিদি আসিয়া আমাকে যখন সংবাদ দিলেন মুলু তখনও ফিরে নাই, তখন যারপরনাই আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তাহার অনুসন্ধানে যখন লোক বাহির হইবে এমন সময় মুলু ও

তাহার সঙ্গী বালকেরা ফিরিয়া আসিল। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে চারি পাঁচ মাইল দূরে কোন্ এক পঙ্কিল পুকুরে পদ্ম তুলিতেছিল। সেই ভাদ্রের দুপুরের রৌদ্রের মধ্যে বেলা বোধহয় তখন দুটো, খালি মাথায় ভিজা কাপড়ে, অভুক্ত অবস্থায় এক বোঝা পদ্ম লইয়া উপস্থিত।"

গুরুদেবের অন্তরে পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের প্রতি আকর্ষণ ছিল। সভার এই সব মনোরম কারুকলা দেখে তা নতুন ক'রে জেগে উঠল। সে কথা তিনি একদিন ক্ষিতিমোহনবাবুকে বললেন। ক্ষিতিমোহনবাবু কাশীর ও অন্যান্য তীর্থের দেবমন্দিরে উৎসব-আড়ম্বর দেখে এসেছিলেন। এর পরে এখানেও তার আয়োজন করতে উন্মুখ হলেন। সেই বছরই বর্ষাকালে কার্যগতিকে গুরুদেব আশ্রমে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতিতে দেখা দিল বর্ষার ঘনঘটা, উন্মুক্ত প্রান্তরে তার উদ্দাম নৃত্য উন্মত্ত ক'রে তুলল শাল-তাল-ঝাউ-দেওদারের শাখা-প্রশাখা। গুরুদেবের কথা স্মরণ ক'রে ক্ষিতিমোহনবাবু আরম্ভ করলেন বর্ষা-উৎসব। ছেলেদের আনন্দ-কোলাহলে, দিনুবাবুর প্লাবন-ডাকানো গানে, ফুলে পল্লবে ধূপধুনায়, সংস্কৃত শ্লোকে আর দিনুবাবু ও অজিত চক্রবর্তীর ইংরাজি বাংলা আবৃত্তিতে অনুষ্ঠান জমে উঠল। ছেলেরা পরেছিল গাঢ় নীল রঙের ধুতির সঙ্গে উত্তরীয়ের পীতরেখা-টানা পরিচ্ছদ, মাথায় দিয়েছিল কেয়াপাতার মুকুট। আমবাগানে মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি ক'রে তার চারিদিকে তাল ও কেয়াপাতায় ঘিরে উৎসব-স্থান রচিত হয়েছিল। দিনুবাবু গুরুদেবের দেওয়া সুরে 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি গাইলেন। বেদের পর্জন্য-প্রশস্তিও সেবার তাঁরই কণ্ঠে পেল সুর। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীও ভালো ভালো সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ ক'রে দিলেন। উৎসবের সাফল্য সবাইকে অভিভূত করল। গুরুদেব আশ্রমে এসে পৌঁছবার আগেই দিনুবাবুর পত্রমারফত সে কথা তাঁর গোচরে গেল। উৎসবের অতিরিক্ত প্রশংসা কবির প্রাণে ঔৎসুক্য জাগাল। কিন্তু বর্ষার তখন বিদায় নেবার পালা, শরতের রং লেগেছে বনে বনে। শিশিরে শিশিরে তার

আভাস। এমন দিনে বর্ষা-উৎসব জমবে কি না গুরুদেবের সে দ্বিধা ছিল। তিনি বললেন, বর্ষা-উৎসব দেখবার ইচ্ছে এবার আমার অপূর্ণ থাক্, আমি তোমাদের শরতের গান বেঁধে দেব, তেমনি ভাবে তোমরা শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান করো।

দিনুবাবুর পত্র পাবার পরে, আশ্রমে ফিরে আসবার পূর্বেই তিনি শরতের দু-একটা গান তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন, এখানে এসে হু হু ক'রে বাকি গানগুলি রচনা করলেন। সেই গানগুলি দিয়েই সেবার আশ্রমে শারদোৎসব হবার কথা। এ সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের শান্তিনিকেতন-পত্রিকার 'জন্মোৎসব' সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্গীয় অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আছে—

"ইহার অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নতুন নতুন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ 'শারদোৎসব' নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন শারদোৎসব পড়িয়া শুনাইলেন। ইঁহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতাও কম নয়।"

আশ্রমে 'শারদোৎসব' প্রথম ১৯০৮ সালে অভিনীত হয়। তখন আশ্রমের সমস্ত উৎসবই দেশীয় প্রাচীন রূপটি পরিগ্রহ করছে। সবার মনে জেগে উঠল প্রাচীনকালের অনুষ্ঠানের পূর্বে পঠিত নান্দীর কথা। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি সংস্কৃত নান্দী রচনা করতে অনুরুদ্ধ হলেন। তিনি তা রচনা করবেন, এমন সময়ে আশ্রমে সমাগত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন, নান্দী কবিতা হওয়া চাই গুরুদেবের রচনা; এবং বাংলা নাটকের নান্দী রচিত হবে বাংলাতেই। প্রথমে গুরুদেব নারাজ হলেন, কিন্তু নিস্তার পেলেন না। কিছুক্ষণ পরেই ডেকে বললেন—নাও, হয়ে গেছে তোমাদের নান্দী। দেখা গেল, অচির-পূর্ব-রচিত একটি গানকে সেদিনই পাকাপাকিভাবে সুর দিয়ে তিনি ক'রে দিয়েছেন উদ্বোধন সঙ্গীত; গানটি হচ্ছে 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরনে গানে।' গান পাওয়া গেল, দাবি উঠ্‌ল, "গান তো হল, কবিতাও যে চাই।" দাবি কি অপূর্ণ রয়! স্বল্পক্ষণের মধ্যেই রচিত হয়ে এল একটি কবিতাও—তার প্রথম পংক্তিটি হচ্ছে—'শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়।' সব-ব্যাপারটা হল অভিনয়ের দিনই।

সেবার যখন এই শারদোৎসব নাটক মঞ্চস্থ হয় গুরুদেব একটা মজার ব্যাপার করেছিলেন। কাশী ও উত্তর-পশ্চিমে ক্ষিতিমোহনবাবু পরিচিত ছিলেন 'ঠাকুর্দা' নামে, এখানে এসেও সে-পরিচয় তাঁর লুকানো রইল না। দিনুবাবু, অজিত চক্রবর্তী সবাই তাঁকে ডাকতে শুরু করলেন 'ঠাকুর্দা' ব'লে। গুরুদেবও কথাটা শুনলেন, উপরন্তু কেমন ক'রে তাঁর ধারণা জন্মেছিল ক্ষিতিবাবু ভালো গাইয়ে। সম্ভবত তার একটা সূত্র এই যে, ক্ষিতিবাবু পশ্চিমের শোনা হিন্দুস্থানী গানের সুর মাঝে মাঝে দিনুবাবুদের কাছে গেয়ে শোনাতেন; তারই খ্যাতি পল্লবিত হয়ে পৌঁছে গিয়ে থাকবে গুরুদেবেরও কানে। তাই ক্ষিতিবাবুকে দিয়ে অভিনয় করাবার জন্যে অনেকগুলি গান দিয়ে তখন সৃষ্টি করলেন 'ঠাকুরদা'র চরিত্র। ক্ষিতিমোহন-

বাবুকে বলা হল সেই ভূমিকায় নামতে; তিনি রাজী হলেন না। দোহাই পাড়লেন গানের, বললেন—বাইরে থেকে আসবেন সব গণ্যমান্য অতিথি, আমার এই গানে তাঁদের নিরাশ করা হবে। গুরুদেব বললেন, আচ্ছা, সে পদটি থাক্ তবে দিনু কি অজিতের জন্যে। আপনাকে হতে হবে রাজ-সন্ন্যাসী। রাজ-সন্ন্যাসীরও গান আছে। গুরুদেব ছাড়বেন না; অগত্যা ক্ষিতিমোহনবাবুকে নামতে হল রাজ-সন্ন্যাসীরই ভূমিকায়। ঠিক হল যে, অভিনয় করবেন ক্ষিতিমোহনবাবু। গানের সময় মূকচিত্রের মতো গান গাইবার ভাবভঙ্গিও করবেন তিনিই, কিন্তু নেপথ্যে গান ক'টা গেয়ে দেবেন গুরুদেব নিজে। নাটক মঞ্চস্থ হল। পরদিন রাজার গানের প্রশংসা সবার মুখে মুখে। কিনা, রবীন্দ্রনাথের পরে এই রাজার গলার মতো মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি কোথাও। সবাই এসে ছেঁকে ধরে, 'ঠাকুর্দা গান করুন।' ক্ষিতিমোহনবাবুর মহা ফ্যাসাদ। বোঝাতে চান তিনি গান জানেন না, বিশ্বাস করে না কেউ। চারি দিকে তাঁর গানের প্রশংসা। অগত্যা আশ্রমবাসীদের কাছে সমস্ত রহস্য ব্যক্ত ক'রে তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। সেবার 'শারদোৎসব' নাটক খুব জমেছিল। যজুর্বেদে শরৎ ঋতুর সুন্দর একটি বর্ণনা আছে, 'শারদোৎসবে' সেই শ্লোক কয়টি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায়। আশ্রমের দিক্ থেকে প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতির সাদর অভ্যর্থনার সেই হল সূচনা।

সেবারকার 'শারদোৎসবে'র পর পূজোর ছুটিতে ক্ষিতিবাবু, দিনুবাবু প্রভৃতি পঞ্জাবে অমৃতসহরে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁরা শিখদের গুরুদরবারে ও অন্যত্র চমৎকার কয়েকটি ভজন শোনেন। আশ্রমে ফিরে এসে দিনুবাবু তার সুর ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রখরস্মৃতি ক্ষিতিবাবু 'বাদে বাদে রম্য বীণা বাদে', 'এ হরি সুন্দর' আর 'আজু কারি ঘটা ধুম কর আই' এই তিনটি গানের সুর ও কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে গুরুদেবকে শোনান। তাঁর ভালো লাগল। সেই থেকেই তৈরি হয়ে গেল বিখ্যাত 'বাজে

বাজে রম্য বীণা বাজে' এবং 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে' এই গান ছুটি, সেই স্থরেই।

পরে ১৯১০ সালে জাঁকজমকে সম্পন্ন হয় গুরুদেবের ৫০তম জন্মোৎসব। এর একটি উজ্জ্বল চিত্র ১৩৪৮ সনের বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমতী সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'মানস পটে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধটিতে আছে—

"২৫ বৈশাখ ভোর ৫টার সময় আম্রকুঞ্জে কবিবরের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের অতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। উৎসবের স্থানে আসিয়া দেখিলাম, তখনও অনেকে আসেন নাই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আসেন নাই। শান্তিনিকেতনের দিকে একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারই সঙ্গে আমরা আবার উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমের অধিবাসী ও অতিথিবর্গে জায়গাটি ভরিয়া উঠিয়াছে। আল্পনা ও পত্রপুষ্পে সভাস্থল স্থন্দরভাবে সাজানো। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান করিলেন। আচার্যের কাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মিলিয়া করিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক হইতে কতকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অল্প কিছু বলিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে প্রীতির সম্বন্ধ সেখানে যোগ্যতাবোধের বিচার থাকে না, লজ্জা থাকে না, এই ধরনের কতকগুলি কথা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। সভাস্থ সকলকে ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল।"

এই উৎসবে যে ভাবে মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি হয় তাতে আপত্তি উঠল তু-দিক থেকে। প্রাচীনপন্থী যাঁরা, তাঁরা বাধা দিলেন এই ব'লে যে, এই ভাবে প্রাচীন দেবযোগ্য বস্তুকে নবীনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারে; আর নবীনপন্থীর দল শঙ্কিত হলেন এতে মানুষ-পূজার সম্ভাবনায়। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম হিন্দু সবাই বিতর্ক তুললেন। তার পরে ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। তখনও ঠিক এই রীতিতেই বিরাট্ আকারে তাঁদের

অভ্যর্থনার আয়োজন হয়। এবারেও উৎসাহী উদ্যোক্তাগণ গুরুদেবের ভরসায় সব প্রতিকূল মন্তব্য এড়িয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন। ২১টি তোরণ রচিত হ'ল। বীথিকার সামনে আম্রকুঞ্জের কাছে ছিল সভাস্থল। বর্তমান পূর্বদিকের প্রধান গেট্ থেকে সভাস্থল পর্যন্ত ২১টি তোরণ সাজানো হয়েছিল। এক একটি তোরণের দুই দিকের দুই স্তম্ভমূলে স্থাপিত হয়েছিল— ১। মহী ২। গন্ধদ্রব্য ৩। শিলা ৪। ধান্য ৫। দূর্বা ৬। পুষ্প ৭। ফল ৮। দধি ৯। ঘৃত ১০। স্বস্তিক ১১। সিন্দূর ১২। শঙ্খ ১৩। কজ্জল ১৪। গোরোচনা ১৫। শ্বেত সর্ষপ ১৬। কাঞ্চন ১৭। রৌপ্য ১৮। তাম্র ১৯। চামর ২০। দর্পণ ২১। দীপ, মোট এই ২১টি বস্তু। মূল অভ্যর্থনা-বেদীও ছিল এই ২১টি মাঙ্গল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। তাকে আরো শোভন ক'রে তুলেছিল অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পপাত্র, ধূপ, দীপ, পঞ্চব্রীহি, মধুপর্ক ইত্যাদিতে। নানাস্থান থেকে আগত দর্শকদের অনুকূল এবং প্রতিকূল আলোচনার মধ্যেও সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই ভাবে উৎসব করাটা। ক্রমে আশ্রমে অনুষ্ঠিত গুরুদেবের জন্মোৎসব এবং সংবর্ধনার রীতিতেই গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করা কলকাতায়ও শুরু হ'ল।

এ উৎসবগুলির সাজসজ্জা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশির থেকে উদ্বুদ্ধ নয়। হাজার হাজার বছর আগে ভারতের বিদগ্ধজন-চিত্ত, ভারতের রূপরসিক শিল্পী-মন জনসমাগমের মিলনক্ষেত্রে শুধু মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করাটাকে ভব্যতার অঙ্গহানিকর ব'লেই মনে করত। তাই উৎসবে, উদ্বোধনে, বিজয়যাত্রায়, অভ্যর্থনায় সর্বক্ষেত্রেই নানা আনুষ্ঠানিক বিচিত্র সজ্জা-প্রকরণ, যন্ত্র, মুদ্রা এবং পল্লীগ্রামের আল্পনাদির প্রচলন দেখা দেয়। এ ছিল একটা ভাষার প্রকাশ, আর্য ভারত সে-ভাষাতেই কথা ব'লে এসেছে। শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনের এ সব হচ্ছে সাংকেতিক রূপ। যেমন, অভ্যর্থনার উৎসবে আঁকা হ'ত বটপত্রের আল্পনা। বক্ষস্থলের আকারের অভিব্যক্তি বটপত্র। সেই 'যন্ত্র'-টির (চিত্রটির) অঙ্কন দ্বারাই কৌশলে জানিয়ে দেওয়া হত, 'হে ভদ্র, সমস্ত হৃদয়

পেতে তোমাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছি।' সহৃদয়তার এই অভিব্যক্তি মুখের ভাষায় প্রকাশ করার চেয়ে শিল্পের আবেদনে গাঢ়তর উপলব্ধির বস্তু হল। আরেকটি অনুষ্ঠান, ধরা যাক, শুভাশীর্বাদ দ্বারা বরণ। সে ক্ষেত্রে আঁকা হ'ত একটি ত্রিভুজের উপরে আরেকটি ত্রিভুজ। কিংবা কুণ্ডলায়িত একটি সর্পমূর্তি। একদিন সমাজের আচারে-অনুষ্ঠানে এমনি সজাগ ছিল ভারতের শিল্পিমন। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে ভারতের সে চিত্তপ্রকর্ষ লুপ্তপ্রায়। তার কিছু কিছু চিহ্ন প'ড়ে ছিল পল্লীগ্রামের আল্‌পনায়, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রসজ্জায়, মন্দিরের বিগ্রহ-প্রসাধনে বা স্বল্পজনবিদিত তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় মুদ্রায়, যন্ত্রে ও স্থণ্ডিল বিধানে। তন্ত্র-অনুশীলনে, এ সবের মর্মার্থ জেনে ক্ষিতিমোহনবাবু বিস্মিত হলেন। তিনি সেই মুদ্রা, যন্ত্র, স্থণ্ডিলাদি উদ্ধার ক'রে প্রয়োগ করলেন আশ্রমের উৎসব-সজ্জার ব্যাপারে। ভালো লাগল তা গুরুদেবেরও। তিনি পরম সমাদরে সেই প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার-প্রচেষ্টাকে আরো ভালো মতো প্রকাশের পথ ক'রে দিলেন। এই আল্‌পনা বা তান্ত্রিক মুদ্রাদি গতানুগতিক মতে গা ঢাকা দিয়ে চলছিল। হয়তো তারা সেখানে সেভাবেই চলত আত্ম-বিলোপের দিকে, চোখে পড়ত না কারো। কিন্তু গুরুদেব তাঁর গানে, অভিনয়ে, নৃত্যে ও ভাষণে সেগুলিকে বিশ্বভারতীর পটভূমিতে লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করালেন। হল তখন থেকেই এর পুনরুজ্জীবন। ক্রমে দিনে দিনে এ সব স্বীকৃত হল শিক্ষিত-সমাজের উৎসবে-অনুষ্ঠানে। বংশগত ধারায় গুরুদেব ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু অভিজাত পরিবারের রুচি ও সংস্কৃতিবাহী; সেদিক থেকে এই প্রাচীন ভারতীয় সজ্জা ও আচার-প্রক্রিয়ার সৌন্দর্যের আবেদন তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। অন্য দিকে মহর্ষি-প্রবর্তিত উদার সাধনার সংস্পর্শের ফলে তিনি যে-কোনো মহৎ ভাব ও শিল্প-সমৃদ্ধ জাতীয় সংস্কারকে সহজেই অন্তর খুলে বরণ করতে পেরেছিলেন। শুনেছি, তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন এ সবের প্রবল অনুরাগী। তাঁদের পরিবারগত উদার স্বীকৃতিই সেদিন বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আধুনিক এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃ প্রচলন সম্ভব করেছে।

সংস্কৃতি হল জাতির প্রাণ। তার জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। দেশে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে সেদিকে তেমন দৃষ্টি নেই। এই দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করলেন। দিনে দিনে তার কাজ অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু সম্পূর্ণতার উপাসক রবীন্দ্রনাথ তাতেও তৃপ্ত নন; তিনি জানেন, চিত্র ও সংগীত-কলা ইত্যাদি ছাড়া সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। তাই এখানে শিল্পকলার সর্বতোমুখ সাধনা প্রবর্তিত করবার দিকেই তিনি উদ্যোগী হলেন। সব-প্রথমে চিত্র-শিক্ষক ছিলেন আজকের আশ্রমের স্বাবলম্বী গৃহস্থ শ্রীসন্তোষ মিত্র। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে এখানে পাঠান। তাঁর হাতের রঙের আল্‌পনায় এক সময় অনেক উৎসবক্ষেত্র বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। তারপরে আসেন স্বনামধন্য শিল্পী অসিতকুমার হালদার। ১৩৪৮ সনের 'অলকা'য় লিখিত তাঁর 'পঞ্চাশের পাঁচালী'তে শান্তিনিকেতনের তখনকার দিনের অনেক ছবি চিত্রিত আছে। অসিতবাবুর পরে শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র প্রসারিত হয়। এলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। নন্দলাল বসু মহাশয় ১৯১৪ সালে প্রথমে একবার আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসেন। প্রথম আগমনে তাঁর অভ্যর্থনা হল আশ্রমের আম্রকুঞ্জে। গুরুদেব সস্নেহে উপহার দিলেন নিম্নলিখিত কবিতাটি—

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মীভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।

ভাগ্যবিধাতা আশিস মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে,
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে নন্দ।
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চির সুন্দরে করো গো তোমার
রেখা-বন্ধনে বন্দী
শিবজটা সম হক তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী।

শান্তিনিকেতন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২ বৈশাখ, ১৩২১

গুরুদেব প্রথম উপহারে তাঁকে বহুদিন আগে যে নন্দিত করেছিলেন, তার পূর্ণচ্ছেদ টেনে গেলেন শেষ জীবনে, এই ছোটো কবিতাটির মধ্যে—

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার
সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।
সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়,
মরুপথশ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড়॥

৩।১২।৪০ রবীন্দ্রনাথ
শান্তিনিকেতন

প্রথমবার এসে নন্দলাল বসু এখানে বেশি দিন থাকেন নি। কিন্তু এ জায়গার লোকজন, এর মনোহর প্রাকৃতিক আবেষ্টন তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। কিছুদিন পরেই তিনি এসে এখানকার শিল্প-প্রচেষ্টায় আত্মনিবেদন করলেন। এখানে তাঁর এই আগমন নিয়ে আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা বলা বাহুল্য ; তার মোট কথাটা এই যে, শেষ পর্যন্ত গুরুদেবের ঐকান্তিক আগ্রহই নন্দবাবুকে এখানে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে।

আজ আশ্রমের কলা-বিদ্যার যে-দান, যে-বিকশিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা নন্দবাবু ও সুরেনবাবুর পরিশ্রমের ফল বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তার পিছনেও গুরুদেবের অনুপ্রেরণা নিহিত। এঁদের পাঠিয়েছেন এবং নিজের সঙ্গে তিনি নিয়েও গেছেন দেশভ্রমণে নানা জায়গায় ; বিভিন্ন সভ্যতা এবং তার শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন নানাভাবে। কলাভবনে বিভিন্ন দেশের কারুকলা ও চিত্রকলার সংগ্রহ আহরণ করবারও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। আশ্রমের আনন্দলোক-সৃষ্টির মূল প্রেরণা, ভাষা ও ছন্দ, এককথায় তার যা প্রাণবস্তু, সে সব সৃষ্টি হল গুরুদেবের ; কিন্তু এর বহিরঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি, একে বিভূষিত করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন তিনি নন্দবাবু, সুরেনবাবু ও প্রতিমা দেবীর উপরে।

সুকুমার শিল্পকলার ক্ষেত্রে নৃত্য আশ্রমের আধুনিকতম প্রবর্তনা। লোকে এক রকম পথেঘাটে এখন এর আসল বা নকল পরিচয় পাচ্ছে। কিন্তু এর উৎপত্তি ও প্রসার বিষয়ে ধারাবাহিক তথ্য কম লোকেই জানেন। শান্তিনিকেতনের সংগীত বা চিত্রশিল্পের মতো এর ইতিহাস এখনো তত সুপরিচিত হয়ে ওঠে নি। তাই ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তনার মতো এর পরিচয়টিও একটু বিশদ করে বললে ক্ষতি নাই।

উৎসবের সাজসজ্জা সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্র নাথ কর মহাশয়ের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের নতুন নতুন সৃষ্টিতে। নাচের ক্ষেত্রে তেমনি আশ্রমের নৃত্য আধুনিক রূপ পেয়েছে প্রধানত গুরুদেবেরই

প্রেরণায় এবং চেষ্টায়; তাঁর সহকারিতায় ছিলেন আরেকজন, তিনি স্বয়ং গুরুদেবেরই পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী।

এক সময়ে নৃত্যের স্থান ছিল বৈদিক যাগযজ্ঞের পুণ্যক্ষেত্রে। তারপর শৈব এবং বৈষ্ণব মন্দিরে পূজার সঙ্গে তার স্থান হল। সামাজিক এবং সাংসারিক জীবনেও তার প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। নৃত্যের আদিগুরু হচ্ছেন স্বয়ং নটরাজ তাণ্ডবী মহাদেব। নন্দিকেশ্বর এবং দেবর্ষি নারদ নৃত্যের প্রথম শাস্ত্রকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু ভারতের কী দুর্ভাগ্য বলতে পারিনে, পরে এক সময়ে নৃত্য তার মহনীয় প্রতিষ্ঠা হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। পড়ল গিয়ে কলুষিত পরিবেশে। বৈষ্ণব দেবমন্দিরে দেবদাসীরা তাকে উপাসনার অঙ্গ ক'রে রাখলেও এই অধোগতি হতে তাকে বাঁচাতে পারে নি। ফলে তাদের নিজেদেরও নেমে আসতে হল। তবু এই রকম একজন দেবদাসীরই চরণচ্ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়দেব লিখলেন তাঁর অপূর্ব গীতগোবিন্দ-কাব্য। সে কথা 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' জয়দেব শ্লাঘার সহিত ঘোষণা করে গেছেন।

কুস্থানে পতিত হলেও এত বড়ো একটি মহাবস্তুকে যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্ম এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অপমান করা হবে। ধুলায় পড়ে থাকলেও শিবনির্মাল্য চরণে দলিত করবার বস্তু নয়। এই যুগে এই কথাটি অনুভব ক'রে নৃত্যের এই মহাসাধনাকে যিনি আবার তার পুরাতন গৌরবের আসনে উন্নীত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। এর জন্যও কম দুঃখ, আঘাত ও লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হয় নি, কিন্তু তাঁর শিল্পদরদী মন কিছুতেই পরাভব মানে নি। এ যুগে নৃত্য শান্তিনিকেতনই প্রথম প্রতিষ্ঠা পেল শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হয়ে। তাকে সাংস্কৃতিক গৌরব দেওয়া হল। সনাতনী প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে সে ললিতকলার খাঁটি রূপ নিল। সামাজিক জীবনে সচল হল তার সহজ ধারা। তার মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও সাংগীতিক-রসানুভূতি হয়ে রইল প্রধান লক্ষ্য।

এক্ষেত্রেও শুধু পরিকল্পনা, পরামর্শ বা মৌখিক উৎসাহ দিয়ে নয়, একেবারে হাতেকলমে মানে, আসরে নৃত্য করার, ব্যাপারে গুরুদেবই হচ্ছেন অগ্রগামী। তাঁর ভিতরে পরিণত বয়সেও নৃত্যের প্রবর্তনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর গোড়ার দিকের নাটকগুলির অভিনয়কালে তিনি বাউল বা ঠাকুরদা প্রভৃতির ভূমিকায় গানের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নিজে নেচেছেন এবং সাধ্যমতো নাচিয়ে ছেড়েছেন তাঁর অভিনয় সহচরদেরও। প্রথমদিককার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয়ে জনসাধারণের দৃশ্যে 'মাধবপুরের দলের নৃত্য' পুরানো আশ্রমিকদের কাছে রসালাপের এক মধুর প্রসঙ্গ হয়ে ছিল। তা ছাড়া, 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে একতারা হাতে অন্ধ বাউলের বিখ্যাত ছবিতে তাঁর সেদিনের মনোহর নৃত্যভঙ্গিমা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আশ্রমের নৃত্যের ইতিহাসে গুরুদেবের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্ধু ত্রিপুরাধিপতির আমন্ত্রণে আগরতলায় গিয়ে তিনি বড়ো ঠাকুরের পরিবারে তাঁর কন্যাদের শালিনতা-গরিষ্ঠ সুন্দর নৃত্য-কলা দেখলেন। জিনিসটা তাঁর মনে ধরল। পরে শ্রীহট্টভ্রমণে গেলেন। মণিপুরীদের পল্লীঅঞ্চলে উদ্যোক্তারা তাঁকে মণিপুরী নাচ দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেবারে শ্রীহট্টে দেখা হল মণিপুরীদের রাসনৃত্য। স্থানীয় পরিবেশে, কিশোর-কিশোরীদের সংঘবদ্ধ নৃত্যের রূপ দেখার পর এর প্রাচীন সামাজিক মূল্য এবং আধুনিক কালে এর পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর আর দ্বিধা রইল না। তিনি বিশেষরূপে উৎসাহী হলেন।

মনে মনে চলতে লাগল সংগীত ও শিল্পকলার মতো নৃত্যকে দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। আশ্রমে নৃত্যশিক্ষা দানের জন্য আগরতলাবাসী মণিপুরী নর্তক মণিপুর-রাজপরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার পাশের খোলা প্রাঙ্গণে ছিল নৃত্য-শিক্ষার আসর। গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে সকলের নৃত্যানুশীলন পর্যবেক্ষণ করতেন। গানও অনেকগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন

নাচের সঙ্গে গাইবার জন্য। তার একটি গান ছিল, 'আয় আয়রে পাগল ভুল্‌বি রে চল্‌ আপনাকে।' কিছুদিন পরে নবকুমার ঠাকুরকে ত্রিপুরা থেকে আনালেন। নৃত্যের আঙ্গিক শিক্ষাদানের আয়োজন করলেন দ্বিতীয়বার। যাতে নৃত্যের অনুশীলন গভীরভাবে হয় এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

একেবারে নূতন জিনিস—এই নৃত্যের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কী ক'রে বাড়ে, তখন তাঁর সে এক ব্যগ্রতা। কোনো জিনিস শেখবার সেরা উপায় তিনি মনে করতেন তার ভালো ভালো নিদর্শনকে ভালো করে বারবার দেখা। তাই তখন কোথায় নাচের কী বিশেষ রূপ আছে, কেমন করে ছাত্রছাত্রীদের এনে তা দেখানো যায় তারই চলছে অক্লান্ত চেষ্টা। নূতন কোনো ভালো জিনিস প্রবর্তনা করবেন—এজন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম, লোকনিন্দা, বাধাবিঘ্ন, কোনো প্রতিকূলতাকেই তিনি আমল দিতেন না। এই নাচের ক্ষেত্রেও সে-স্বভাব তাঁকে চালিয়েছে রাত্রিদিন ব্যাকুল ক'রে। অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, আনিয়েছেন দূর দেশ থেকে নানা গুণীকে, সংগ্রহ করে চলেছেন নানা শিল্প-নিদর্শন আশ্রমবাসীদের রুচি ও যত্ন জাগাবার জন্য। যখন পশ্চিম-ভারত পরিভ্রমণে গেলেন, কাঠিয়াওয়াড়-ভাবনগর থেকে নিয়ে এলেন সে-দেশী প্রবীণা মহিলাদের এক দলকে। তাঁরা পূজারত হয়ে বসতেন, মন্দিরা বাজাতেন, ভজন্ গানের সঙ্গে অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গি বিস্তারে চলত উপাসনা। তাঁদের মধ্যে নৃত্যে পূজা নিবেদনের একটি অধ্যাত্ম রূপ দেখা গেল। নৃত্যের এই বিশিষ্ট ধরণ গুরুদেবকে এবং আশ্রমের আর সকলকে খুবই মুগ্ধ করল। কিন্তু অনভ্যস্ত জায়গায় দিন কয়েকের বেশি থাকা তাঁদের সম্ভব হল না। সে নৃত্যচ্ছন্দ আশ্রমে তাই প্রবর্তনের অবসর পেল না। শুনেছি, নিজেদের গুজরাট-কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চল থেকেও আজ তা নাকি অযত্নে প্রায় অবলুপ্ত। আশ্রমে এই নৃত্য এতটা সমাদরে গৃহীত হয়েছিল যে, এঁদের নৃত্য-আসর অবলম্বন ক'রে নন্দলাল বসু বিখ্যাত একখানি চিত্র এঁকেছিলেন।

এর পরেই নৃত্যের ইতিহাসে আসে প্রতিমা দেবীর সংগঠন-প্রতিভার

কথা। প্রতিমা দেবী নিজে শিশুকালে তাঁর মামা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে মানুষ হয়েছেন; তাঁর শিল্প-রুচি ও রসানুভূতি গড়ে উঠেছিল তাঁদেরি সংস্পর্শে থেকে। ৫০ বৎসর আগে অভিজাত পরিবারে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষভাবে ঠাকুর-পরিবারে, নৃত্যগীতের চর্চা ছিল। অন্তঃপুর-চারিণীরা তখন পূজাপার্বণে নৃত্যগীতের দ্বারা নিজেদের চিত্তবিনোদন করতেন। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে বালিকা কন্যা ও বধূর অভাব ছিল না। উৎসাহী গৃহিণী অবনীন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণী নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী রেখে বালিকাদের সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন। শিশুকাল থেকেই ললিতকলার একটি আদর্শ চেতনার অন্তরালে অস্ফুট ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিমা দেবী যখন গুরুদেবের সঙ্গে য়ুরোপ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর নানা দেশীয় নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেই থেকে তাঁর মনে নৃত্যের রসরূপ এবং তার শীলতা বাঁচিয়েও আনন্দ বিতরণের সম্ভাবনা জেগে ওঠে। আশ্রমবাসী নৃত্যের রস পেয়েছে কিছু কিছু,—এই ভূমিকায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালিকা গৌরী দেবী, অমিতা দেবী, যমুনা দেবী, এঁদের নিয়ে প্রতিমা দেবী শুরু করলেন নৃত্যে নানা প্রকারের রূপসৃষ্টির চেষ্টা। সেই চেষ্টার বিচিত্র ভঙ্গীগুলিই নানা উৎসবে আশ্রমবাসীদের আনন্দ দান করত। সেই সময়ে গুরুদেবের হাত দিয়ে প্রসিদ্ধ নাটক 'নটীর পূজা' বেরিয়ে এল। আত্মনিবেদনের প্রেরণায় অপূর্ব কলাসৌষ্ঠবে নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা গৌরী দেবী নটীর পূজা-নৃত্যকে রূপ দিলেন। দেশে জাগল আশ্চর্য সাড়া (২৪ জানুয়ারি, ১৯২৭)।

আগে নৃত্যকে লোকে হেয় স্তরে রেখে দেখত। গুরুদেব দেখলেন, সেখান থেকে একে তার নিজস্ব স্থানে পৌছতে হলে বিশেষ করে ভারতভূমিতে চাই এর অধ্যাত্ম গরিমার বিকাশ। তীরের মাথায় ফলা লাগায় শিকারীরা, তিনি তেমনি ব্যাপার করলেন। নৃত্যের এই নব-উজ্জীবন-আন্দোলনের মুখে

বসালেন 'নটীর পূজা'কে। মুখে ব'লে ব'লে বুঝিয়ে, অভিনয় করে দেখিয়ে, গৌরী দেবীকে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। শেখালেন অনেক ভঙ্গীর আভাস। এই সব প্রেরণা পেয়ে গৌরী দেবী আপন অন্তরের ধ্যানের থেকেই শেষে সৃষ্টি করে তুললেন 'নটীর পূজা'র বিখ্যাত নৃত্য। সেই নৃত্যের প্রদর্শনী ঐ একবারই যা অনুষ্ঠিত হয়েছে, পরে আর কোনো বছরে ঠিক সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'নটীর পূজা'য় গৌরীদেবীর সেই নৃত্যাভিনয় দু'বার হয় নি। আর দেখা যায় নি তার তুলনা। তাকে নৃত্য বলা চলে না, সে ছিল নৃত্যের পূজা-অঙ্গ। তার মহনীয় সংবেদনা জাগিয়েছিল দেশের রূপরসিক ছাড়াও ধর্মনিষ্ঠ প্রবীণ মহলকে। এই আগ্রহ এবং অনুরাগই পরে দেশে নৃত্যের ক্রমিক প্রসার সম্ভব করল। আজকের ভারতীয় নৃত্য-অনুষ্ঠান-সমুদ্রে, বলা যেতে পারে, 'নটীর পূজা' দেখা দিয়েছিল প্রথম দৃষ্টি-গ্রাহ্য ডাঙাভূমি হয়ে।

নৃত্যের প্রবর্তনাক্ষেত্রে কবির সেই সময়কার (অগস্ট, ১৯২৭) জাভা ও বলীদ্বীপ ভ্রমণও অনেক দিক দিয়ে কাজে এসেছে। সে দেশের নৃত্যে রূপ ও রস, তার বাদ্যযন্ত্রাদি, রঙ্গমঞ্চসজ্জা, রূপ-প্রসাধন ইত্যাদি কত গভীরভাবে যে কবি-শিল্পীর রসবোধ এবং সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বোধিত করেছে, 'যাত্রী' গ্রন্থের 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশে তার বিস্তারিত পরিচয় মিলবে। তার থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১১ নং পত্র, আর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা ১৩ নং পত্রখানির প্রতি আমরা আগ্রহশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নৃত্যের মধ্য দিয়েই একটি সমগ্র নাটককে রূপায়িত করবার আভাস দেখা যায় এই পত্রগুলিতে। সে দিক থেকে রবীন্দ্র-নৃত্য ও গীতিনাট্যের আদি পরিকল্পনা-উৎসের গৌরব নিয়ে গুরুদেবের এই জাভা-ভ্রমণটি আর তারই সঙ্গে এই 'যাত্রী' গ্রন্থ শান্তিনিকেতনের নৃত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

গুরুদেবের 'নটীর পূজা', 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন', 'শাপমোচন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রযোজনায় পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর যোগ ছিল বহুল পরিমাণে। গুরুদেবও

কথা। প্রতিমা দেবী নিজে শিশুকালে তাঁর মামা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে মানুষ হয়েছেন ; তাঁর শিল্প-রুচি ও রসানুভূতি গড়ে উঠেছিল তাঁদেরি সংস্পর্শে থেকে। ৫০ বৎসর আগে অভিজাত পরিবারে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষভাবে ঠাকুর-পরিবারে, নৃত্যগীতের চর্চা ছিল। অন্তঃপুর-চারিণীরা তখন পূজাপার্বণে নৃত্যগীতের দ্বারা নিজেদের চিত্তবিনোদন করতেন। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে বালিকা কন্যা ও বধূর অভাব ছিল না। উৎসাহী গৃহিণী অবনীন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণী নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী রেখে বালিকাদের সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন। শিশুকাল থেকেই ললিতকলার একটি আদর্শ চেতনার অন্তরালে অস্ফুট ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিমা দেবী যখন গুরুদেবের সঙ্গে য়ুরোপ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর নানা দেশীয় নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেই থেকে তাঁর মনে নৃত্যের রসরূপ এবং তার শীলতা বাঁচিয়েও আনন্দ বিতরণের সম্ভাবনা জেগে ওঠে। আশ্রমবাসী নৃত্যের রস পেয়েছে কিছু কিছু,—এই ভূমিকায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালিকা গৌরী দেবী, অমিতা দেবী, যমুনা দেবী, এঁদের নিয়ে প্রতিমা দেবী শুরু করলেন নৃত্যে নানা প্রকারের রূপসৃষ্টির চেষ্টা। সেই চেষ্টার বিচিত্র ভঙ্গীগুলিই নানা উৎসবে আশ্রমবাসীদের আনন্দ দান করত। সেই সময়ে গুরুদেবের হাত দিয়ে প্রসিদ্ধ নাটক 'নটীর পূজা' বেরিয়ে এল। আত্মনিবেদনের প্রেরণায় অপূর্ব কলাসৌষ্ঠবে নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা গৌরী দেবী নটীর পূজা-নৃত্যকে রূপ দিলেন। দেশে জাগল আশ্চর্য সাড়া (২৪ জানুয়ারি, ১৯২৭)।

আগে নৃত্যকে লোকে হেয় স্তরে রেখে দেখত। গুরুদেব দেখলেন, সেখান থেকে একে তার নিজস্ব স্থানে পৌছতে হলে বিশেষ করে ভারতভূমিতে চাই এর অধ্যাত্ম গরিমার বিকাশ। তীরের মাথায় ফলা লাগায় শিকারীরা, তিনি তেমনি ব্যাপার করলেন। নৃত্যের এই নব-উজ্জীবন-আন্দোলনের মুখে

বসালেন 'নটীর পূজা'কে। মুখে ব'লে ব'লে বুঝিয়ে, অভিনয় করে দেখিয়ে, গৌরী দেবীকে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। শেখালেন অনেক ভঙ্গীর আভাস। এই সব প্রেরণা পেয়ে গৌরী দেবী আপন অন্তরের ধ্যানের থেকেই শেষে সৃষ্টি করে তুললেন 'নটীর পূজা'র বিখ্যাত নৃত্য। সেই নৃত্যের প্রদর্শনী ঐ একবারই যা অনুষ্ঠিত হয়েছে, পরে আর কোনো বছরে ঠিক সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'নটীর পূজা'য় গৌরীদেবীর সেই নৃত্যাভিনয় দু'বার হয় নি। আর দেখা যায় নি তার তুলনা। তাকে নৃত্য বলা চলে না, সে ছিল নৃত্যের পূজা-অঙ্গ। তার মহনীয় সংবেদনা জাগিয়েছিল দেশের রূপরসিক ছাড়াও ধর্মনিষ্ঠ প্রবীণ মহলকে। এই আগ্রহ এবং অনুরাগই পরে দেশে নৃত্যের ক্রমিক প্রসার সম্ভব করল। আজকের ভারতীয় নৃত্য-অনুষ্ঠান-সমুদ্রে, বলা যেতে পারে, 'নটীর পূজা' দেখা দিয়েছিল প্রথম দৃষ্টি-গ্রাহ্য ডাঙাভূমি হয়ে।

নৃত্যের প্রবর্তনাক্ষেত্রে কবির সেই সময়কার (অগস্ট, ১৯২৭) জাভা ও বলীদ্বীপ ভ্রমণও অনেক দিক দিয়ে কাজে এসেছে। সে দেশের নৃত্যে রূপ ও রস, তার বাদ্যযন্ত্রাদি, রঙ্গমঞ্চসজ্জা, রূপ-প্রসাধন ইত্যাদি কত গভীরভাবে যে কবি-শিল্পীর রসবোধ এবং সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বোধিত করেছে, 'যাত্রী' গ্রন্থের 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশে তার বিস্তারিত পরিচয় মিলবে। তার থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১১ নং পত্র, আর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা ১৩ নং পত্রখানির প্রতি আমরা আগ্রহশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নৃত্যের মধ্য দিয়েই একটি সমগ্র নাটককে রূপায়িত করবার আভাস দেখা যায় এই পত্রগুলিতে। সে দিক থেকে রবীন্দ্র-নৃত্য ও গীতিনাট্যের আদি পরিকল্পনা-উৎসের গৌরব নিয়ে গুরুদেবের এই জাভা-ভ্রমণটি আর তারই সঙ্গে এই 'যাত্রী' গ্রন্থ শান্তিনিকেতনের নৃত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

গুরুদেবের 'নটীর পূজা', 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন', 'শাপমোচন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রযোজনায় পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর যোগ ছিল বহুল পরিমাণে। গুরুদেবও

নৃত্যের সংগঠন এবং ভঙ্গীর আঙ্গিক ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে প্রতিমা দেবীর রুচির উপর নির্ভর করতেন। ঋতুরঙ্গ আর শাপমোচনের সময় গুরুদেব নিজে তো সবটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেনই, তা ছাড়া বিশেষ ক'রে দিনুবাবুর উপর থাকত গানের ভার, আর প্রতিমা দেবী দেখতেন নৃত্যের ভঙ্গী ও রূপ-ব্যঞ্জনা। গুরুদেবের ৭০ বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে অভিনয় করবার জন্য বাংলার ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেবের কাছে একটি লেখা চেয়েছিল; তাদের সকলের মুখপাত্রী হয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর ছোটো মেয়ে অমিতা দেবী ও নন্দবাবুর মেয়ে যমুনা দেবী গুরুদেবের কাছ থেকে 'শাপমোচনে'র প্লট আদায় করেছিলেন। তারপরে তাঁদের অনুরোধে প্রতিমা দেবী নাটকটির প্রয়োজনার ভার নেন; এই চেষ্টার মধ্যে হল নৃত্য-নাট্যের সূচনা। আগেকার নৃত্যগুলি ঋতু-উৎসবের অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। এক একটি গানের সঙ্গে তার ভাব ও ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রত্যেকটি নৃত্য রচিত হত। ইতিপূর্বে গীতোৎসবের অঙ্গরূপে 'শিশুতীর্থ' কাব্য-নাটিকার নৃত্যাভিনয় একবার করা হয়েছিল। কিন্তু তখনো এই ক্ষেত্রে গুরুদেবের পরীক্ষার কাজই চলছে মাত্র বলা যেতে পারে; 'শিশুতীর্থ'টি গদ্য কাব্য। গদ্যেরও একটি সাংগীতিক নৃত্যচ্ছন্দ আছে। সেইটি রঙ্গমঞ্চে গুরুদেবের পাঠের মধ্যে সুরে-সুরে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে যেন কলনাদিনী নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ। তাকেই বাস্তব দৃশ্যে রূপায়িত করে তোলেন নৃত্যে নৃত্যে নৃত্যকুশলা শ্রীমতী দেবী। সেই পরীক্ষার যুগ পেরিয়ে নৃত্যের নাটকীয় রূপ শান্তিনিকেতনে প্রথম প্রতিভাত হল 'শাপমোচনে'র মধ্যে। সেই জিনিস গুরুদেবের জীবিতকালে ক্রমে 'চিত্রাঙ্গদা'য় ও সবশেষে 'চণ্ডালিকা'য় গিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। গদ্যে সুর বসিয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীর কথা-অংশকে প্রাচীন কথকদের প্রণালীতে গান ক'রে ক'রে বলার সূচনাও হয় 'শাপমোচনে'ই। এ আঙ্গিক সবচেয়ে বেশি সার্থক ভাবে রূপ পেয়েছে গুরুদেবের শেষ নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'তে।

আশ্রমের নৃত্যে এর পূর্বেই এসে গেছে দক্ষিণের প্রভাব। কথাকলির আকর্ষণে গুরুদেব দাক্ষিণাত্য থেকে আশ্রমে আনিয়েছেন নৃত্যশিক্ষয়িত্রী প্রবীণা রুক্মিণী দেবীকে। তাঁর নাচের ছন্দে, তাঁরই গানের সুরে তিনি বাংলায় এই গানটি রচনা করে দিলেন —

তুমি তৃষ্ণার শান্তি,
স্নিগ্ধ শোভন কান্তি।

পরে নৃত্যগীতঅভিনয়ের উপহার নিয়ে সদলে গেলেন সিংহল ভ্রমণে। সে-দেশবাসীকে মুগ্ধ করলেন তাঁর নিজের দানে, মুগ্ধ হয়ে ফিরলেন সে-দেশবাসীদের প্রদর্শিত ক্যাণ্ডীয় নৃত্যে। তার রস উপভোগ ক'রে উপহার দিয়েছেন সে-আনন্দ 'ক্যাণ্ডীয় নৃত্য' কবিতাতেও। এ রকম যখনই যেখানে গিয়েছেন, নৃত্যের রূপ-রস আহরণ করেছেন সবখান থেকেই। এই ক'রে ক'রে নানা ফুলের সঞ্চয়ন দিয়ে আশ্রম-নৃত্যের অর্ঘ্য-সাজিখানি সাজিয়ে তুলেছেন কত যত্নে।

ক্রমে পরবর্তী কালে কবির দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী নৃত্যে এবং অভিনয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভা প্রথম প্রকাশ পায় 'অরূপরতন' নাটকে 'সুরঙ্গমা'র ভূমিকাতে। তার নিপুণতর পরিণতি হয় 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যের ক্রমিক অভিনয়ে। মহাত্মাজী তাঁর 'চণ্ডালিকা' ভূমিকার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। শেষোক্ত প্রায় সব নাট্যেই তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল।

ছেলেদের মধ্যে নৃত্যে উদ্যোগী হন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। তিনি এখানকারই ছাত্র। অনেক অধ্যবসায়ে জাভা, দক্ষিণ-ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশ-বিদেশে ঘুরে নৃত্যের ক্ষেত্রে তিনি এনেছেন নানা ভাব ও ব্যঞ্জনা। আরেক ক্ষেত্রেও তাঁর নাম করতে হয়—গানের আসরে।

আনন্দলোকের একেবারে গোড়ার কথা এবং প্রধান কথা হচ্ছে—গান, চলেছেও তা গান নিয়েই। এক্ষেত্রে গুরুদেবই স্বয়ম্ভূ, যেমন কথা ও সুরের

সৃষ্টিতে, তেমনি প্রযোজনার কাজে। গান নেই অথচ উৎসব, এ যেন রবি নেই প্রভাতের মতোই অসম্ভব ব্যাপার। গুরুদেবের পরেই এক্ষেত্রে যাঁর দান বিশেষভাবে স্মরণীয়, তিনি আচার্য দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভার কথা লোকের অবিদিত নেই। নিজের প্রীতিময় ব্যক্তিত্বে, সাহিত্যিক বৈদগ্ধ্যে এবং সবার উপর সংগীতের পরিচালনার গৌরবেই তিনি চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের গড়া এই আনন্দলোকে তাঁর দানের পরিচয় এর বেশি দিতে গেলে, প্রদীপ জেলে সূর্যকে দেখাবার সেই মামুলি তুলনাটাই মনে আসে। তাঁর গলায় রবীন্দ্রসংগীত লীলায়িত হয়ে সুরের যাদু সৃষ্টি করত। গানের শিক্ষাকৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, থাকবেনও অদ্বিতীয় হয়ে। স্বরলিপি-যোগে রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানকে রক্ষা করবার মহৎ কীর্তিটিও তাঁর বিস্ময়কর।

গানের ক্ষেত্রে এঁর পরেই বলতে হয় গুণী এবং শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীভীমরাও শাস্ত্রীর কথা। তিনি ভাতখণ্ডে প্রভৃতির পরম বন্ধু এবং স্বয়ং প্রাচীন ভারতীয় গীতশাস্ত্রে বিশেষ বিদ্বান্, মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তিনি কেবল মাত্র গুরুদেবের সংগীতের সুর ও তালের অনুরাগে এই রবীন্দ্র-সংগীতের তপস্যায় আত্মোৎসর্গ করলেন। এখানে তেরো-চোদ্দো বৎসর সংগীত ও শাস্ত্রাধ্যাপনায় কাটিয়েছেন। এখনো তিনি বোম্বে অঞ্চলে গুরুদেবের গানের রসধারা বিস্তারের সাধনাতেই আছেন। 'হিন্দী গীতাঞ্জলি' স্বরলিপিসুদ্ধ প্রকাশ ক'রে অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারের প্রয়াস তাঁর আগেও ছিল। বীণাবাদ্যের রসবিতরণে অন্ধ্রদেশীয় গুণী পণ্ডিত সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর কথাও এখানে মনে পড়ে। আশ্রমের সংগীত-পরিবেশের পূর্ণ সংগঠনে তাঁরও যথেষ্ট দান রয়েছে। বিশিষ্ট গায়িকা স্বর্গীয়া রমা দেবী (নুটু) ও অমিতা সেনের (খুকুর) পরে দিনেন্দ্রনাথের অন্য আরো অনুবর্তী হিসাবে যাঁরা আজ আশ্রমের সংগীত-আসর জমিয়ে রেখেছেন, তাঁদের একজনের নাম করা হয়েছে আগেই, অন্য জন হচ্ছেন অধ্যাপক শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্র-

সংগীতের দুষ্প্রাপ্য সুর সংগ্রহ ও স্বরলিপি সম্পাদনার কাজে গুরুদেব এঁকে বহাল করে যান। গুরুদেবের শেষ দিকের অনেক গানের সঙ্গে এঁর যোগ উল্লেখযোগ্য। গুরুদেবের প্রয়াণের পর থেকে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সুদক্ষ ও অক্লান্ত পরিচালনা শান্তিনিকেতনের আসরকে সমৃদ্ধ করেছে বিশেষভাবেই।

এবারে উদ্ভাসিত হবে আনন্দলোকের আর-একটি বড়ো দিক। অভিনয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র করে বলা দরকার। দেশে অভিনয়ের কোনো স্কুল গড়ে উঠেছে কিনা আমাদের জানা নেই, অন্ততঃ শান্তিনিকেতনে এ জিনিসটি কোনো স্বতন্ত্র বিভাগীয় শিক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে নি। সংগীতের আনুষঙ্গিক হিসাবে সাময়িক-ভাবে এর চর্চা হয়ে আসছে। কিন্তু গুরুদেব তাঁর প্রথম বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত এত নাটক-নাটিকা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য নিজে লিখেছেন এবং সকলকে শিখিয়ে নিয়ে নিজে অভিনয় করেছেন যে, সে-রকম সংগঠন-উদ্যোগী কেউ সঙ্গে থাকলে গুরুদেবকে দিয়ে বাংলা দেশে অভিনয়ের স্কুলও রীতিমত-ভাবে দাঁড় করিয়ে নিতে পারতেন। অন্ততঃ দেশের আবহাওয়ায় এ-বিষয়ে কঠিন প্রতিকূলতা না থাকলে, শান্তিনিকেতনে হয়তো যথারীতি অভিনয়ের আঙ্গিক এবং বাচিক শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়ে উঠত।

অভিনয়শাস্ত্র সম্পর্কে ক্যালকাটা ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত 'অভিনয়-দর্পণ' নামক গবেষণা-গ্রন্থের সূচনা এবং সম্পাদনা হয় শান্তিনিকেতনেই। তার গ্রন্থকার অদ্যকার ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাপন্ন অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ ছিলেন তখন 'বিদ্যাভবনে'র গবেষক। গুরুদেবের উৎসাহ এবং আশীর্বাদ গ্রন্থকারকে তাঁর দুরূহ কাজের পথে আনন্দময় প্রেরণা জুগিয়েছে। নাট্যশিল্পের চর্চা, তার অভিব্যঞ্জনার নূতন ধারা প্রবর্তন ও মান উন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কীর্তি। তাঁদের পারিবারিক প্রেরণা এবং উদ্যোগই এ কীর্তির মূল উৎস। এক সময় বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উদ্বোধনই হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে

কর্তাব্যক্তিরা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন 'নবনাটক'। তার অভিনয় করেছিলেন নিজেরা আর পরিবারের সব বন্ধু-বান্ধব মিলে। তারপরে 'অলীকবাবু', ক্রমে গুরুদেবের বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিসর্জন, রাজা ও রানী, শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, তপতী আরো কত গীতি ও নৃত্যনাট্যের অভিনয় হয়। ভদ্র মহলের ছেলেমেয়ে মিলে অভিনয়, তাও ঠাকুরবাড়ি থেকেই পায় প্রথম প্রবর্তনা। গুরুদেবের নিজের অভিনয়ের রসসৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে হয় যে, কোনোদিন সে-রকমটি আর হয় নি, হবেও না। সে-অভিনয় কলাগৌরবে ছিল অনবদ্য, বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। আশ্রমের প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সেই সুদূর অতীতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তিনি গুরুদেবের বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় দেখেছিলেন। সেইটি ছিল বোধ হয় গুরুদেবের দ্বিতীয় বারের অভিনয়। 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা'—এই বিখ্যাত গানটি গাইতে গাইতে বাল্মীকির বেশে যখন তিনি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখনকার সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। লোকের চক্ষে অশ্রুবন্যা বয়ে যেত। ঘন ঘন উচ্চরবের অনুরোধে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হত পাদপ্রদীপের সামনে। তাঁর বাল্মীকি, জয়সিংহ, ঠাকুরদা, রাজা, বিক্রম, নটীর পূজার 'ভিক্ষু উপালী'—এ সব ভূমিকা তিনি যেমন লিখেছিলেন, তার রূপও তিনি দিয়ে গেছেন তেমনি জীবন্ত ক'রে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মোদ্‌ঘাটন যেমন রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে নিজেই করে দিয়ে গেছেন তাঁর নানা লেখায়, ভাষণে ও ব্যাখ্যায়, তেমনি রবীন্দ্র-নাটকের অপূর্ব নায়ক চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করবার কলা-কৌশলের আদর্শও তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের ধারায়। দুঃখের বিষয়, সে সব দৃশ্য-বস্তুকে রক্ষা ক'রে রাখবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি। বাল্মীকি-প্রতিভা, বিসর্জন, ডাকঘর, ফাল্গুনী ও তপতীর কয়েকখানি আলোকচিত্র স্থানে-স্থানে ছড়িয়ে আছে বটে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু তা কত নগণ্য! এ প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ

ও অবনীন্দ্রনাথের কথা আসে। রবীন্দ্র-নাটকের গোড়াকার বইয়ের ভূমিকাতে এঁরা দু'ভাই-ই রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত হয়ে অভিনয় করেছেন, সাজিয়েছেন রঙ্গমঞ্চ এবং নিজেদের উদ্ভাবনায় সৃষ্টি করেছেন অভিনেতাদের প্রসাধন-কৌশল, তাঁদের সাজসজ্জা। তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন এঁরা নানা রঙ্গমঞ্চে নানা ভূমিকায় অভিনেতার বেশে; তাঁকে সাজিয়েছেন বিচিত্র ভূমিকার সজ্জায়, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন মহড়ার মধ্যে অভিনয়কে অংশে অংশে এবং সমগ্রভাবেও তাঁর রূপ দেওয়ার কাজ। তাতেই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে এই দুই মহা-শিল্পীর শিল্প-চেতনাকে। দুজনেই এঁকেছেন 'অভিনেতা' রবীন্দ্রনাথের নানা ছবি; সেগুলি অভিনয়ের ফোটো নয়,—নূতন এক রবীন্দ্রনাথ, সেই চিত্রগুলি চিরকালের কলা-রসিক, অভিনয়রসিক এবং রবীন্দ্রানুরাগীদের আগ্রহের বস্তু হয়ে রইল। ফোটোতে রবীন্দ্রনাথ যত বাঁচবেন, তার চেয়ে বেশি করে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁকে শিল্পগুরুদের আঁকা এই ছবিগুলি। কেন না, তার মধ্যে রয়েছে ভক্ত প্রাণের পূজাঞ্জলিও। মনে পড়ে তথাগত বুদ্ধদেবের কথা,—কত শিল্পীকে এই মহামানবের লীলাবৈচিত্র্যের ভাবমূর্তি জুগিয়েছে প্রেরণা, যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে তা থেকে ভারতের শিল্পসম্পদ।

এই সূত্রে বলতে হয় আরো দুইজন শিল্পীর কথা। পরবর্তী যুগে তাঁরাই নিয়েছিলেন এই অভিনয় বা উৎসব-রঙ্গমঞ্চের প্রসাধনের ভার। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর এবং তাঁদের সঙ্গে নন্দবাবুর কন্যা নৃত্য, অভিনয় ও চিত্রশিল্পে বিশিষ্টা গুণী গৌরী দেবী,—এঁরা তিন জনে নিজেদের পরিকল্পনা ও সজ্জাশিল্পসম্পাদনা দ্বারা এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আরেক জন গুণীর নামোল্লেখও এই সঙ্গে অপরিহার্য। অভিনয়-কলাসৃষ্টি ও তার শিক্ষাদান ব্যাপারে গুরুদেবের প্রধান সহায় এবং যোগ্যতম শিষ্য একমাত্র তিনিই। এ ব্যক্তি আর কেহ নন, দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয়-অনুষ্ঠানে, বিশেষ ক'রে শেষ দিকে, পারিবারিক দিক থেকে আরও যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত

ছিলেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন অমিতা দেবী। তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়গুণে গুরুদেবের বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। প্রধানত এঁদের কয়জনের সাধনাতেই গড়া গুরুদেবের অভিনয়-জগৎ।

বিস্ময়কর এই যে, আশ্রমে গুরুদেবের প্রথম অভিনয় যেমন 'শারদোৎসবে', তাঁর ব্যক্তিগত শেষ অভিনয়ও তেমনি এই 'শারদোৎসবে'ই ঘটেছে। ১৩৪২ সালের আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগারের বারান্দায় পূজার ছুটির পূর্বে শারদোৎসব অভিনীত হয়। তিনি নিজে সেজেছিলেন ঠাকুর্দা; এই অভিনয়ের মহড়ার সময় ব'সে ব'সে আগাগোড়া প্রত্যেক অভিনেতাকে হাতে ধ'রে শিখিয়ে দিয়েছেন অভিনয়-কৌশল।

আনন্দলোকের মন্ত্র-চয়ন, আবৃত্তি এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির কাজ সম্পূর্ণতই সম্পাদন করেছেন আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। শাস্ত্রীমশাই অভিনয় করেন নি বটে, তবে মাঝে মাঝে অভিনয়ের সময় নান্দী রচনা করে দিয়েছেন। একবার 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় সেজেছিলেন 'মোহন'। অভিনয় কালে শেষের দিকে তিনি এতটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, স্টেজেই ফেললেন কেঁদে। অভিনয় তাতে খুবই জমে গেল। শাস্ত্রীমশাই সে উপলক্ষে এক শ্লোক লিখে দেন, তার এক জায়গায় ছিল 'মোহনঃ মোহনশ্চ···। বাকিটা এখন বিস্মৃতিতলে। আরেকবার 'মুকুট' অভিনয়েও তিনি দুই লাইনে লিখলেন এক নান্দী—

কবীন্দ্রেণ রবীন্দ্রেণ বিশ্রুতেন সমন্ততঃ।
বালকানাং কৃতে কিঞ্চিৎ নাটকং মুকুটং কৃতম্॥

গুরুদেব কাউকে অব্যাহতি দেন নি, আশ্রমবাসী সকলকেই আনন্দলোকের রসাস্বাদনে ও রসসৃষ্টিতে মাতিয়ে তুলেছিলেন। এই প্রাচীন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কতজনের স্মৃতি, কত দান মালার ফুলের মতো স্মরণডোরে গাঁথা হয়ে আছে। আনন্দলোকের রূপরস পরিবেশনের ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁর সহকারী সুরেন্দ্রনাথ কর। আশ্রমের বাইরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উৎসব-অভিনয়াদির সমস্ত উদ্‌যোগ-আয়োজনের দায়িত্ব থাকে এঁদের দুজনের উপরেই।

আনন্দলোকের সূচনার কথা বলা হল। সৃষ্টির পটভূমি হয়েছে তৈরি, গুণী কর্মীরা এসে একে একে মিলেছেন, আশ্রমের পরিধি, লোকজন ও কর্মসংস্থা গেছে বেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দোৎসবের রূপও হয়েছে বিচিত্র এবং ব্যাপকতর। এবারে আসে তার বিস্তৃত পরিচয়ের কথা।

শান্তিনিকেতনের বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান

শান্তিনিকেতনের প্রধান উৎসব হল ঋতু-উৎসব। সেই ঋতু-উৎসবের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে 'বর্ষামঙ্গল', 'শারদোৎসব' ও 'বসন্ত-উৎসব'। বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে গুরুদেবের হালের দিনের সংযোজনা 'বৃক্ষরোপণ' (১৯২৮, ১৪ই জুলাই) ও 'হলকর্ষণ' (১৯২৮, ১৫ই জুলাই) অনুষ্ঠান। কি ভাবের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি এই উৎসব প্রচলন করেন, ১৯৩৯ সালের হলকর্ষণে পঠিত তাঁরই অভিভাষণ থেকে সেই সম্বন্ধে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল—

"পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃ-ভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে-বিদ্যা, মানব-সভ্যতার

মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।"

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অনেক বৃক্ষশিশু গুরুদেবের স্বহস্তে রোপিত। নাচে গানে আনন্দ-উৎসবে তাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের দ্বারা পৃথিবীতে বৃক্ষের অস্তিত্ব, সেই পঞ্চভূতকে আহ্বান করে তাদের স্নেহধারায় বৃক্ষকে প্রাণবান্ করে তোলবার আয়োজন করা হয়। দু-বার এখানকারই পাঁচজন আশ্রমিককে পঞ্চভূত সাজানো হয়েছিল। সে অনেক বৎসর আগেকার কথা (৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৫)। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত উৎসব-ক্ষেত্রে 'ক্ষিতি'কে উদ্দেশ করে কবিকণ্ঠে বেজে উঠেছিল—

বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।

'অপে'র আহ্বানে ধ্বনিত হয়েছিল—

হে মেঘ ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশু বৃক্ষ।

'তেজে'র আমন্ত্রণে আবৃত্তি করলেন—

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক
এ-নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হক।

'মরুতে'র উদ্দেশ্যে জেগেছিল এই বাণী—

হে পবন করো নাই গৌণ
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'॥

এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে
সংগীত দিও এরে ভিক্ষা।
দিও তব ছন্দের রঙে
পল্লব হিল্লোল শিক্ষা ॥

তার পরে হয়েছিল 'ব্যোমে'র আহ্বান—

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি ॥ ··
তরু তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য ॥

'বৃক্ষরোপণ' বর্ষামঙ্গলের আংশিক অনুষ্ঠান। আশ্রমের প্রাঙ্গণসীমার ভিতরে তরুশিশুকে স্থান দেওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। কোন কোন সময় তার ব্যতিক্রমও ঘটে। বাঁধের জল উৎসর্গ করা সে-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আশ্রমের সন্নিকটে ভুবনডাঙা গ্রাম তার নিত্য প্রয়োজনীয় জলের অভাবে ক্লিষ্ট হয়েছিল। অনেককাল পূর্বে তার সে-দৈন্য ঘুচিয়েছিলেন রায়পুরের বদান্য জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ। কিন্তু দিনে দিনে পঙ্কোদ্ধারের অভাবে তা পঙ্কিল হয়ে এল। আবার গ্রামে জলকষ্টের নিদারুণতা দেখা দিল। বিশ্বভারতীর সেবাব্রতিগণ তখন গ্রন্থাগারিক জনহিতৈষী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে এর পঙ্কোদ্ধার করতে আত্মনিয়োগ করলেন। সে উৎসাহে প্রেরণা জোগাল গ্রামের লোকের সহযোগিতা। কাজটা সুসম্পন্ন হলে তার সফলতাকে অভিনন্দনে স্বীকৃতি দেবার জন্য আশ্রম থেকে সেবার নূতন করে উৎসর্গিত হল বাঁধের নূতন জল। তার পাড়ে দুই তেঁতুলচারা মানবের কাছ থেকে অর্ঘ্য নিল তাদের কচি কিশলয়ের চঞ্চলতায়, তাদের মূকপ্রাণের অব্যক্ত স্পন্দনে। এই বৃক্ষরোপণের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ১৩৪৩ সনের কার্তিকের প্রবাসীতে তৎকালীন

অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল' নামক প্রবন্ধে। গুরুদেব নিজেই ছিলেন সেই উৎসবের অনুষ্ঠাতা। জলোৎসর্গ করে তিনি মন্ত্র পড়লেন—

"সর্বজীবের জন্য সমানভাবে আমি এই জল উৎসর্গ করিতেছি। নভো-ভূ-তোয়বাসী সর্বভূত ইহা পানে উত্তম তৃপ্তিলাভ করুক। আমি সর্বভূতের উদ্দেশ্যে এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে স্নান, পান ও অবগাহন করিয়া সর্বপ্রাণী পরিতৃপ্ত হউক।"

আর একবার বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠাদ্বারা গুরুদেবের ৬৫ বৎসরের জন্মোৎসব-উপলক্ষে। সম্পূর্ণ প্রাচীন পদ্ধতি-মতে উত্তরায়ণের উত্তর-পূর্বকোণে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল।

'হলকর্ষণ' শ্রীনিকেতন-উৎসবের অন্তর্গত, বর্ষামঙ্গলের আগে কিংবা পরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সীতা-যজ্ঞ'। ১৩৩৬ সনের ২৫শে শ্রাবণ তারিখে এর প্রথম উদ্বোধন। 'সীতা' হালের রেখার এক নাম, তার উৎসবই যজ্ঞ নামে অভিহিত। বর্তমানে 'হলকর্ষণ' নামেই এর প্রসিদ্ধি। একজোড়া হালের বলদকে সাজিয়ে তাদের সামনে আহার্যরূপে কলাপাতায় গুড় যব প্রভৃতি দেওয়া হয়। পরে লাঙ্গল যোজনা করে কিছুক্ষণ চলে ভূমিকর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণতল গানে মন্ত্রে মুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ গরু ও লাঙ্গল নিয়ে স্বহস্তে একবার হলকর্ষণ-উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন।

'শারদোৎসব' আশ্রমের ঠিক তেমন একটি আনুষ্ঠানিক উৎসব নয়। কিন্তু শরৎকালেই বাঙালীর মহোৎসব; আগমনীর সুরে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ জাগিয়ে তোলে। ছুটির রসে ভরপূর উৎসবমুখরিত রঙীন দিনগুলো ছেলেমেয়েদের মনকে মাতিয়ে দেয়। বাঙালীর মানসলোকে শরৎকালের সঙ্গে :উৎসবের আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বাংলাদেশে এবং বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির দিক্‌দিগন্তে শারদশ্রীও ফুটে ওঠে ঝলমল হাস্যে। ছুটির বাঁশি বেজে ওঠে কিশোর-চিত্তে আর কবির মনে। সেই আনন্দের বন্দনাগান উৎসারিত হল 'শারদোৎসব' নাটক-রচনায়। আশ্রম-বালকদের সঙ্গে

মিশে কতবার রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের অভিনয় করেছেন। ক্রমে পুজোর ছুটির আগে একটা কিছু অভিনয় করা প্রায় নিয়মের মত দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে যোগ হল 'আনন্দবাজার' মেলা। বহুকাল পর্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশেরই আগে বসত এই মেলা। একবার কি কারণে সেই রীতির পরিবর্তন হয়ে 'আনন্দবাজার' বসল পুজোর ছুটির আগে। শরৎকালের সুরের সঙ্গে আনন্দোৎসবটি খুঁজে পেল আপন সুরের স্বাভাবিক ঐক্য, তারপর থেকেই কায়েমি হল এই নতুন নিয়ম।

আশ্রমের শালবীথিকায় আনন্দবাজারের মেলা বসে সায়াহ্নে। সকাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা যার যার দোকানপসরা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়। বিচিত্র তার আয়োজন—মেঠাইমণ্ডা, চা-শরবৎ, ম্যাজিক, সার্কাস, চানাচুরওয়ালা, ভাগ্যগণনাকার্যালয়, প্রত্নতত্ত্বাগার কোনোকিছুরই অভাব থাকে না। যাত্রা, কীর্তন, কবিগানও বাদ পড়ে না। শখের মেলা আনন্দবাজার, জিনিসপত্রের দাম একটু শৌখিন রকমের থাকবে, তার আর আশ্চর্য কি। যার দোকানে যত বেশি লাভ, তারই তত কৃতিত্ব। মেলাশেষে সব দোকানের লভ্যাংশ সংগৃহীত হয়ে আশ্রমের দরিদ্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। তারপর সম্মিলিত নির্মল আনন্দের স্মৃতি মনে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পূজাবকাশে চলে যায় বাপমায়ের কাছে।

সাধারণতঃ দোলপূর্ণিমা তিথিতেই আশ্রমের 'বসন্তোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গুরুদেব দোল ও হোলিকে সমস্ত প্রাদেশিকতা এবং প্রাকৃতজনগত অসংযম থেকে মুক্ত ক'রে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ বসন্তোৎসবে রূপান্তরিত করেছেন। বসন্তের দিনে আশ্রমবাসীদের বসনেভূষণে লাগে বাসন্তী রঙ। গুরুদেব বর্তমান থাকতে আমবাগানে গিয়ে সবাই জড়ো হত। সেখানে ছাত্রীগণ গুরুদেবের চারপাশে পুষ্পপাত্রের অর্ঘ্য এনে সাজিয়ে রাখত। গানে গানে হত বসন্তের উদ্বোধন; কবি-কণ্ঠের কবিতাপাঠে এবং সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিতে উৎসবটি বাস্তব রূপ পেত। একবার গুরুদেব ঠিক করলেন, বসন্তের সংবর্ধনা করা যাক্ সবার স্বরচিত অর্ঘ্য নিবেদনে। গাছে গাছে ফুলে ফলে পাতায় পাতায়

যখন আপনাকে বিলিয়ে দেবার আয়োজন, সে-সময় মানুষের দিক থেকেও যে যত দিতে পারে ততই বেশি আনন্দ। কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ নতুনভাবে আমবাগান সজ্জিত করলেন, আঁকলেন বিচিত্র আল্পনা। দিনেন্দ্রনাথ, নিরুপমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, সুকুমার সরকার, জাহাঙ্গীর ভকিল প্রভৃতি যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সকলেই রচনার ডালি এনে দিলেন। গুরুদেবও নতুন কবিতা, নতুন গান লিখে আনলেন এবং নিজের কবিতা-পাঠের সঙ্গে নাম ক'রে ক'রে পড়লেন অন্য সবার লেখা। 'মহুয়া' ও 'বনবাণী'র অনেক কবিতা সেই উৎসবের সময়ে রচিত ও পঠিত হয়।

অন্যান্য ছোটখাট উৎসবের কথা বলার আগে শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব '৭ই পৌষ' এবং শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক কালে আশ্রমে ৭ই পৌষের উৎসবই ছিল একমাত্র উৎসব।

একবার ৭ই পৌষের উৎসবে আশ্রমের বালকেরা 'বিসর্জন' অভিনয় করল, তাতে অপর্ণার ভূমিকা ছিল না। এইটিই আশ্রমের ইতিহাসে বালকদের প্রথম অভিনয় ; এর পরে গুরুদেব শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে স্বয়ং যে অভিনয়-ধারা প্রবর্তন করেন, সে-ধারার প্রথম অভিনয়টি হল ১৯০৮ সালের 'শারদোৎসব'।

৭ই পৌষ ও শ্রীনিকেতনের বার্ষিক মেলা দুটি এখনকার ছেলেমেয়েদের এবং বিশেষভাবে মেয়েদের কাছে বিচিত্র আনন্দের কেন্দ্র। মেয়েদের পক্ষে অন্য কোন জায়গার মেলায় এরূপ স্বচ্ছন্দে চলাচল ও আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া এই উপলক্ষে আশ্রমের বহুসংখ্যক অতিথি অভ্যাগতদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও পরিচর্যার ভার নেয় ছাত্রছাত্রীরাই। আতিথেয়তা, শিষ্টাচার ও সেবাব্রতের শিক্ষা লাভ হয় তাদের উৎসব-আনন্দের ভিতর দিয়ে।

আগেকার কালে মেয়েরা আশ্রমে সংখ্যায় যেমন ছিলেন অল্প, তেমনি তাঁদের চলাফেরায়ও একটু বেশি করেই ছিল বিধিনিষেধের কড়াকড়ি। মেলায়

তাঁরা শুধু বাজি পোড়ানো দেখতে যেতেন, মন্দিরের কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে চলে আসতেন।

পরে আশ্রমে নারীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে ক্রমে স্বতন্ত্র ছাত্রীবিভাগের প্রতিষ্ঠা হল এবং তাদের আবাসের জন্য তৈরি হল 'শ্রীভবন'। দেশ-বিদেশের মেয়ে চলাফেরায় সঙ্গে নিয়ে এল তাদের স্বচ্ছন্দতা। অজ্ঞাতসারে এখানকার মেয়েদের সামাজিক জীবন পরিবর্তিত হতে লাগল। এ সময়ই বিদেশভ্রমণ সেরে গুরুদেব আশ্রমে ফিরে এলেন, সঙ্গে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। নারী-জাগরণের নতুন প্রবর্তনা আনলেন তাঁরা। নানা অনুষ্ঠানে, শিক্ষায়, ব্যবহারে তার প্রভাব কাজ করতে লাগল। আশ্রমের কাজে আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত হলেন। মেয়েরা এগিয়ে এলেন নবোৎসাহে। অবশেষে নানা ব্যাপারের মতো এক সময়ে মেলায় মেয়েদের যোগদান করা চল্‌তি হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বার্ষিক দুই উৎসবের পরে বড়ো উৎসব আর নেই বললেই চলে। 'নববর্ষ', 'বর্ষশেষ' ও 'নবান্ন', ছোটো হলেও তাদের চিত্তবিনোদনকারিতা অপূর্ব। প্রতি বছরেই আশ্রমের রান্নাঘরে অগ্রহায়ণমাসে 'নবান্নে'র পিঠে-পায়েস তৈরি হয়, আশ্রমের মেয়েরাই সে কাজে উৎসাহে যোগদান করেন।

আশ্রমের আর একটি স্মরণীয় উৎসব 'পঁচিশে বৈশাখ', বর্তমানে বাংলার সর্বত্রই তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তখন আশ্রম গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকে, তাই গুরুদেবের জন্মোৎসব ১লা বৈশাখ নববর্ষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আশ্রমের প্রধান প্রধান নিয়মিত উৎসবগুলির কথা বলা হল। কিন্তু এ ছাড়াও আরো অনেক অনুষ্ঠান আছে, সেগুলি ঠিক উৎসবের পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু তাতেও সুর মেশানো থাকে উৎসবের।

আশ্রমের 'গান্ধী-দিবস' একটি আনন্দপূর্ণ স্মরণীয় দিন। ১৩২১ সালে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তখন তিনি

আশ্রমের প্রত্যেক বিভাগে এবং কার্যক্ষেত্রে আশ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। আশ্রমের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রায় তাঁর মহান্ আদর্শকে কার্যকর করে তোলা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত প্রেরণাটিকে গুরুদেব শ্রদ্ধা করতেন। তাই প্রতি বৎসর ১০ই মার্চ তারিখে 'গান্ধী-দিবস' প্রতিপালিত হয়। আশ্রমে সেদিন সকালে চলে অনধ্যায়; লেখাপড়া বন্ধ থাকে, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মিবৃন্দ জীবন-যাত্রানির্বাহের ছোটবড় সব কাজেই সেদিন পরিপূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হন। সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্নবৃত্তির কাজকর্মকে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শেখেন। আশ্রমে সেদিন মহা সমারোহে এক নতুন ধরনের মহোৎসব জমে। রান্নাঘরে ধোয়ামোছা, বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে শত শত লোকের রান্না, পরিবেশন, বাটন বাটা, কুটনো কোটা ইত্যাদি সমস্তই ছাত্রছাত্রীরা সমাধা করে দল বেঁধে সানন্দ উৎসাহে। ওদিকে এক-দল জোটে জল-টানার কাজে, মেথর সাজে অন্যদল। এই মেথরদের দলপতি আগে আগে হতেন শিল্পগুরু নন্দলাল বসু। বলা বাহুল্য, আশ্রমের ঝি চাকর মেথর পরিচারক সবাই সেদিন পূর্ণ অবকাশ উপভোগ করে।

আশ্রমে আবার এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে, যার উৎসমূলে থাকে নিছক রঙ্গরস কৌতুক ও আমোদপ্রিয়তা। ১৯৩৫ সনে আশ্রমের 'হৈ-হৈ সংঘ' 'ভরসামঙ্গল' অনুষ্ঠান করেছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব ছিলেন উৎসাহী। তিনি এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নোক্ত চারিটি নতুন গান রচনা করেন—

১। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে
২। কাঁটাবন-বিহারিণী সুরকাণা দেবী
৩। ও ভাই কানাই, এই বড়ো মোর দুঃখ
৪। না-গাওয়ার দল রে আমরা না-গলাসাধার

তিনি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই চতুর্থবার অন্যের রচিত কবিতা বা গানে আপন সুর সংযোজনা করেন। সুর বসিয়েছিলেন সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'আবোল তাবোল' বইয়ের 'ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ' কবিতাটিতে।

এমনি শখের অনুষ্ঠান আগে খুব হত। আশ্রমের পুরানো দিনের ছাত্রের দলে ছিলেন অদ্যকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী। তিনি একবার 'ঘোষযাত্রা' নামে একটা হাসির যাত্রা রচনা করেন। তার অভিনয় আশ্রমবাসীদের উপভোগের বিষয় হয়েছিল।

একবার গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত কবি, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, গরবা, পাঁচালি ইত্যাদি নানা রকমের দেশীয় খাটি লোকসংগীতের সুর-বসানো একটি গানের পালা নিয়ে দুদিন দুটি আসর বসে সিংহসদনে ও শিশু-বিভাগে। আশ্রমে গুরুদেবের রচিত বাউল ও কীর্তন গান নিয়েও কতবার এমনি আসর জমেছে। আশ্রমের মন্দিরের গায়ক পরলোকগত শ্যামাস্মরণ ভট্টাচার্য ছিলেন তার অধিকারী।

আশ্রমের আর একটা মজার ব্যাপার 'বাঙাল সভা'। সে সভায় 'বাঙাল' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ব্যঙ্গানুকরণ দ্বারা আনন্দ ও হাস্যরসের জোগান দেওয়া হত। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার অনুকৃতিও বাদ পড়ত না। বীরভূমের প্রাদেশিকতা খুব উপভোগ্য হত। একবার গুরুদেবের সামনে বিভিন্ন জেলার প্রাদেশিক কথাবার্তার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাক্রমে 'বাঙাল সভা'র সূচনা হয়। এই রকমের সভায় একবার সভাপতি হয়েছিলেন গুরুদেব। সভাশেষে সবাই মিলে তাঁকে অনুরোধ করা হল, তাঁকে তাঁর দেশীয় ভাষা বলতে হবে। তিনি বললেন—যশুরে ভাষা, সে কি আর মনে আছে, রগড় ক'রে বললেন—মুগির ডাল, কুলির অম্বল—ও সব যে ভুলে গেছি।

এই সমস্ত আনন্দ ব্যতীত গুরুদেব আরেকটি আনন্দের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সে হচ্ছে 'চা-চক্র'। আশ্রমের শুরু থেকেই এই জিনিসটি ছিল।

'চা-চক্র' ভালো করে প্রবর্তিত হয় ১৩৩১ সালে। গুরুদেব চীনদেশ থেকে ফিরে এসে চা-চক্রের নতুন ভিৎ পত্তন করলেন। চীনদেশীয় তরুণ কবি এবং অধ্যাপক সু-সী-মো ছিলেন গুরুদেবের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী। তাঁরই নাম অনুসারে গুরুদেব চক্রের নাম দেন 'সু-সীম চা-চক্র'। প্রথমবার চা-চক্রের 'চক্রেশ্বর'পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একদিন বিকালে এর কিছু অনুষ্ঠানও হয়। সভা বসল গ্রন্থাগারের দোতলায়। পদ্মপাতার উপরে হল চায়ের কাপ রাখা; মেয়েরা চীনা, জাপানী, বর্মিজ সাজে চা পরিবেশন করেন। চীন জাপানের মত আমাদের দেশেও চা-পানের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যবোধ-বিকাশের এবং সম্মিলিত আনন্দ-সৃষ্টির প্রচলন করবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই চা-চক্র স্থাপন করেন। সেই সভার উদ্দেশ্যে রচিত এই গানটি সেদিন পুলকিত করেছিল সবাইকে—

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে।

আগে এই চা-চক্রের আসর বসত বিকালে খেলার ঘণ্টায় লাইব্রেরির পশ্চিম পাশে বা পিছনে। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে আচার্য দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলা দেবী তাঁর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে চা-চক্রে কিছু টাকা দেন। তখন তৈরি হয় বেণুকুঞ্জের দক্ষিণ পার্শ্বে চা-চক্রের জন্য গোল একটি নূতন বাড়ি। গুরুদেব নাম দেন 'দিনান্তিকা'। দিনের শেষে পাওয়া যায় যেখানে আরামের স্থান, অথবা, দিনেন্দ্রনাথের শেষ স্মৃতি—নামটির মধ্যে এই দুই অর্থেরই সুনিপুণ বিন্যাস আছে। এই বাড়িতেই প্রত্যহ বিকালে গরম চায়ের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার সঙ্গে কর্মী ও অধ্যাপকগণের উচ্ছ্বসিত হাসি-গল্প উৎসারিত হয়ে ওঠে।

এখানকার 'ফ্যান্সী ড্রেস'ও একটি বিচিত্র জিনিস। বসন্তোৎসব উপলক্ষেই একবার হয়েছিল 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' নামক একটি রূপসজ্জা-প্রদর্শনী। সেটি ছিল নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরিকল্পিত। তিনি সবাইকে অপূর্ব বেশে সাজিয়েছিলেন। চাঁদের আলোয় 'গৌরপ্রাঙ্গণ' গিয়েছিল ভেসে। বৃত্তাকারে আল্পনায় সাজানো উৎসবস্থান, একদিকে দেবসভা, অন্যদিকে গায়কসভা; সামনে নৃত্যের আসর। দেবসভার গরুড় পাখিটাই সেদিন (শ্রীহরিদাস মিত্র) সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। এমনি ফ্যান্সী ড্রেসের কথায় বলা যেতে পারে 'রাবণের কাণ্ড' অনুষ্ঠান এবং আরেকবার 'বরযাত্রীর দল' সাজিয়ে বার করার ব্যাপার। নানারকম ফ্যান্সী ড্রেস বা বহুরূপীর সাজ পরার অনুষ্ঠান এখনো মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। একবার তা অনুষ্ঠিত হয় কয়েক বছর পূর্বে, শ্রীভবনের বড়ো মেয়েদের দ্বারা। কেউ সেজেছিলেন পাহাড়ী মেয়ে, কেউ বা দুধওয়ালী, কেউ আতরবিক্রেতা, কেউ জীবন্ত ফাউণ্টেন পেন; একদল সাজলেন কাফ্রি রাজকন্যা ও তাঁর সহচরী;—এমনি কত কী।

ছাত্রছাত্রীদের আর একটি অনুষ্ঠানের কথাও বলতে হয়। ছুটির দিনে তারা মধ্যে মধ্যে অদূরবর্তী কোন জায়গায় গিয়ে 'বনভোজন' বা 'পিক্‌নিকে'র ব্যবস্থা করে থাকে, তা ছাড়া সাধারণতঃ ৭ই পৌষের মেলাশেষে কোন এক বা একাধিক দ্রষ্টব্য জায়গার উদ্দেশে তারা দল বেঁধে ভ্রমণেও বেরিয়ে পড়ে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাও সঙ্গে থাকেন। ছুটির দিনকে বৈচিত্র্যে ও নির্মল আনন্দে মণ্ডিত করে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করার পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান অতুলনীয়। তা ছাড়া আশ্রমের শৃংখলাবদ্ধ দৈনন্দিন কর্তব্যধারা থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার একটি সার্থকতা আছে। একসঙ্গে রান্নাবাড়ার আয়োজন, খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, গল্পগুজব ইত্যাদির ভিতর দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যেমন, শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যেও তেমনি, অলক্ষিতে একটি সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

আশ্রমে সব কিছুর সূচনা বা উদ্বোধন উৎসব-অনুষ্ঠানে শ্রীমণ্ডিত। শ্রীভবন, চীনভবন, হিন্দীভবন প্রভৃতির গৃহপ্রবেশ হয়েছে উৎসবের মধ্যে দিয়ে। শান্তিনিকেতনের সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হয় মনোজ্ঞ ও শিল্পসম্মত আচার-অনুষ্ঠান সহকারে। আশ্রমের জলকষ্ট নিবারণের জন্য নলকূপ খনন উপলক্ষে গুরুদেব লেখেন—'এসো হে তৃষ্ণার জল' গানটি। সেবারকার নলকূপের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরে ১৯৩৩ সনের চেষ্টা সফল হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তখনকার মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তার উদ্বোধন-উৎসবে গুরুদেব রচনা করলেন নতুন গান—'হে আকাশ-বিহারী নীরদবাহন জল।'

এ ছাড়া, শান্তিনিকেতনের 'বিনোদনপর্বে' চিত্তবিনোদনকারী নানাবিধ আয়োজন থাকে।

শান্তিনিকেতনের বিনোদনপর্ব

বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।—কণিকা

এই কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, শিক্ষার জন্য অধ্যয়নাদি যেমন প্রয়োজন, বিনোদনও ঠিক তেমনি প্রয়োজনের জিনিস।

কর্মমোহগ্রস্ত, অতি ব্যস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এই কথাটি গুরুদেব একদিন ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর 'ফিলজফি অব্ লেজার' (Philosophy of Leisure) নামক বক্তৃতার অন্তর্নিহিত সত্য এইটুকু। আশ্রমের বিনোদনপর্বের কথা না বললে আশ্রমের আনন্দের কথা অনেকখানি বাদ থেকে যায়।

গুরুদেব বলেছেন, "সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা (ছাত্রেরা) নক্ষত্র পরিচয়ে, সংগীত চর্চায় পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।" (শিক্ষাসমস্যা)

আশ্রমের শুরু থেকেই, গুরুদেব সন্ধ্যাবেলা এক বৈঠক বসাতেন; সেখানে আশ্রমবাসীদের নিয়ে গল্প বলা ও নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলত। অধ্যাপক

জগদানন্দ রায় সান্ধ্যবিনোদনপর্ব সম্বন্ধে লিখেছেন—"এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাশেই আমরা তাহাদের পড়াশুনা শেষ করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ, গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য সান্ধ্য-সম্মিলনী ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেকদিনই তিনি কী প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্যসভায় উপস্থিত থাকিয়াছি, কোনদিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই।"

তখন 'দেহলী' ছিল গুরুদেবের নিজের বাসস্থান এবং তার সামনের একতলা ঘরগুলি নিয়েই ছিল তখনকার গুরুপল্লী। সেই একতলা ঘরের বারান্দাতে ঘনিয়ে আসত সন্ধ্যার নীরবতা। স্তব্ধ হয়ে থাকত শালবীথি, 'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি' জ্বলে উঠত। সেই স্তব্ধ পারাবারের বুকে গোমুখীর নির্গত কলস্বরের মতো সুমিষ্ট বাণীধারা অবিরাম প্রবাহিত হত গুরুদেবের মুখ থেকে। মনে হত, সেই প্রাচীন তপোবনের কোনো একটি সন্ধ্যা—ঋষি এবং শিষ্যদের নিয়ে তার কাল ভুলে দাঁড়িয়েছে এসে একালের এক কোণে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯০২, কি ১৯০৩ পর্যন্ত বিনোদনপর্বের প্রথম পর্যায়ে চলেছে—পাঠ ও হেঁয়ালিনাট্য-সভা; গুরুদেবই তার একমাত্র বক্তা এবং আর সকলে শ্রোতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতে পাই, তিনি তো আছেনই, তাঁর প্রবর্তনা ক্রমে ক্রমে সার্থক হয়ে কাজ করছে; সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে আরো অনেককে এই কাজে উদ্যোগী করে তুলেছে; তাঁর আকর্ষণ কাউকে কাউকে সম্মুখে টেনে এনে বসিয়েছে বক্তা ও বিনোদনের আসনে। পাদপীঠে দেখা দিয়েছেন গুরুদেবের

প্রতিভাবান ভক্ত কবি সতীশচন্দ্র রায় এবং ক্রমে দিনুবাবু প্রভৃতি। মনে হচ্ছে, এ পর্যায়টির সময় ১৯০৩ থেকে ১৯০৪—১৯০৫ অবধি।

সতীশবাবুর 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের মুখবন্ধটিতে বিনোদনপর্ব ও তার পাঠ-সভার রূপটি পাওয়া যায়।—"হে কল্যাণীয় শিষ্যগণ, আজ সন্ধ্যায় তোমাদিগকে অনেক-দিন আগেকার একটি শিষ্যের অদ্ভুত গল্প শুনাইব,—তোমরা স্থির হইয়া বোস।

"আমরা ঘরের মধ্যে এই যে দীপ জ্বালিয়াছি কিছু কালের জন্য এটা ভুলিয়া যাও। বাহিরে চারিদিকের মাঠের উপর অনন্ত আকাশের উপর যে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি হইতেছে তাই একবার ভাবিয়া দেখ। মাঠের কোনো প্রান্তে বনের রেখা এমন অস্পষ্ট, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ—উপমা দিয়া বলিতে পারি—যেন কোন প্রকাণ্ড অজগর সাপ এই নতুন বসন্তের আরম্ভে পৃথিবীর বিবর হইতে উঠিয়া মাঠের হাওয়ার মধ্যে, জ্যোৎস্নার মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

"আজ রাত্রে আমরা একত্র হইয়া বসিয়াছি বলিয়া রাত্রির কথাই বলিলাম। দিন হইলে হয়তো দিনের কথাই বলিতাম। কিন্তু, না—রাত্রির বর্ণনা করার আরও উদ্দেশ্য আছে। রাত্রিই গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রকৃত সময়।

"এখন মন উড়িয়া উড়িয়া গিয়া যেখানে যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিতে পারে। চল তবে আমরা সকল ভুলিয়া একবার সেই পুরাতন ভারতবর্ষের বনে ঋষির আশ্রম দেখিয়া আসি। তোমরা ব্রহ্মচারী, শিষ্য, তোমরা একবার সেকালের শিষ্য ব্রহ্মচারীর চলাফেরা, ভাবভঙ্গি দেখিয়া আসিবে এখন।"

শিক্ষাদান এবং পাঠসভার মধ্য দিয়ে ইনি (সতীশ রায়) আশ্রমের আনন্দকে যে কতখানি জাগ্রত ক'রে রেখেছিলেন, এ প্রবন্ধের প্রসঙ্গান্তরে তার আরও বিবরণ পাওয়া যাবে। এঁর সময়েই প্রথমবারের মতো আশ্রমে আসেন দিনুবাবু, সে বোধ হয় ১৯০৩ হবে।

দিনুবাবু শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন সাময়িকভাবে ছাত্ররূপে। এখানকার সাহিত্যের ক্লাসে মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন। আশ্রমের সর্বপ্রাচীন ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় তাঁর 'আশ্রমের পুরোনো কথা' নামক প্রবন্ধে

লিখেছেন—"...সেই বছরের গ্রীষ্মাবকাশের কথা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ম্যাট্রিক—তখনকার কালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—দিয়ে আশ্রমেই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবো স্থির করলাম। ছাত্রদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার ও আমি—অধ্যাপকদের মধ্যে সতীশবাবু, সুবোধবাবু ও জগদানন্দবাবু। আর, অতিথি একটি এসে জুটলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। আমাদের আড্ডার স্থান লাইব্রেরী বাড়ী,—মাঝখানের ঘরে গুটিকতক বইয়ের আলমারি ও পাথরের চৌকি—আর দুপাশের দুই ছোটো ঘরে আমাদের বাসা। ছুটি আরম্ভ হোতেই সতীশবাবু সাহিত্য চর্চা শুরু করলেন। প্রথম দিনেই আমাদের সকলকে নিয়ে ছাতিমতলায় বসিয়ে মেঘনাদবধ পড়তে লাগলেন। মাইকেলের মহাকাব্য যে এমন উপাদেয় লাগতে পারে তা সেইদিনই আমরা পরিচয় পেলুম এবং সকলে মিলে সতীশবাবুকে সাহিত্যগুরু মেনে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিলুম। সকালবেলায় তাঁর কাছে সাহিত্য পড়া আর বিকালে সুরেনবাবুর কাছে বিজ্ঞান আলোচনা চলল।"

সতীশবাবুর চরিত্র-প্রভাব ও পড়াবার কথা দিনুবাবুর কাছ থেকে অনেকদিন অনেক প্রসঙ্গে শুনেছি। বিলেত থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয়বারে স্থায়ীভাবে দিনুবাবু আশ্রমে যোগ দেন—তিনি হলেন সংগীত ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর আসার পর থেকেই এই সান্ধ্যবিনোদন-আসর আরো প্রসারিত হয়। তখন শুধু গল্পই নয়, তার সঙ্গে শুরু হল দিনুবাবু কর্তৃক গুরুদেবের রচিত গান গাওয়া এবং অন্যদের গল্প বলা, বই থেকে কোনো একটা কিছু পাঠ করা ইত্যাদি। আশ্রমবাসী প্রত্যেকেই এসে যোগ দিতেন। পাঠ সভার আরেকটি সুন্দর চিত্র পাই সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাবলীর অন্তর্গত 'আমার ডায়েরি' থেকে।—"সন্ধ্যার দিকে আমাদের পাঠ সভা বসিল। সম্মুখে উদার মাঠে মাঠে ছায়া, মৃদু শীতল বায়ু। পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'কল্পনা' লইয়া প্রথমে 'আজি এই আকুল আশ্বিনে' পড়িলাম। এক রকম লাগিল। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি পড়িতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া স্বর বাহির হইতে লাগিল। সর্বাঙ্গ

কাঁপিতে লাগিল। এবার কবিতাটি বুঝিলাম।……ক্রমে রাত্রি হইল, অনেক পড়া হইতে লাগিল। প্রায় সমস্ত 'কল্পনা' পড়িলাম। 'মানস সুন্দরী' পড়িলাম—সুরেনবাবুর অনুরোধে।……যাক্‌, ক্রমে রাত্রি হইল। দিনুবাবুর গান আরম্ভ হইল। আর সব গান এক রকম লাগিল। কিন্তু 'ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে' গানটি লাগিল কী চমৎকার।…… তারপরে স্থির জ্যোৎস্নাময় শীতলস্পর্শ রাত্রি। দূরে দিগন্তের কাছে যত সব ফিকা মেঘের প্রাকারে পাহারা সৈন্যদের বড় বড় বিদ্যুৎ কেতন চমকাইয়া signal প্রদান কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। উহা পুনরাগত ঝড়ের signal নয়, ও প্রস্থানোন্মুখ মেঘ-পোতের বিদায় signal।……আমি ও রথী জ্যোৎস্নাময় মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে ভূকম্প, ঝড় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম।"

এই সভাতেই গুরুদেব তাঁর নূতন গান নূতন লেখা শোনাতেন। "এখন যেমন নতুন গান হইলে সঙ্গীতজ্ঞরাই তাহা প্রথম উপভোগ করেন, তখন তাহা ছিল না, নতুন গান হইলেই ছাত্র অধ্যাপকদের সান্ধ্য-সভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইতেন না।" (জগদানন্দ রায়, 'স্মৃতি' প্রবন্ধ)

এর পরের পর্বে আশ্রমে এলেন গুরুদেবের মধ্যম জামাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর বিবাহের সময় পাত্রী রেণুকা দেবী ছিলেন এগারো বছরের বালিকা। বিবাহ ক'রেই সত্যেন্দ্রনাথ (এম-বি) বিলেত চলে গেলেন; সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে যখন দেশে ফিরে এলেন, তার এক বছরের মধ্যেই তাঁর পত্নী ইহলোক ছেড়ে চলে যান। তার পরে কৃতবিদ্য হয়েও তিনি বাইরে পসার জমাতে না গিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিলেন এই আশ্রমের সেবায়। শুনেছি, গল্প বলায় এঁর জুড়ি ছিল না। ছেলেদের এত ভালবাসতেন আর নিজে তাদের মধ্যে থেকে সকলের এত যত্ন নিতেন যে, তাঁর সে কথা প্রাক্তন ছাত্ররা এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সার্‌লক্‌ হোম্‌সের গল্প ছিল এঁর বলার বিষয়। এমন চমক লাগিয়ে বলতেন, শিশুরা প্রবল ঔৎসুক্যে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেগে থাকত।

আরো দু'জন শিক্ষক ছিলেন তাঁর সমসাময়িক গল্প-বলিয়ে, একজন অজিত চক্রবর্তী অন্যজন জগদানন্দবাবু। অজিতবাবু বলতেন ট্রেজার আইল্যাণ্ডের গল্প, আর জগদানন্দবাবু বলতেন বিজ্ঞানের গল্প। টেলিস্‌কোপ দেখিয়ে বসিয়ে বসিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গল্প শোনাতেন। এই গল্পের আসর থেকেই তিনি বুঝলেন বলার কৌশলে ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই বিজ্ঞানও কত আদরের হয়। গুরুদেব তখন তাঁকে বিলিতি পত্রিকা থেকে বিজ্ঞানের তথ্যবহুল বিশিষ্ট রচনাংশ চিহ্নিত করে পাঠিয়ে দিতেন। সেগুলি থেকেই তিনি ক্রমে লিখতে লাগলেন বিজ্ঞানের নানা বিষয়, তাঁর অভ্যস্ত বলার কৌশল প্রয়োগ করলেন লেখাতে। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনার সরস ধারা খুলে গেল, সে রচনা দিয়ে পরবর্তীকালে দেশবাসীকে তিনি পরিতৃপ্ত করেছেন। বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাণ্ডার আর বিজ্ঞান-আলোচনা সমৃদ্ধতর ও ব্যাপকতর হল। শান্তিনিকেতনের সান্ধ্যবিনোদনপর্বের এই গল্পের আসর দেশের সাংস্কৃতিক সেবাকাজের ক্ষেত্রেও সুদূর নেপথ্য থেকে একদিন সাহায্য যুগিয়েছে। সতীশ রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' এবং অজিত চক্রবর্তীর লেখা 'কাব্য-পরিক্রমা' ইত্যাদি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক আদি ও মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের উৎপত্তি হয়েছে এখান থেকেই। তার ইতিহাস শ্রীক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'রবীন্দ্রপরিচয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা' নামক রচনায় বিস্তারিত করে বলেছেন ; তাছাড়া কিঞ্চিৎ পরবর্তী পর্বের এই গল্পের আসর থেকে কালে কালে রূপ ধরেছে জগদানন্দবাবুর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ; শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের লোক-সমাদৃত গ্রন্থ 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' বা 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' নামক বইগুলিরও রচনাধারার মূল প্রস্রবণ শুনেছি ছিল এ আসরেরই প্রেরণায়।

এর পরে দিনুবাবুর দ্বিতীয়বারের আগমন। তখন থেকে চলল তাঁরই পালা। বিলেত থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। দিনুবাবু আশ্রমের মধ্যে ছাত্রদের কাছাকাছি যতদিন বাস করেছিলেন, বেণুকুঞ্জে তাঁর আস্তানা ছিল ; গানের জমজমাট সভা বসত তাঁর ঘরে। সকাল বিকাল দু'বেলা, রাত্রি দুপুর

অবধি চলত তার জের। এমন কি, যখন 'সুরপুরী'তে বাস উঠিয়ে সরে গিয়েছেন দূরে, তখনো দেখেছি তিনি অতবড়ো শরীর নিয়ে হেঁটে হেঁটে আশ্রমের ভিতর এসে দুপুরে রাত্রে জমিয়ে তুলেছেন গানের রিহার্সেল,—কোনোদিন শিশু বিভাগে, কোনোদিন পুরোনো হাসপাতালে, দেহলিতে, নয় তো কলা-ভবনের মিউজিয়ামে। শেষ দিকে আর হেঁটে আসতে পারতেন না, মোটরে চলতেন; তবু এসে তাঁর গানের দরবার জমানো চাই। সিংহসদনে অনুষ্ঠিত পাঠসভায় তাঁর মুখে শুনেছি গুরুদেবের 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থ থেকে 'বিনি পয়সার ভোজে'র পাঠ। গুরুদেবের পাঠসভার কথা স্বতন্ত্র; সে তুলনাহীন: কিন্তু দিনুবাবুর পাঠ-সভার রসও কোনোদিনই আর পাইনি।

বিনোদনপর্বের গল্পের আসরের এই অবস্থাতেই এসেছেন আশ্রমে ক্ষিতিমোহনবাবু। তখন থেকে শুরু হল আবার বিনোদনপর্বের আরেক পর্যায়। প্রায় এই সময়েই মারা যান সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর সেই গল্প বলার বিশিষ্ট আসনটি রইল অবশ্য অপূর্ণ-ই। কিন্তু আসরে এলেন নূতন রসের জোগান নিয়ে নূতন বক্তা (ক্ষিতিমোহনবাবু)। তাঁর আগমনের কথা এবং আশ্রমে তখনকার ও তার পরের বড়োদের পাঠসভার চিত্র পাই 'রবীন্দ্র-পরিচয়' পত্রিকাতে তাঁরই লিখিত 'রবীন্দ্রপরিচয়-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে। তাতে আছে—"যাহা কখনো কল্পনা করিতে পারি নাই, সেই সৌভাগ্য জীবনে ঘটিল। শান্তিনিকেতনে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) আশ্রমের সেবায় আসিয়া তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সঙ্গ পাইলাম। এইখানে আমি আসিলাম ১৯০৮ সালের বৈশাখ মাসে। তখন আশ্রমে ছুটি। কাজেই দেশে গেলাম ও পরে আষাঢ় মাসে আসিয়া কাজে যোগ দিলাম।

"এখানে আসিয়া পরিচয় ঘটিল রবীন্দ্র-কাব্যরসিক অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে। দেখিতাম তাঁরা মধ্যে মধ্যে দুই তিনজন বসিয়া রবীন্দ্র-কাব্যের গভীর আলোচনা করেন। কবিবরের ভক্তশিষ্য স্বর্গীয় সতীশ রায়ও নাকি এই মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। ক্রমে

তাঁহাদের মধ্যে আমিও একটু স্থান পাইলাম। কবি দ্বিজেন্দ্র বাগচী ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে আসিতেন, তখন খুব জমিয়া উঠিত। পরে এই মণ্ডলীর মধ্যে আমরা কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলাম 'সন্দেশ'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুকুমার রায়চৌধুরীকে। এই মণ্ডলীর বাছাই করা কবিতা দিয়াই প্রথম 'চয়নিকা' বাহির হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তখন দিনুবাবু আসিয়া আমাদিগকে গানের বন্যায় ডুবাইয়া দিতেন। কবির কাব্যরসের পরিচয়ের এত বড় সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়া গেলাম। পরস্পরের এই আলোচনায় আমরা সব সময়ে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং কবিকে ধরিতাম, কোনো কোনো বিষয় বুঝাইয়া দিতে। অজিতকুমার তো সর্বদাই কবির সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার গান ও কাব্য প্রভৃতি লইয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া আলোচনা করিতেন, তখন আমরা কেহ কেহ তাহার নোট লইতাম। সেই সব পুরাতন নোট এখনো কিছু কিছু আছে।

"কবিবরের পঞ্চাশ বৎসরে যে জন্মোৎসব হয়, তাহার কিছুদিন পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে একটি রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা চলিতে থাকে। শেষের দিকটায় আমরা সংকোচ ত্যাগ করিয়া কবিকে ধরিলাম তাঁহার কাব্য বিষয়ে তাঁহার আপন মতামত বুঝাইয়া বলিবার জন্য। অনেক আপত্তির পর তিনি রাজি হইলেন। তাহার পরে কিছুদিন ধরিয়া তিনি যে নিজের কাব্যের মর্ম আলোচনা করেন, তাঁহার স্মৃতি আজও মনে জড়াইয়া আছে। লিখিয়া তাহা বুঝাইবার নহে। দিনের পর দিন তিনি বলিতেছেন, আর আমরা নোট নিতেছি, এখনও তাহার কিছু কিছু রহিয়া গেছে। কেহ কেহ ধরিয়াছিলেন সেগুলি প্রকাশ করিতে। কিন্তু অজিতকুমারের কাব্যপরিক্রমা প্রকাশ করিবার পরে আর তাহার প্রয়োজন রহিল না।

"তারপরও এক এক সময় আবার আমাদের মণ্ডলীটি বসিয়াছে। কবি ক্রমে ক্রমে তাঁহার শেষের দিকের 'খেয়া' 'নৈবেদ্য' 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতিও আলোচনা করিয়াছেন। অজিতকুমার চলিয়া গেলে পর এই আলোচনাতে একটু শৈথিল্য

আসিয়াছিল। তবু এক এক সময় এক একজন সেবক আসিয়া আবার পুরাতন অগ্নির মধ্যে নূতন ইন্ধন যোগ করিয়াছেন। তখন শেষের দিকের কবিতা 'বলাকা' প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে।"

এটি বিশেষ করে বড়োদের রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠ-সভার বিবরণ; কিন্তু এর মধ্য দিয়েও সকলে অনুভব করতে পারবেন সেদিনের সাধারণ পাঠ-সভার পরিবেশটির নিবিড়তা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠসভা এবং দিনুবাবুর গানের আসরের মতো ছোটদের পূর্বোল্লিখিত গল্পের সভাটিও ছিল তখনকার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এ সভা প্রায় প্রত্যহই বসত, ছেলেদের আবাসগৃহে। গল্প বলতেন জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু এবং নগেন্দ্র আইচ মশায়। জগদানন্দ-বাবু বলতেন তাঁর সেই বিজ্ঞানের গল্পই, ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন জ্ঞান ও রসাবেদনপূর্ণ দেশীয় লোক-প্রচলিত কাহিনী এবং নগেনবাবু বলতেন ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা বিষয় ও 'স্বর্ণলতা' বই-এর—'গডাঢর চণ্ড্রের ডুড খাবার' গল্প। শিশুরা ভক্ত ছিল নগেনবাবুর। আর গল্প বলতেন স্বর্গত নেপালচন্দ্র রায় ও সন্তোষ মজুমদার এবং সময়ে সময়ে বলতেন আরো অনেকে। শিশুদের আর বড়োদের জন্য স্বতন্ত্র করে বসত গল্পের আসর। ক্ষিতিমোহনবাবুর গল্পের আস্বাদ নেশা লাগিয়েছে অনেককে অনেক আসরে,—যেমন আশ্রমে, তেমনি বাইরেও। বিষয়ের দিকে তাঁর গল্প যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রসঙ্গের মুখে তেমনি লাগ্‌সই, আবার তেম্‌নি তা রসালো। সহজেই তা শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করত। জগদানন্দবাবুর গল্প বলার কায়দা ছিল অপূর্ব। তিনি সকলের কৌতূহলকে পুরোপুরি উদ্রিক্ত ক'রে ক'রে গল্পের বাঁধুনিকে নিয়ে চলতেন অধৈর্যের কানায়। "তারপরে,—তারপরে কী হল"—ব'লে ব'লে যখন ছেলের দল একেবারে পাগল হবার উপক্রম, তখন আকস্মিক খুলে দিতেন রহস্যের ডালা। হাসতেন নিজে, হাসাতেন প্রচুর অন্যদেরও।

ক্রমে দিনে দিনে আশ্রমেও পরিবর্তন এল। আধুনিক কালে সান্ধ্য-বিনোদন পর্বে এল গান ও অভিনয়ের পালা। তারও পরে সে সময়টা জুড়ে বসল

পড়াশোনায় এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ল স্কুল-কলেজের সভা-সমিতি, সপ্তাহ শেষে গানের জলশা। দশ বারো বছর আগেও শিশু-বিভাগের ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষকগণ সান্ধ্য উপাসনার পরে গল্প শোনাতেন।

আগেকার দিনে 'আশ্রম-সম্মিলনী'ও ছিল একটি আনন্দ-উৎস। আশ্রমের প্রথম থেকেই ছেলেদের চালনার ভার ন্যস্ত ছিল ছেলেদের নিজেদের উপরেই। অধ্যাপকরা ব্রতী ছিলেন নিজেদের এবং ছাত্রদের জ্ঞান-শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাধনায়। প্রতিদিনই দিনকৃত্য সমাপনান্তে রাত্রে শোবার আগে 'বিচার-সভা'র অধিবেশন হত। তার মধ্যে অধ্যাপকদের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন ছিল না। 'বিচার-সভা'র শাসন-সীমা থেকে শিক্ষকরা সাধারণতঃ একটু দূরেই থাকতেন। পড়াশোনায়, গানে-গল্পে, সেবায়, সাহিত্যচর্চায় দৈনন্দিন জীবনের প্রীতিমাখা ঘরোয়া জীবনেই তাঁদের মেলা-মেশা চলত। এতে আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। রথীন্দ্রনাথের রচনা 'আশ্রমের পুরাণো কথা'য় এর কাছাকাছি সময়ের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাই, তিনি লিখেছেন, —"দু-এক বছরের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল—নতুন অধ্যাপকও কয়েকজন নিযুক্ত হলেন। মনে আছে, যখন আমরা ২৫।৩০ জন হয়েছি তখনও ঐ আদি কুটীরের সংকীর্ণ স্থানে পরম সুখে বাস করেছি—উপরন্তু যে কয়জন অধ্যাপক ছিলেন, সকলেই আমাদের সঙ্গে ঐ ঘরে বাস করেছেন। একথা শুনলে এখানকার ছাত্রদের বিভীষিকা বলে ঠেকবে। এখনকার মতো টেবিল-চেয়ার, আলনা-দেরাজ, আসবাবপত্রের বিড়ম্বনা কিছুই ছিল না। আহার সম্বন্ধেও তাই—সকালে ছোলাভিজে, দুপুরে কলাইয়ের ডাল ও ভাত খেয়ে কাটাতুম—তার জন্যে কোনো দিনও দুঃখ বোধ হয়নি। সে সময়ে রান্নাঘরে 'কমপ্লেণ্ট বুক' বলে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়নি। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ তখন সজীব ছিল—আশ্রমে যারা আসত কৃচ্ছ্র সাধনা করতে প্রস্তুত হয়েই আসত। কিন্তু তার জন্যে আনন্দের অভাব ছিল না। যে কয়জন অধ্যাপক ও ছাত্র একসঙ্গে থাকতুম,

একসঙ্গে ক্লাশে যেতুম,—একসঙ্গে বেড়াতে বা খেলতে যেতুম—সকলের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব ছিল—আশ্রম বলতে একটি বড়ো পরিবার বলে মনে হত। আশ্রমের এই জীবনধারার মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের যা-কিছু খোরাক সংগ্রহ করেছি। তারই মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং বিশেষ লোকের কথা চিরদিনের জন্যে মনে গাঁথা রয়ে গেছে। অধ্যাপকদের মধ্যে সকলের সঙ্গেই আমাদের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল।"

ক্রমে আশ্রমের কাজ-কর্ম বেড়ে গেল ; পরিধি ছড়িয়ে পড়ল, নানা ভাগ-বিভাগ উঠল গড়ে,—অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে অসম্ভব হয়ে উঠল পূর্বের সেই ঘনিষ্ঠ যোগরক্ষা করা। অনেক অধ্যাপক তখন ছাত্রদের মধ্যে বাস না করে পরিবার-পরিবৃত হয়ে স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। গড়ে উঠল 'গুরুপল্লী'। কাজেই, আশ্রম-জীবনে পূর্বের সংহতির একটু অভাব অনুভূত হল। সেই অসংহতিটুকু দূর করবার জন্যে গুরুদেব প্রতিষ্ঠা করলেন স্বায়ত্তশাসনের ক্ষুদ্রাকার অনুষ্ঠান ছেলেদের—'আশ্রম সম্মিলনী'। আগেকার দিনের 'বিচার-সভা'র চেয়ে ছাত্রদের জীবনে এর প্রভাব ছিল যেমন বেশি, তেমনি এর কার্যক্রমও ছিল ব্যাপকতর, বিবিধ এবং দায়িত্বপূর্ণ। সেখানে ছাত্রেরা নিজেরাই নিজেদের দিনযাত্রার যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করবে। তা নিয়ে যা আলোচনা, তা-ও করবে তারাই। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা ছাত্রদের মনে মন মিশিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করতে পারবেন, যাঁরা শাসনের বা শিক্ষাদানের ভাবে নয়, পরন্তু তাদেরই একজন হয়ে শুধু সুব্যবস্থার কাজে ছাত্রদের পারবেন সতীর্থের মতো পরামর্শ দিতে, গুরুদেবের অভিমতানুযায়ী তাঁদেরই মাত্র এ সভায় যোগ দেবার কথা। এ নিয়ে এক সময় তিনি খুবই কড়াকড়ি করেছেন। 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল। প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে

যে গ্লানি মোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।" (শিক্ষা) মাসে আশ্রম সম্মিলনীর অধিবেশন হত দুটি। একটি অমাবস্যায়, আরেকটি পূর্ণিমাতে। কাজের বিবৃতি প্রদান, আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপার-গুলি নিয়ে যাকে বলে কেজো সভা, সেইটে ছিল অমাবস্যা রাত্রে ঘরের সীমানায়; আর গান-বাজনা আবৃত্তি, রচনাপাঠ, নাট্যাভিনয় এবং পরিশেষে—মধুরেণ সমাপয়েৎ—এই আর্য বাক্যের সম্মান রেখে বনভোজনের পর্ব—এ-সব সম্পন্ন হত ছোটদের আনন্দকোলাহলের মধ্যে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠে। এই উপলক্ষে সভা সাজানোরও ধূম লেগে যেত। এক সময় এটাই ছিল ছোটদের একরকম প্রধান উৎসব। শুনেছি এর প্রথম উদ্বোধন হয় বর্তমান টেনিস্ গ্রাউণ্ডে, গুরুদেব ছিলেন সভাপতি। তার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী। গুরুদেব সে সময় এই আশ্রম-সম্মিলনীর জন্য একটি নিয়মাবলীর খসড়াও স্বহস্তে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। আজও অবশ্য এই অনুষ্ঠানটি তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু বলতেই হবে, সে তার উৎসবের সেই জাঁকালো রূপটি হারিয়েছে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে গড়ে ওঠে আশ্রমের বড়ো ছেলে-মেয়েদের একরকমের প্রতিষ্ঠান,—'বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনী'। তার শাখানুষ্ঠানে খেলা-ধুলা বিভাগ, সাহিত্য-সভা, প্রীতি-সম্মেলন ইত্যাদির কর্মধারার মধ্য দিয়ে এবং আধুনিক নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সভা 'সাহিত্যিকা'র উদ্যোগ থেকেও আশ্রমে প্রচুর আনন্দ পরিবেশিত হয়েছে, আজও নানা অনুষ্ঠানে তা হয়ে থাকে।

কয়েক বৎসর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রবীন্দ্র-পরিচয়সভা' স্থাপিত হয়। আনন্দপূর্ণ বিশেষ কয়েকটি সাহিত্যালোচনার আসর এবং নাট্য-নৃত্যগীতোৎসব মুখরিত বাসরও আশ্রম এ সভার কাছ থেকে উপহার পেয়েছে। এ সভারই উদ্যোগে গুরুদেবের সপ্ততিতম বাৎসরিক জয়ন্তী উৎসব প্রথমত

এ আশ্রমেই অনুষ্ঠিত হয়। পরে, এরই প্রবর্তনা আরো প্রসারিত হয়ে কলকাতার বিখ্যাত বৃহত্তর জয়ন্তী উৎসবে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। আর একটি বিষয়ও বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে আচার্য দিনেন্দ্রনাথ কর্তৃক কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা ও পাঠের কাজ এ সভার অধিবেশন উপলক্ষেই সম্পন্ন হয়েছিল।

আশ্রমের পাঠভবনের আদ্য, মধ্য ও শিশু বিভাগের সাহিত্য-সভাগুলিও আশ্রমবাসীর আনন্দবর্ধনের পক্ষে কোনো অনুষ্ঠানের চেয়ে কম যায় না। এদের মধ্যে আবার শিশু-বিভাগের সভাই সবচেয়ে মজার। আজও এর অধিবেশনে অনেক সভার চেয়েই লোকের আগ্রহ বেশি দেখা যায়। আশ্রমের অগুন্তি সভা-সমিতির মধ্যে শিশুকণ্ঠের গান, আবৃত্তি, গল্প-কথন, রচনা পাঠ, অভিনয় প্রভৃতি হর্ষ ও হাসির বন্যায় মাসে একবার আশ্রমবাসীকে উৎফুল্ল করে তোলে। বলা বাহুল্য, এসব সভাসমিতি, গান, নাটক সব-কিছুরই অধিবেশন হয়ে থাকে বিনোদনপর্বে, অর্থাৎ সান্ধ্যোপাসনার পর একটি বিশেষ সময়ে।

আশ্রমে বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন শিল্পকলা, সংগীত, সাহিত্য, অভিনয় প্রভৃতি নানা গুণের প্রদর্শন উপলক্ষ ক'রে, কিংবা, এখানে এসে অনুরুদ্ধ হয়ে যাঁরা তাঁদের বিচিত্র গুণপনা প্রদর্শন করেছেন, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁদের সংখ্যা এবং দানের পরিমাণও কম নয়। আশ্রমের কত উৎসব-আসর ভ'রে তুলেছেন এঁরা আনন্দের উদ্দীপনায়। এসব গুণীদের কাছে আশ্রম চিরদিনই কৃতজ্ঞ। দূর-দূরান্তর থেকে সমাগত এই আনন্দ-পরিবেশক দলের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের ঘরের পাশের গ্রাম ভুবনডাঙা ও শহর বোলপুরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংগঠিত 'রবীন্দ্র উৎসব-সংঘে'র কথাটিও উল্লেখযোগ্য। বিনোদনপর্বে আশ্রমের সঙ্গে তাদের যোগও মাঝে-মাঝে ঘটে থাকে। শান্তিনিকেতনের দীপ দেশ-বিদেশকে আলো দান করে; কিন্তু তার প্রদীপের তলাটিতেও যে অন্ধকার নয়, 'রবীন্দ্র-উৎসব-

সংঘে'র আসরে কোনো কোনো সন্ধ্যায় সেই সত্যই কিছুটা জানবার সুযোগ হয়।

সাময়িক পত্রে উল্লিখিত প্রসঙ্গটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন প্রাচীন অধ্যাপক অধুনা স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখককে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিখে পাঠান—

'শান্তিনিকেতনের বিনোদনপর্ব' বিষয়ে প্রবন্ধটি প'ড়ে যে যে কথা মনে এলো লিখলাম। এ-সব বিষয়ে বিশদভাবে লেখবার মতো স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরে পাব বলে মনে হয় না।

১। দেহলীতে গুরুদেব একনাগাড় বহুদিন বাস করেন নাই। বাসস্থান বদলানোর ঝোঁক তাঁর চিরকালের।

২। গুরুদেবের ছাত্র-বিনোদন সত্যিই এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল—তার তুলনা নাই।

৩। জগদানন্দবাবু কেবল বিজ্ঞানের গল্প বলতেন তা নয়—তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। 'গল্প-দাদু' বললে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।

তিনি এখানে আসার আগেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করেন।

৪। আমি যতদিন ছিলাম টেলিস্কোপ আমিই দেখাতাম। তার আগে জগদানন্দবাবু দেখাতেন। এতদিক তাঁকে দেখতে হত যে তিনি যত করতে চাইতেন তার সময় পেতেন না। তিনি আমাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেছেন, অনেক বিষয়ে আমাকে তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার কাজে তাঁর কাছ থেকে বহু উৎসাহ পেয়েছি। নিচের দিকের অঙ্কের ভার আমার হাতে দিয়েছিলেন, উপরের দিকের নিজের হাতে ছিল। বড়ো ভাইয়ের মতো সাহায্য ক'রে, উপদেশ দিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি খুব উঁচুদরের লোক ছিলেন, এমন কদাচিত দেখা যায়,—'মহাশয় ব্যক্তি' বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন।

৫। রথীন্দ্রবাবু আমেরিকা থেকে একটা ম্যাজিক লণ্ঠন এনেছিলেন খুব ভাল। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মশায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু স্লাইড দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে আমি মাঝে-মাঝে সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করতাম। পরে, রথীবাবু জমিদারীতে যখন নূতন নূতন কাজ আরম্ভ করেন তখন এ-লণ্ঠন সেখানে নিয়ে যান।

৬। গুরুদেব দাগ দিয়ে যে-সমস্ত ইংরেজি কাগজ পাঠাতেন তাই থেকে প্রবাসীতে 'সংকলন ও সমালোচন' আরম্ভ হয়। এই সূত্রে অনেক লেখক তৈরি করেছিলেন, আমি তাদের একজন। রামানন্দবাবু বিদ্যালয়ের অভাব মোচনকল্পে কিছু টাকা দেন। প্রতিমাসে প্রবাসীর ৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ করার জন্যে লেখা ও লেখা সংগ্রহ করার ভার আমার উপরে ছিল। ত্রিগুণানন্দ প্রভৃতি অনেক ছাত্রকে দিয়েও লিখিয়ে নিতাম। পুরাতন সাময়িক পত্রিকা বামনদাস-বাবুর পুস্তকভাণ্ডার থেকে রামানন্দবাবু অনেক পাঠিয়েছিলেন। প্রবাসীর ৪০ পৃষ্ঠা অনেকখানি জায়গা। এখানে তখন লেখার হিড়িক লাগিয়ে দেওয়া গিয়েছিল।

৭। শরৎকুমারের বই বিনোদনের জন্য লেখা নয়—গুরুদেবের আর একটি পরিকল্পনার ফল। অজিতকুমারের খ্রীষ্ট, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সুফী ধর্মের উপর লেখা এবং বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে আমার অতি সামান্য লেখা তারই অন্তর্গত। অবশ্য অন্যদের কাজের তুলনায় আমার লেখা উল্লেখযোগ্যই নয়। আমার মতে ঠাকুর্দার (ক্ষিতিমোহন সেনের) কবীর ও দাদুর আরম্ভ এই পরিকল্পনার সংস্রবে।

শরৎকুমার গল্প বলতেন। তিনি ছোটোদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। খেলার মাঠে প্রতিদিন সর্বকনিষ্ঠদের ক্রিকেট খেলায় সমস্তক্ষণ বল দিয়ে যাচ্ছেন, ছেলেরা তা মারছে দেখেছি। তাতেই আনন্দ পেতেন। এই চিরকুমারের এই আনন্দ দেখে অনেকেই আশ্চর্য হত।

৮। চয়নিকার কবিতা বাছাই-এর কাজ চারুবাবুর হাত দিয়ে হয়েছিল। অবশ্য দু'একজনের যোগ ছিল, যথা সত্যেন্দ্র দত্ত ও দ্বিজেন্দ্র বাগচী।

সুকুমারবাবু তখনো এতটা ওঠেন নাই। পরের সংস্করণে তাঁর হাত হয়তো ছিল।

৯। অজিতকুমারের 'কাব্যপরিক্রমা' পরে আসে—একে 'রবীন্দ্রনাথ' বইখানির অনুবৃত্তি বললে ভুল বলা হবে না। গুরুদেবের ৫০২ জন্মদিনের আগে শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় দুপুরে তিনি আমাদের অনুরোধে কাব্য পড়তে লাগলেন। তিনি যা বলতেন তার সব থেকে উপাদেয় ও বিশেষ অংশ ছিল প্রত্যেক কবিতার আগের কথা—কাব্যসৃষ্টির আগের চিন্তাধারা ও যে-ঘটনা বা উপলক্ষ ঘটিয়েছে তার পরিচয়। গুরুদেব যা বলতেন অজিতকুমার প্রায়ই গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে লণ্ঠনের টিমটিমে আলোতে পুরাপুরি লিখে রাখতেন। আমি এটা জানতাম। জন্মোৎসবে তিনি এরই ভিত্তিতে লেখা এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। এ-লেখা বেরিয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ' নামে। এরপর এই সূত্রে অজিতকুমার যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তাই নিয়ে বই 'কাব্য পরিক্রমা'। গুরুদেবের উপরিলিখিত আলোচনার সঙ্গে 'কাব্য পরিক্রমা'র যোগ 'রবীন্দ্রনাথ' বইখানির ন্যায় প্রত্যক্ষ নয়। তথ্যের দিক থেকে এ-কথা বলে রাখলাম।

১০। গুরুদেবকে ছেড়ে দিলে, গল্পবলায় জগদানন্দবাবুর জুড়ি ছিল না।

১১। সন্ধ্যাকালের জলসা এখানকার বিশেষত্ব। এতে না যোগ দিলে এখানকার লোকই হওয়া যায় না। হায়, এখন সকলে এ-কথা জানেন না, যা এখনো হয় তাতে অনেকে যোগ দেন না—আশ্রমিক জীবন আর নিবিড় নয়।

১২। একটা বিশেষ ভুল হয়েছে—তেজেশচন্দ্রের নাম বাদ গেছে। তিনি ছোটোদের নিয়ে থাকতেন, আর বিনোদন করতেন চমৎকার।

১৩। মন্দিরে গুরুদেবের প্রাতের উপাসনা এবং তারপর শান্তিনিকেতনের জন্যে লেখা, অথবা গান রচনা, এখানকার আশ্রমজীবনে একটি অনতিদীর্ঘ সারবান পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ। তখন যাঁরা আশ্রমজীবনে যোগ দিয়েছেন তাঁরা যেন সে-কালে আর এক লোকে বাস করতেন। গুরুদেব কোনো গান

রচনা করলে সন্ধ্যার জলসায় তা শোনা যেত, কিন্তু তার আগেই, সকাল বেলাতেই, তিনি দিনুদাকে তা দিয়ে যেতেন, কারণ অনেক সময় গানের সুর এ-বেলা থেকে ও-বেলায় মনে রাখতে পারতেন না। দিনুদার আফিস ঘরে একটা জাপানী অর্গান থাকত। দিনু-দা সত্যি-সত্যিই তাঁর গানের ভাণ্ডারী ছিলেন, কারণ তিনি না রাখলে কত সুর যে হারাত তা আজ বলা যায় না। সে-কালে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সপ্তাহে-সপ্তাহে এসে অনেক নূতন সুর দিয়ে যেতেন এবং অনেক গানের সুর স্বরলিপিবদ্ধ করে নিয়ে যেতেন। এইরূপে 'গীতলিপি'র উৎপত্তি হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২০শে ফাল্গুন ১৩৫৭

শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষ

শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষ

১৭৬৫ শকের[১] ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীগণ প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের উত্তরকালের সাধনক্ষেত্র 'শান্তিনিকেতনে' তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঐ দিনে প্রতিবৎসর একটি উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির এই দীক্ষার দিনটির বিষয়ে বলেছেন—"শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি, তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে, যে-বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে; সে হচ্ছে সেই দীক্ষা-গ্রহণের বীজ।... এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন সৃষ্টি ক'রে তুলছে।"[২]

১৮১০ শকের (১৮৮৮ সনের) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১২ কল্প ২য় ভাগে মুদ্রিত মহর্ষি লিখিত ট্রস্টডীড অনুসারে দেখা যায়, বাংলা ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে তিনি প্রতাপনারায়ণ সিংহদের নিকট থেকে আনুমানিক ২০ বিঘা জমি শান্তিনিকেতনের জন্য মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হন। সুতরাং সে আজ ৯০ বৎসর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মহর্ষি পাল্‌কিতে চড়ে বীরভূমের প্রসিদ্ধ গ্রাম রায়পুর থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরছিলেন। রায়পুরের সিংহেরা ধনে মানে বদান্যতায় চিরকাল প্রতিষ্ঠাবান।

এই পরিবারের প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ (লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতৃব্য)[৩] প্রভৃতির সহিত মহর্ষির বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তিনি সেবার এ অঞ্চলে

১। শকের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ করলে ইংরেজী সন হয়।

২। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতের পরিশিষ্ট, পৃ ৩৬৮-৩৭০।

৩। এঁর বিষয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে ও অজিতবাবু প্রণীত মহর্ষির জীবনীতে বিশদভাবে লেখা আছে।

এসেছিলেন। বোলপুর রেলস্টেশন থেকে একটি পথ স্কুলের পাশ দিয়ে রায়পুর গেছে—পাল্‌কি সেই পথেই এগিয়ে আসছিল। পথের অদূরে সুবিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠে ফসল নেই; একগাছি তৃণও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। চারিদিকের মাটি ধ্বসে গিয়ে মাঠের বুক বন্ধুর হয়েছে। এদিকে বেলার সঙ্গে রৌদ্র বাড়ছে। দুপুরের তপ্ত খোয়াইয়ে দূর দিগন্তের একটি উঁচু ঢিবি লক্ষ্য করে পাল্‌কি এগোতে লাগল। ডাঙার উপর দুটি মাত্র ছাতিম গাছ। রুক্ষ ধূসর অসীম প্রান্তর। তারি মাঝে ছায়া বিতরণের জন্যই যেন তারা শাখা নেড়ে আহ্বান জানাচ্ছিল। মহর্ষি দূর থেকে তাদের শ্যামল পত্রের বিচিত্র শোভায় মুগ্ধ হয়ে বরাবর গাছের তলায় এসে উপস্থিত হলেন এবং শ্রান্ত শরীরে পাল্‌কি থেকে নেমে সেখানেই বিশ্রাম করতে বসলেন। সেদিনকার সে শুভ মুহূর্তে স্থানটি তাঁর কী যে ভালো লাগল—তিনি সেই বসাতেই উপলব্ধি করলেন—'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।'

এর পর ছাতিমতলার আকর্ষণে কলকাতা ছেড়ে প্রায়ই তিনি বোলপুরে আসতে লাগলেন। ছাতিমতলার দক্ষিণ পাশে গ্রামের দিকটা তখন ঝোপজঙ্গলে ভরা। সেখানে চোরডাকাতের এক মস্ত আড্ডা ছিল। দিবালোকেও নরহত্যা ঘটত, আর হত্যার পর ডাকাতরা মৃতদেহগুলি ছাতিমের আশেপাশেই পুঁতে ফেলত। খুঁড়তে গিয়ে দু-একটা মাথার খুলিও পরে ওখান থেকে বেরিয়েছে। মহর্ষি বর্তমান নিচুবাংলায় তাঁবু ফেলে তাতেই বাস করতেন। দিনের বেশি সময় তাঁর ধ্যানেই কাটত।

প্রথমে তাঁর সেবক ছিল হরিশ মালী। কিন্তু ডাকাতের উৎপাত আশঙ্কা করে মহর্ষি একজন দারোয়ানের খোঁজ করেন। সে-সময় ভুবনডাঙায় দ্বারিক ডোম নামে একজন বলিষ্ঠ লোক ছিল। দ্বারিকের বাড়ি ছিল বর্ধমানে। শেষ জীবনে ভুবনডাঙায় এসে সে বাস করতে থাকে। তার সাহসিকতা ও লাঠি-খেলায় দক্ষতা দেখে মহর্ষি তাকেই রক্ষীর কাজে বহাল করেন। তার লাঠি-খেলা, রণ-পা প'রে দৌড়ানোর অদ্ভুত ক্ষমতা এখনো স্থানীয় লোকের

গল্পের বিষয়। দ্বারিকের পৌত্র রবি ডোম আজকাল ভুবনডাঙায় বাস করছে।

ক্রমে কিছু-কিছু করে চারিদিকের ঝোপজঙ্গল সাফ্ হতে লাগল। সর্বপ্রথমে নিচুবাংলায় একখানি ছোটোখাটো পাকা বাড়ি প্রস্তুত হয়। তখনো মহর্ষি একাই ছিলেন এখানকার নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। দ্বারিক আসার পর থেকেই চুরিডাকাতি একরকম বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাদ, নবনিযুক্ত দারোয়ান দ্বারিকই পূর্বজীবনে ডাকাতের দলপতি ছিল, মহর্ষির প্রভাবে পড়ে তার অপূর্ব পরিবর্তন হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে এদিককার পথিক ও গ্রামবাসীদের ধনপ্রাণ নির্বিঘ্ন হয়ে আসে।

খুব সম্ভব এই সময়েই ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এখানে আগমন করেন। তিনি তাঁর পুস্তকের পরিশিষ্টে তখনকার বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। তা পড়লে আশ্রমের একখানি স্বভাব-উজ্জ্বল পবিত্র ছবি আপনি মনে উদিত হয়। তিনি লিখেছেন, "প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আমি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। উত্তর আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, ফলভারে অবনত আমলকবৃক্ষসকল সারি সারি দণ্ডায়মান, বকুল বৃক্ষতলে একটি হরিণ শৃঙ্খলিত, অন্য দুইটি সুন্দর কুরঙ্গ বিচরণ করিতেছে। একটি বৃহৎকায় শুন আশ্রমদ্বারে শয়ন করিয়া দূর প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিলাম, দেখি যে, সম্মুখের বারাণ্ডায় মহর্ষি একখানি আসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কোথাও কোনো শব্দ নাই।......তখন আমি মনে করিতে পারিতাম না যে, এই ইংরাজি শিল্প ও সভ্যতাগর্বিত উন্নতজ্ঞান-অভিমানসর্বস্ব বর্তমান যুগে আমার জন্ম হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন বৈদিক-কালের কোনো অরণ্যবাসী তপস্বীর আমি শিষ্য নহি।"

"ইং ১৮৭৩ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লইয়া হিমালয়ে যাইবার পথে এই বোলপুর শান্তিনিকেতনে তিনি কিছু কাল আসিয়া থাকিলেন। (তারও পূর্বে)......একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা হয় এবং পুকুরের গর্তের মাটি

তুলিয়া একটা উঁচু ঢিবির মতো তৈরি করা হয়। সেখানে সকালবেলায় দেবেন্দ্রনাথ একটি চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। স্তূপটা শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে। সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করিয়া বরাবর তাঁহার উপাসনা করার অভ্যাস ছিল।"[১]

দশ বছর পরে ১৮৮৩ সালে চুঁচুড়ায় থাকতে মহর্ষি একবার নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হন। তখন আচার্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁর নিকটে ছিলেন। কয়েকদিন মহর্ষির খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটে। যেদিন রোগ সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়, সেদিন সারারাত্রি নীরবে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝবার পর সকালবেলার উষার আলোকে চোখ মেলে তিনি নানা কথার মধ্যে বললেন— এবার আদেশ হল না। আরো কাজ বাকি আছে, বোলপুরের মাঠে আশ্রম প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম।

রোগ থেকে সেরে উঠে তিনি আশ্রমের কাজ তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ১৮১০ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রহায়ণের এক সংখ্যায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ঠা কার্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়··· দুইজনে উপাসনায় আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন।···বোলপুর, রাইপুর, সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লী হইতে সকলশ্রেণীর প্রায় ২০০ শত লোক আগ্রহের সহিত এই কার্যে যোগ দিয়া আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন মহর্ষির নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজের সকলশ্রেণীর লোকই যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু-সাধারণের তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তিই ইহার কারণ। সভা ভঙ্গের পর সমাগত বন্ধুগণকে শরবত ও তাম্বুল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।" ১৮১৩ শকাব্দের মাঘের তত্ত্ববোধিনীতে 'শান্তিনিকেতনে মঠ-প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক

১। অজিতবাবুর মহর্ষি-জীবনী পৃ ৫৫৪।

প্রবন্ধে লিখিত হয়েছে, "শান্তিনিকেতনে নূতন ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন কার্য গত বৎসর সুসম্পন্ন হইয়াছিল।...এতদিনে সেই মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। বিগত ৭ই পৌষ ঈশ্বরের প্রসাদে ঐ মঠ-প্রতিষ্ঠার কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।"

ছাতিমতলার বেদি, উপাসনামন্দির ও গ্রন্থাগার, মহর্ষির জীবিতকালেই নির্মিত হয়। রোগের পর স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুন তাঁর আর শান্তিনিকেতনে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখানকার উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজেই তিনি কলকাতা থেকে নির্দেশ দিতেন। এমন কি, উৎসব শেষ হলে তার আনুপূর্বিক বিবরণ তাঁকে না শোনালে চলত না। নিজে না এলেও শান্তিনিকেতনের কাউকে কলকাতায় দেখলেই অতি আগ্রহের সহিত আশ্রমের বিষয়, বিশেষভাবে ছাতিমগাছটির কথা জিজ্ঞাসা করতেন। ছাতিমগাছ তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে, মৃত্যুর পূর্বে একটি ডাল তাঁর জন্য কলকাতায় নীত হয়। ১৯০৫ সনে তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

নিজের অনুপস্থিতির সময় মহর্ষি একজন বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে শান্তিনিকেতনে দৈনিক উপাসনার কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন সানন্দে তাঁর হাতেই আশ্রমের যাবতীয় ভার অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত হন। ১৮৮৭ সনে (১৮০৯ শকের ২৬শে ফাল্গুন) দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই তিন জন বিশ্বস্ত অধিকারীর হাতে মহর্ষি শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাপত্র দান করেন। এই ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নে তাঁর সংকল্প ছিল—শান্তিনিকেতনে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো দেশের লোক এসে শান্তিতে ঈশ্বরোপাসনা ও জ্ঞানচর্চা করতে পারবেন। "ধর্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপন করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনো প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস

হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনো রূপ আয় হয় তবে ট্রস্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিংবা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর-অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।" (১৮১০ শকের তত্ত্বোধিনীর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ট্রস্টডীড) সুতরাং দেখা যাচ্ছে জনসাধারণও যাতে মেলার উপলক্ষে আশ্রমের ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়, ৭ই পৌষের মেলার অনুষ্ঠানে মহর্ষি সেরূপই কামনা করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবে আছে, শান্তিনিকেতনে কখনো মূর্তিপূজা বা জীবহিংসা হবে না। এখানে যে মন্দির থাকবে তার আকৃতির মধ্যেও মুক্তির একটি ভাব নিহিত থাকা চাই, যেন ভিতর-বাহির দুদিক হতেই দুদিক স্বচ্ছ দেখা যায়। এজন্যই মন্দিরগৃহটি কাচের দেওয়ালে নির্মিত হয়েছে।

এখানে এসে এমন উদার প্রকৃতির মুক্ত ক্রোড়ে বাস করায় অসীমত্বের মহান্ ভাবটি বিশেষভাবে তাঁর মনকে উদ্বোধিত করে। ছাতিমতলায় বসে বায়ুকোণে দৃষ্টি প্রসারিত করলে যে সুনীল নির্মল গগনচুম্বী দিকচক্র-বালের বিরাট ছবি নয়নসম্মুখে ভেসে ওঠে, তা স্বতঃই মনকে অনন্তের ভাবে পূর্ণ করে দেয়। মহর্ষির অন্যান্য আরো অনেক আদেশের মধ্যে শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমা বেড়া দিয়ে আবদ্ধ করাও নিষিদ্ধ ছিল। পাছে এর সেই অনন্তরূপটি কোনোরূপ আবরণ দ্বারা প্রকাশের পথে বাধাগ্রস্ত হয়, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

অজিতবাবু এক স্থানে লিখেছেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে এই একটি বৃহৎ ভাবী উদ্যোগের বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহা তিনি (মহর্ষি) নিজের ভিতর হইতে বুঝিতেন। সেইজন্য এ জায়গার উপর তাঁহার আশ্চর্য রকমের ভরসা ছিল। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কেহ কোনো নৈরাশ্য বা উদ্বেগ প্রকাশ

করিলে তিনি বলিতেন—'তোমরা কিছু ভেবো না, ওখানকার জন্য কোনো ভয় নাই,—আমি ওখানে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্‌কে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।' শান্তিনিকেতন লইয়া তাঁহার একটি মাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল এই যে, পাছে তাঁহার মৃত্যুর পর অনুরাগী অনুচরবৃন্দ সেখানে কোনোরূপ ভস্ম বা চিহ্ন রক্ষা করেন। যেখানে তিনি তাঁহার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তিকে লাভ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূজার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পূজা পাইতে থাকেন এবং ব্রহ্মের আশ্রম তাঁহার একটা মঠে পরিণত হয়, এই ভয়ে তিনি একদিন কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া এ বিষয়ে তাঁহার মনের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তাঁহার ভস্ম লইয়া শান্তিনিকেতনে যেন কোনো সমাধিমন্দির তৈরি না হয়। সেখানে তাঁহার কোনো কিছু থাকিবে না।"—(অজিত চক্রবর্তী)। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে উদ্ধৃত স্বলিখিত একখানি পত্রের মধ্যে দেখা যায়, তিনি লিখেছেন যে—"শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই লৌহনির্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঙ্কার আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে, 'একং ব্রহ্মাস্তীতি'।"

১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেবার শান্তিনিকেতনের একাদশ সাংবৎসরিক উৎসব। ঐ দিনকার বর্ণনায় তত্ত্ববোধিনীতে লিখিত হয়েছে—

"পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খুব জনতা। বেশ ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্যগীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ব্যাপার দেখিবার জন্য বসিয়া গেলাম। দেখিলাম সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।

পরে ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দিলেন, হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাকে বলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই ব'লেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়ো মানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড় চোপড় জুতো ছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যেসব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত ক'রে নমস্কার করা নয়—তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন

তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতো ছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজামহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমনকি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তারা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা

তাঁদের কাছে আসত—কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তারা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রু পক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতা জুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সে জন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন—কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐ রকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না—প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন—তারপরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ ক'রে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্ত মনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হন-না। শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে—তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকল প্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে—কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না—কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমনে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যলাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে

দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ইহার পরে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সুপ্রশস্ত কাচনির্মিত ব্রহ্মমন্দিরে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। কী সুন্দর দৃশ্য। আলোকচ্ছটায় গৃহের নানারূপ বর্ণ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে খুব কলরব।

উপাসনার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিতে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।”

“১৮১৪ শকে ৭ই পৌষ বুধবার শান্তিনিকেতনস্থ মঠে প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়।” এই উৎসবের বিবরণও আজকের দিনে অনেকের নিকট

কৌতূহলোদ্দীপক হবে মনে করে তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে তা আংশিকভাবে সংকলন করে দেওয়া হল,—"রাত্রি প্রভাত না হইতেই ব্রহ্মনামগানে গগন পরিপূরিত হইতে লাগিল। প্রাতে আট ঘটিকার পূর্বে সমাগত সাধু-সজ্জন সকল মঠের অভিমুখে কীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে মাঠ ধূধূ করিতেছে। রক্তবর্ণ প্রাতঃসূর্য কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সবেমাত্র আকাশে উদিত হইয়াছেন। এই সকল অনুকূল অবস্থায় সহজেই তো ঈশ্বরে মন সমাহিত হয়। তাহার উপরে 'চলো ভাই সবে মিলে যাই সবে পিতার ভবনে' এই সংকীর্তনের প্রত্যেক শব্দ যেন মর্মদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বোধ হইল অসার সংসার ছাড়িয়া সত্য সত্যই আমরা সকলে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যের যাত্রী হইয়াছি।

সংকীর্তন সহ বারত্রয় মঠ প্রদক্ষিণ হইবার পর অর্চনা ও সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু উদ্বোধন উপাসনা ও বক্তৃতা করিলেন। অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এ বৎসর পাঁচ শত বস্ত্র ও পর্যাপ্ত তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপান শ্রেণীর উপরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনান্তে তাহা উৎসর্গ করা হইল।

প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইবার পরেই সকলে কীর্তন করিতে করিতে সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নিম্নে মহর্ষির সাধন-বেদির দিকে চলিলেন। সেখানে বাবু কুঞ্জবিহারী দেবপ্রমুখ কয়েকজন অনেকক্ষণ ধরিয়া সংগীত ও সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। ...মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতরে রাজকুমারবাবুর সংকীর্তন আরম্ভ হইল। রাজকুমারবাবুর সংকীর্তন বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সংকীর্তন শেষ হইতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। এদিকে প্রান্তরের চারিদিক হইতে জনস্রোত আসিয়া উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। উদ্যানের সম্মুখে, অভ্যাগত স্থানীয় লোকদের সন্তোষ বর্ধনার্থে ব্যায়ামপটু কয়েকটি যুবক কলিকাতা হইতে গিয়া বিবিধ কৌশল প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একতান বাদ্য বাদিত হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় আগন্তুক লোকসংখ্যার ইয়ত্তা রহিল না। সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে আবার উপাসনার উদ্যোগ হইতে লাগিল, আগন্তুকবর্গ সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য মঠ বেষ্টন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সন্ধ্যা ৬টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তিভাজন আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ একত্রে বেদিগ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপাসনা করিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিলেন ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ হিন্দিতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিলেন। বেদির পার্শ্বদেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম কী বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে বন্দনগীতি হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।"

গুরুদেবের কাছে সাতই পৌষের গুরুত্ব যে কতখানি ছিল, তাকে যে তিনি কত ভালোবাসতেন, নিম্নোদ্ধৃত দু'খানা পত্রে তার কিছুটা জানা যাবে।

গুরুদেবের পত্র

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত

ওঁ

508, W, High Street,
Urbana,
Illinois, U. S. A.

কল্যাণীয়েষু,

আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলুম আমার মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হোতে লাগল সে আমি বলতে পারিনে, সে-বেদনা শরীরের কি মনের তা জানিনে, কিন্তু ব্যাকুল ক'রে তুললে। তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেননা এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টা তফাত। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে

বোধ হয় আকর্ষণ করছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে-মাঝে জেগে উঠে' ব্যথা বোধ করছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকালকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, কিন্তু কেউ জানে না। তুমি তখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী'। আমি মন্দিরের উত্তর বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মতো যাচ্ছি তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব—তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতরো সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি, জেগে উঠে ঐ গানটা আমার মনে স্পষ্ট বাজতে লাগল। হায়রে, এদেশে কি তেমন সকাল হয় না? সেই অমৃতের অধিকারের মধ্যে জেগে ওঠবার গান এখানকার আকাশে কি ঠিক সুরে বেজে উঠতে চায় না। এদেশে কেবলি কি election আর Balkan Wars, আর Suffrage movement? কলের ধোঁয়ায় আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কলোককে একেবারে ঢেকে ফেললে যে। কেবল গায়ের জোর, কেবল গায়ের জোর—কেবল আদবকায়দা আইনকানুন। সরল আনন্দের ছবি কোথায় দেখব—একেবারে সম্পূর্ণ গরিব হয়ে মনের আনন্দে মাটিতে বসবার সুখ এখানে পাওয়া যায় কোনখানে। এখানে যে টাকাকড়ি না হোলে এক মুহূর্ত চলবার জো নেই—তাই কত বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় তার ঠিকানা নেই—কেবলি ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে চলবার তাড়া। সেই স্বপ্নে যখন ভোরের রাগিণীতে শুনলুম—'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী', তখন আমার মনে হোলো আমি যেন একেবারে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছি, ডাঙা থেকে আমার ডাক আসছে—সেই ডাঙা যেখানে সূর্যের আলো আকাশ ভরা, যেখানে মাঠ মিলিয়ে গেছে নীলের কোলে, যেখানে পুজোর ফুল ফুটে' ঝ'রে পড়ছে, যেখানে উদাস হাওয়া খ্যাপার মতো বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেছে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুকে ক'রে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলায়, আকাশ কপালে চুমো খায়—সমস্ত যেখানে বুকের কাছাকাছি, জগৎ যেখানে বন্ধুর মতো গলাগলি করে।

তখনো অন্ধকার যখন বিছানা থেকে উঠে এসে বসলুম। তারালোকিত আকাশকে একটুখানি যে অভ্যর্থনা করলুম সে কেবল একটু জানলা খুলে। সাড়ে পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হোলো। আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কম্বল পেতে আমরা পাঁচ জনে বসলুম। তোমাদের ওখানে তখন হয়তো সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। আমার এই বন্ধ ঘরের অন্ধকার কোণের মধ্যে তোমাদের প্রান্তরলক্ষ্মী তাঁর সেই অরুণরাগরঞ্জিত শাড়িখানি প'রে প্রসন্নমুখে ক্ষণকালের জন্যে দেখা দিয়েছিলেন—তাঁর সেই শুভ্র দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ আমাদের ললাটকে একবার স্পর্শ করেছে। ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে যেতে পারবে। আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মতো আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি—আমার যা-কিছু আছে সমস্তকে একে একে সোনা ক'রে না নিয়ে কি ছাড়ব। লোহার সিন্দুক বন্ধ হয়ে আছে, মরচে-ধরা তালা খুলছে না ব'লে সব জায়গায় তার স্পর্শ পৌছচ্ছে না, নইলে কিছু কি বাকি থাকত। আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য যে একটা কেন্দ্রকে সে আশ্রয় করতে পেরেছে; এখানে অনেকের মঙ্গলের সঙ্গে তার মঙ্গল; অনেকের আনন্দের সঙ্গে তার আনন্দ জড়িত হয়ে গেছে, এখানে সংসারের দিকে থেকে অমৃতের দিকে সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এখানে অহোরাত্র ঝরনা ঝ'রে পড়বে, কালো পাথরগুলো যত কঠিন হোক যত প্রকাণ্ড হোক ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে, বোঝা কিছুই বাকি থাকবে না। আজ আমি এই দরবারেই জানিয়ে রেখেছি, কিছু যেন চাপা না থাকে, সমস্ত যেন একেবারে ফুঁকে দিয়ে হাসিমুখে হালকা হয়ে চলে যেতে পারি। আমার ইচ্ছাটাকে দিনরাত্রি কাঁধে ক'রে নিয়ে আর যেন বেড়াতে না হয়, সেটাকে তাঁর কাছে ফেলে দিয়ে যেন একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি। 'মা গৃধঃ' তিনি যা দেবার একেবারে পূর্ণ ক'রে দিয়ে রেখেছেন—আকাশ-ভরা দান, জীবন-ভরা যজ্ঞ—যা পেয়েছি তাও নিতে পারিনে ব'লেই লোভীর মতন এমন অল্পের জন্যে

লালায়িত হয়ে বেড়াই—তিনি আমাকে নেবার শক্তি দিন, আকাশে যা' ঝরে পড়বে তা যেন আমি অঞ্জলি পেতে পান করতে পারি। তৃষ্ণা মিটে যাক, দাহ জুড়িয়ে যাক—মলিনতা কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাক্—সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক—অমৃত-লোকের পথ অবারিত হোক এই জীবনের বৃন্তের উপরে চির-জীবনের শতদল বিকশিত হয়ে উঠুক—অন্তরে বাহিরে প্রকাশমান হোক শান্তম্‌শিবমদ্বৈতম্‌।

তোমাদের ওখানে রাত্রের উৎসব এতক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। লোকের কোলাহল শেষ হয়ে এসেছে—শুক্লাত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নায় তোমাদের প্রান্তর প্লাবিত হয়ে গেছে—শুভ্রশান্তি-জলে তোমাদের আশ্রমের অভিষেক হয়ে গেল—এক বছরের মতো তোমাদের মঙ্গলঘট পূর্ণ হোলো, তোমাদের নবজীবনের পাথেয় সঞ্চিত ক'রে নিলে—আজ তোমাদের রাত্রের নিদ্রা শুভ হোক, পবিত্র হোক।

আমার শরীর এবার রুগ্ন। তাই শিকাগো যাওয়া হোলো না। রথী এবং বৌমা এইমাত্র দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গেলেন। তাঁদের এখন কলেজের ছুটি। বোধ হয় ছুটি কাটিয়ে আসবেন। শিকাগোতে এবার ছুটিতে এখানকার ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের একটা সম্মিলনী হবে, তাতে তারা আমাকে প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমার তো হুকুম হোলো না। আজ ৭ই পৌষ কোথাও যাতায়াত আমার চলবে না—আজ সমস্ত দিন আমার মনের মধ্যে নহবত বাজাবার বায়না পেয়েছি—ফাঁকি দিয়ে কোথাও যাব এমন সাধ্য নেই। গত সপ্তাহ ধ'রে আমার রোগের আয়োজন এই আমার উৎসরের আয়োজন; ঝাঁট দিয়ে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার ক'রে ফেললে; সমস্ত শুকনো পাতা বেদনায় পুড়িয়ে ছাই করে দিলে।

আজ সকালে এই জান্‌লার কাছে বসে লিখছি, আমার কিছুতেই মনে হচ্ছে না তোমাদের উৎসবের মধ্যে আমি ছিলুম না। আমি তোমাদের মুখরিত মাঠের কলরব শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের ছেলেদের আনন্দধ্বনি এখানকার

বাতাসকেও নিবিড় ক'রে তুলেছে, আমার সমস্ত মন উৎসবে ভ'রে উঠেছে। ইতি ৭ই পৌষ, ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবছ—মজা কেবল তোমাদেরই হয়েছে, তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারছ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল ?—পঞ্চাশ জন ? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্তত দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেছ, একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল—আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগ্‌ডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়িবাজির সোঁ সোঁ, পট্‌কার ফুট্‌ফাট্‌, পুলিস-চৌকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কান্না গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল—তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলেভাজা ফুলুরি, চিনে-বাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হোলো। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল ; চাঁদোয়ার নিচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হোলো।

সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল—তার খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর ক'রে তিন টাকায় বিক্রি করেছে। ভেবে দেখো—কী রকম ভয়ানক মজা। মেয়েরা এক-টুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, 'এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে'—ব'লে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা। ওঁদের বাজারে এই রকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেছে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েছ, সে এর কাছে কোথায় লাগে। তারপরে মজা—মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল—মজায় একটুও ঘুম হোলো না—নিচে যত গুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তারপরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—তাদের কারো কাশি, কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ, আট আনায় রুমাল-বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারি জিত রইল। (ভানুসিংহের পত্রাবলী,৩০)

(২)

৭ই পৌষ। শান্তিনিকেতনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। এ সময়টিতে দেশের নানাস্থানেই নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আনন্দ জাগে। সংস্কৃতি ও উদ্দীপনার বিচিত্র ধারা প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনের দান বিশেষ রকমের। তার আয়োজন বিচিত্রমুখী ; শুধু দেশের লোকই সেখানে মেলে নি, দেশ-বিদেশের সকলেই এসে মিলছেন। তার উৎসবের আমন্ত্রণ বিশ্ববাসীর দ্বারে। বছরে একবার সকলে মিলে আনন্দ করবেন, সঙ্গে-সঙ্গে

কাজের পরিচয় এবং পরামর্শও করা হবে। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস-ভূমি। নূতন সংস্থাটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে অনেকেই উদগ্রীব; এই উৎসবের সময় সে উদ্দেশ্যও সাধিত হতে পারে। শহরের শিক্ষিত এবং পল্লীর সরল সাধারণের একত্র মেলবার উপলক্ষ,—এখানকার মেলা। দেশের শিল্প ও ব্যবসার প্রসারের পক্ষে তার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রটি বিশেষ সহায়ক। এ-সবকিছুই উৎসবের সমারোহকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

গাছের সহস্রশাখার পুষ্পপল্লবফলশোভা সহজেই চোখে পড়ে; তাকে ধারণ করে আছে যে-মূল, সেটি বাইরে থেকে এক পলকে দেখা যায় না। শান্তিনিকেতনের মূলে আছে গভীর বিশ্বাস,—তার সন্ধান পেলে এবং তার সাধনা করলে সমস্ত দুঃখদ্বন্দ্ব-বাধার উপরে যাওয়া যায়; শান্তিনিকেতনকে হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে সেই বিশ্বাসের অমোঘ শক্তি। উৎসবের দিনে সেই শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে ঔৎসুক্য না জাগলে বলতে হবে সবই বৃথা হল।

আদিতে এখানে এই শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সাধক-জীবনের কথা এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই স্মরণীয়। সংশয়-বিক্ষুব্ধ উত্তাল হৃদয়ে বিশ্বাসই তাঁকে পরম শক্তি ও শান্তি বর্ষণ করেছিল; সেদিন তাঁর বিশ্বাসের অবলম্বন ছিল—একটি বাণী,—তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ওড়া পাতায় লেখা —'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। ঈশ্বরের সেই বিশ্বাস পরবর্তী জীবনে তাঁর সমস্ত কর্মের ও জ্ঞানের মধ্যে প্রকাশমান হয়ে রয়েছে। শান্তিনিকেতনে তিনি মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন; সাধু মাহাত্মাদের অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী নিরিবিলি এই আশ্রমটিকে উৎসর্গ করে যান ট্রস্টীদের হাতে। স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দিয়ে গড়েছিলেন আরো অনেক জীবন। তার মধ্যে তাঁর পুত্রদের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ, সেজো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ;—মহর্ষির বিশ্বাসের আলোক নিজ নিজ জীবনে এঁরা প্রজ্বলিত করে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্তই। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের হাতেই উদ্দীপিত হল তাঁর শান্তিনিকেতনের সাধনা।

ঈশ্বর আছেন, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত, এই ঈশ্বরের বোধকে বাস্তব-রূপেও পাওয়া চাই প্রতিদিনের জীবনে—মহর্ষির এই বিশ্বাস ও আকুতি প্রতিধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিনের প্রাক্কালেও। ১৩৪৭ সনের ৮ই শ্রাবণ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনার উপসংহারে তিনি বলেন—

"সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্বোধন মন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

এই কথাগুলির দ্বারাই কবি 'আশ্রমের আদর্শ' নির্দেশ করেছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বাসমতো। এগুলি কেবল সাজানো কতকগুলি সুন্দর কথার সমষ্টি নয়। বিশ্বাসের সঙ্গে এর যোগ কতখানি,—এ প্রশ্নের উত্তরই কবির সমস্ত জীবন ও বাণী। বিশ্বভারতীর মধ্যে শান্তিনিকেতনের যে মহান্ রূপ বিকশিত হয়ে উঠছে,—এর প্রায় সমস্তই সেই জীবনের বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। সুতরাং এর মূলেও বিশ্বাসের বলই যে কার্যকর হয়ে এতখানি করে তুলছে—তাতে সন্দেহ নেই। পিতা-পুত্রের হৃদয়ে বিশ্বাসই শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আজ আমাদের কাছে কবির জীবনের অনেক অংশই উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের গভীরতার পরিমাণ আজো কি আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি? আর আগেকার দিনে এই নিয়ে লোকের মনে দ্বিধা-ঔৎসুক্য জাগা তো ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের ৮।৯ বছর পরেকার কথা। কবির বয়স তখন ৪৭।৪৮ বছর। দেশে তাঁর শ্রদ্ধা ও সমাদর ক্রমেই বাড়ছে। তাঁর কবিত্ব ও কাজ বয়োবৃদ্ধশ্রেণী অর্থাৎ সমাজের প্রধানগণেরও বিস্ময় জাগাচ্ছে। তখনো বিদেশে সমাদর ঘটে নি। ১৩১৭ সালের ৭ই পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে

এলেন প্রকাশচন্দ্র রায়। ইনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিখ্যাত চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। আশ্রম দেখতে এসেছেন। শ্রদ্ধেয় অতিথিকে কবি সযত্নে স্থান দিয়েছেন 'শান্তিনিকেতনে'র দোতলায়। সে-ঘরের মাঝের কক্ষটিতে দুপুরে প্রকাশবাবু বসেছেন। রবীন্দ্রনাথ এলেন। কবির সঙ্গে আশ্রমের দু'চারজন অধ্যাপকও এসে বসলেন। নানা কথাবার্তা শুরু হল। প্রকাশবাবু কবিকে এক সময় সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন,—বলুন তো, এই যে আপনি গান লিখেছেন,—'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী', এ-কি আপনার মনের কথা।

বড়োদের কাছে এভাবে রবীন্দ্রনাথকে এর আগে জবাবদিহিতে পড়তে হয়নি। ধীরে ধীরে সসম্ভ্রমে তিনি সেদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, অন্তরের পূর্ণ অবস্থায় কবিরা এমন ভাব পেয়ে যান ও প্রকাশ করেন, যা হয়তো প্রতিমুহূর্তের না হতেও পারে। কিন্তু গুরুদেব তাঁর এই ক্ষণিক উপলব্ধিগুলিকে নিগূঢ় সাধনায় জীবনের চির-উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের জীবন আরম্ভ হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই কবির উপর নিদারুণ আঘাত এসে পড়ল সহধর্মিণীর মৃত্যুতে। সেদিন তাঁকে বলতে শুনি—

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখ জালে বজ্র জ্বালালে,
সেই আলো মোর সেই আলো।

তাঁর কাছে আত্মার অমরতা ছিল একান্ত সত্য। পত্নীবিয়োগের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছিলেন,—"মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি

না।” কী বিশ্বাসে যে তিনি এরূপ বলেছেন, তা জানা যায় তাঁর ঐ সময়কার 'স্মরণ' কাব্যের 'বিশ্বদোল' কবিতার কথাগুলি থেকে—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে,
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে।...
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে।

১৩০৯ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ কবিপ্রিয়া পরলোকগমন করেন। তারই পাঁচ বছর পরে ১৩১৪ সনের ঠিক ঐ তারিখেই কবির দ্বিতীয় পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। পুত্র তাঁর পিতার হৃদয় কতখানি জুড়ে বসেছিল, তার কিছু আভাস দেয় 'শিশু' কাব্যখানি। চিঠিতে কবি মোহিতচন্দ্র সেনকে এক সময়ে লেখেন —“খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহ-স্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্র] তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেই জন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে —সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ ক'রে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।”

বালক শমীন্দ্রনাথ ছিলেন 'আকৃতি-প্রকৃতিতে পিতার অনুরূপ'। এই পুত্রবিয়োগের দুঃসহ শোকেও কবি কী দৃষ্টি লাভ ক'রে সমস্ত তীব্রতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তা আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী অবলাদেবীকে লেখা একখানি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে। লিখছেন—“আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্পদিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড়ো উৎকট আকার ধারণ করে,

জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসংগত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমনভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেইজন্য সমস্ত আঘাত কাটিয়ে জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনই চলছে, হয়তো একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়তো সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।" কবির আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এই ঘটনার পরে থেকে আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। সেবার শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের উৎসবের দিনে তিনি ছিলেন শিলাইদহে। সেখান থেকে মাঘোৎসবের উপলক্ষে কলকাতায় এসে যে ভাষণ দান করেন, তার মধ্যে তিনি বললেন,—"হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা, হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া ওঠে—তখন জীবনে তোমার এই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না—এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি ;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।"

কী মর্মান্তিক ঘটনার পর কবির এই কথাগুলি লেখা, তা স্মরণ রাখলে, আমরা বুঝতে পারব, কী অগাধ বিশ্বাসের বলে দারুণকেও তিনি এমন প্রিয় করে পেয়েছিলেন। আশ্রমবাসী প্রাচীনেরা বলেন, সেবার যখন কবি আশ্রমে প্রথম ফিরে এলেন, তখন তাঁকে দেখা গেল এক অপূর্ব মূর্তিতে। শ্মশ্রুমণ্ডিত সুগভীর আত্মস্থভাবে সেই তাঁর যে আবির্ভাব হল, তার আর পরিবর্তন ঘটেনি কখনো। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির একটি দুটি তখনই আশ্রমবাসীরা প্রথম শুনতে পেল কবির কণ্ঠ থেকে। তিনি এসে গাইলেন,—'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে।'

এর পরে আরেকটি বিয়োগবেদনার কালেও দেখা যায়, কবি তাঁর প্রাণকে মেলে ধরেছেন সেইখানে,—'যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান'। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা দেবী) যখন মৃতুশয্যায়, কবি তখন কলকাতা ছেড়ে একবার চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। লক্ষ্য করবার বিষয়, পুত্র শমীন্দ্রনাথের বিয়োগের পর কবি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বাইরে সুদূর শিলাইদহে। এ-বারে কন্যাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে তাঁকে চলে আসতে হ'ল বাইরে থেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রয়ে। এত ক'রেই তখন শান্তিনিকেতন তাঁর আত্মার শান্তির স্থল হয়ে উঠেছে। চিঠিতে তিনি লিখছেন, "জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবন-মৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখানে থেকে বেলার জন্যে যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।" ঘটনাচক্রে এমন দাঁড়িয়েছিল যে, রোগ ছিল দুরারোগ্য এবং কবিরও সেক্ষেত্রে করবার মতো সত্যই কিছু ছিল না। এ বেদনা যে কতখানি মর্মান্তিক, তা আমরা কী করে বুঝব। কিন্তু জীবনের সব সুখ-দুঃখের সমাধানে সেই 'ঈশা-বাস্যে'র বিশ্বাসই যে কবিকে আলো জুগিয়েছে, তা ঘনিষ্ঠতম কয়টি ঘটনা থেকে স্পষ্ট অনুভব করা যেতে পারে।

তাঁর সাধনা-কেন্দ্র এই শান্তিনিকেতনের সেবার মূলেও রয়েছে বিশ্বাসেরই অফুরন্ত জোগান। লোকালয়ের এলাকা-ছাড়া মরুভূমি-সদৃশ মাঠের মাঝে তাকালেই পরিবেশের শূন্যতা ও শুষ্কতা এমনিতেই সাধারণতঃ হৃদয়ের বাস্তব আশার স্থলকে মরুভূমি করে তোলে। সেখানে সুদীর্ঘ কাল ধ'রে কবি তিলে-তিলে আত্মদান করে গেলেন, বিশ্বকে এনে সেইখানেই মেলালেন 'বহুর বিচিত্র ঐক্য সম্বন্ধ'-রূপ সৃষ্টির কাজে; আজ শেষে বাস্তবতও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সাহায্যে শ্যামশস্যভরা রমণীয় প্রান্তরে পরিণত হতে চলল তারই চারপাশের খোয়াইডাঙা। এত সমৃদ্ধির পিছনে যে নৈরাশ্যের রাহু বারে বারে সব

সম্ভাবনাকে গ্রাস ক'রে ফেলবার উপক্রম করেছে, তাকে কবি বারে-বারেই এই অটল বিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়েছেন যে, শান্তিনিকেতনের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, কিছুতেই তার বিলয় নেই। এই সত্য কী? এই সত্য হচ্ছে সেই 'ঈশা-বাস্যে'রই বোধ। এই বোধ মহর্ষির জীবন থেকে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে এই ভাবাত্মজ আশ্রমে এবং তাঁর দেহাত্মজ সন্তানের মধ্যে। "আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকে সত্য করে পূর্ণ ক'রে জানতে হবে।...আত্মাকে সত্য ক'রে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত ক'রে তাকে শোকের বাষ্পে, ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় ক'রে দেখবার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়। আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে।...আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির ক'রে নিতে হবে।.. একটি চাকা কেবলই ঘুরছে, তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ ক'রে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন।.. লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই, প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।" এই কথাগুলি কবি বলেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন-উপদেশ মালায় 'বিশ্বাস' নামক ভাষণে ১৩১৫ সালে। ভারতবর্ষের এই সনাতন লক্ষ্যটিকে তিনি দেখিয়েছেন ঐতিহ্য থেকে উদ্ধার করে উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের মধ্যে 'পাওয়া' নামক ভাষণে। কবি বলেছেন, "মানুষের এমন একটা পাওয়া আছে, যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেই জন্যই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন,—যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং

তেন কুর্যাম্? সেই জন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন পরমাত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই শোকে, আনন্দে তাঁরা চির আনন্দময় হয়ে নিত্যধাম লাভ করেছেন। "আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন, তারা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।" (নিত্যধাম,—শান্তিনিকেতন উপদেশমালা) রবীন্দ্রনাথ অন্তরে এই আনন্দ লাভ করেছিলেন ব'লেই লিখতে পেরেছিলেন—

মৃত্যু কহে 'পুত্র নিব', চোর কহে 'ধন';
ভাগ্য কহে 'সব নিব যা তোর আপন'।
নিন্দুক কহিল 'লব তব যশোভার',
কবি কহে, 'কে লইবে আনন্দ আমার।'

কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় ছিল ঈশ্বর। তিনি তাঁর ভাবে তাঁকে উপলব্ধি ক'রে গেছেন; শান্তিনিকেতন আশ্রমের সেই সাধনাই মূলগত সাধনা। কবির জীবনের সঙ্গে আশ্রমের-ও প্রতিদিনের জীবন এগিয়েছে এখানে সেই সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই। এখানকার উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই ব্রহ্মসাধনানুগ সর্বানুভূতির বিস্তার লক্ষ্য করেই।

একদিন নিখিল প্রাণের বিস্তার সাধনা ভারতবর্ষের সমস্ত উৎসবের লক্ষ্য ছিল। কবি 'নবযুগের উৎসব' নামক ভাষণে বলেছেন, "সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল,—কেন না সেই দিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃত-যজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই ছিল তাঁর উৎসবের দিন।"

নিত্য জীবন এবং নৈমিত্তিক উৎসব—এ দুয়েরই লক্ষ্যের ধারণা কবির কাছে যে প্রতিভাত হয়েছিল, তার মধ্যে ঈশ্বরের নামরূপে তিনি একটি অনন্তের সত্তাকেই সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন। সে সত্তাবোধে যে অখণ্ড যোগের ভাব নিহিত আছে, তার সম্বন্ধে কারোই মতানৈক্য থাকবার কথা নয়। ধারণায় আমরা অনেক কিছুই আহরণ করতে পারি, কিন্তু তাকে জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত করাই অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। একমাত্র জীবনের সর্বাঙ্গীণ কাজে, চিন্তায় ও কথার মধ্যেই সে বিশ্বাসের রূপ আপনার সত্যতাকে প্রমাণ করে তুলতে পারে। শুধু মুখের কথায় নয়, শুধু কাজেও নয়।—আবার শুধু মননের দ্বারাও সে সত্যতা প্রমাণিত হয় না। সেই প্রমাণই প্রকাশচন্দ্র রায় একদিন পেতে উৎসুক হয়েছিলেন কবির সাক্ষাতে শান্তিনিকেতনে এসে, আশ্রমের আদিবাসগৃহ 'শান্তিনিকেতন' নামক পুণ্যধামে ব'সে।

(৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণ। তিন-চারশ বছরের অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে আলোড়ন লেগেছে, জড়তা দুঃসহ পাষাণ-স্বরূপ চেপে আছে, এ মুহূর্তে তাকে না নাবালে নয়। নব জাগরণের আলোর ছোঁয়াচ এসে পৌঁচেছে, মোহ এবং অজ্ঞানতার নাড়ীর বাঁধন তবু যে রইল আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে। কে যে কেটে দেবে, ডাক তার উঠে গেছে দিকে দিকে, আত্মার ক্রন্দনে। পাকের পর পাকের বাঁধন, তা থেকে তাকে পৃথিবীতে আনা কি একজনের কাজ! ব্যথার পর ব্যথা বাজল, কত রক্ত ক্ষরল, ক্ষতি সইল একের পর এক; একসঙ্গে দলে দলে এলেন —সাধক, ভাবুক, জ্ঞানী, গুণী, কর্মী, শহীদ; নানা দিক দিয়ে সে কী জোয়ার! তারপরে দ্বার খুলল, ধারা বইল, নবযুগ এল ভারতে, বিশ্বের দরবারে সে নতুন করে পেল অভ্যর্থনা। অন্ধকারের বুকে যে মহা আগুন জলে উঠেছিল, সে আগুনের দীক্ষা গুরুদের হাত দিয়ে নানা তিথিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল জাতির জীবনে। তার মধ্যে ৭ই পৌষ এক বিশেষ তিথি। বিংশ শতাব্দীর এক ৭ই

পৌষের দিনে এ দিনটির ব্যাখ্যা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"৭ই পৌষ দিনটি দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—সেই দীক্ষার যে কত বড় অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলেছে?……তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে।…সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয় অগ্নির দীক্ষা।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে দীক্ষা নিয়েছিলেন, সে দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে কত তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, বহির্দ্বন্দ্ব, কত যে জ্ঞানস্পৃহার ও শান্তিসাধন করার ব্রত ধারণ করা ছিল, সে তাঁর আত্মজীবনীর ছত্রে ছত্রে তাঁর নিজের ভাষাতেই লেখা আছে। সমস্ত ধন-জন সুখসম্ভোগের মধ্যেও এই যে বিপ্লবের নিদারুণ তপস্যা, সে কি কেবল তাঁর একার মুক্তি লাভের জন্য? মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের ব্রত জাতির এক নতুন দীক্ষা গ্রহণের দিনস্বরূপ—নতুন চেতনার দীক্ষা। তার স্বরূপটি আমাদের ভালো করে এখানে বুঝে নিতে হবে।

সেদিন মধ্যযুগের অন্ধকার তরল হয়েছে, ইংরেজ জ্ঞানের মশাল জ্বালছে নিজের স্বার্থে, জ্বালছে আবার সত্যের প্রেমের খাতিরেও। সে আলোকে চোখ ফুটল, নতুন জেগে বাঙালী দেখল সামনে অকূল অতল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র, আর ভারতের সেখানে কী মূঢ়তা-মগ্ন অবস্থা। মহর্ষির প্রথম গানেই তাই শুনি বেজে ওঠে জ্ঞানের প্রার্থনা,—'হবে কী হবে দিবা-আলোকে—জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার'। পরে পরে রামমোহন আর দেবেন্দ্রনাথ মিলে আত্মসন্ধানের এবং ভারত-আত্মা সন্ধানের সে কী প্রচেষ্টা। শিক্ষাবিস্তার এবং বিশেষ করে হিন্দু সভ্যতার খাঁটি সম্বলটুকু উদ্ধার করতে এবং তাকে বাড়িয়ে তুলতে যে সাধনা তাঁরা শুরু করেছিলেন তারই ঢেউ উঠে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষ ভাগ উত্তাল হয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিলেন সাধকগণ; সাধকের যুগ শেষ হল, নবযুগে মনীষী এবং তত্ত্বজ্ঞানীর প্রথম আবির্ভাব হল বাংলার বুকে। তাঁদের দান হচ্ছে বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন একটি

উচ্চ মান। জাতীয়জীবনে রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথের অনেক দানের মধ্যে একটি বিশেষ দান হচ্ছে লোকসমাজের চিন্তাধারার বাহন সৃষ্টি করা। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বলা যায় দেশের উচ্চতর সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের জনসংযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। একদিন বৈদিক ভাষা ছিল দেশের ভাষা। তাতে দেশের রস এবং মননের ধারা দুই-ই সবার মধ্যে পরিবেশিত হত। তারপর সংস্কৃত হল বইয়ের ভাষা। সংস্কৃত দেবভাষা হয়ে রইল, লৌকিক ভাষা হল না। বুদ্ধদেব লৌকিক ভাষা পালিতে উপদেশ প্রদান করতেন; অশোক লৌকিক ভাষায় তাঁর যত উপদেশাবলী ক্ষোদিত করে রেখে গেছেন। দেশের জনসংযোগই তাঁদের বাঞ্ছিত ছিল। কিন্তু তারপরে দেখি হাজার বছর জন-সংস্কৃতি রয়েছে অবজ্ঞাত। মাথার সঙ্গে দেহের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগ নেই। নবম দশম শতকে চর্যাপদে যোগিগণ তাঁদের সাধনাপ্রণালী সাধারণের ভাষায় প্রচার করেছেন। এ ছাড়া লৌকিক ভাষায় আর কিছুই এখনো পাওয়া যায় নি। সংস্কৃত ভাষার উপরেই উচ্চতরদের ঝোঁক। মধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণে সে সাহিত্যও হল বিনষ্ট। তিন-চার শ' বছরের সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতর কিছুরই প্রকাশ নেই। লোকসমাজ বুভুক্ষু মন নিয়ে কাটিয়েছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। মুসলমান দরবারে ফারসি চল্‌তি ছিল, দেশ ছিল তার থেকে দূরে। বাংলার মনের উপর, ভাষার উপর সে কিছুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। মধ্যযুগের মাঝামাঝি এবং শেষ দিকে যে লৌকিক রসের শীর্ণ ফল্গুধারা বইল, তার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে অবসাদ ভয় নতিস্বীকার—জাতীয় জীবনের গ্লানি ও দীনতা। দেখা যায় জনসাধারণ কত নিপীড়িত নিরন্ন। শেষ দিকে সে ভয় এবং নতির ভাব কেটে গিয়ে অবশ্য স্নেহ প্রেম জাগছিল, কিন্তু রসের ঘটেছিল বিকৃতি। দেশে মনোরঞ্জক সাহিত্য ছিল, মনন-সাহিত্যের চিহ্ন ছিল না, না উচ্চতর না সাধারণ স্তরের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই মনন সাহিত্যের উদ্বোধন করেন রাজা রামমোহন রায় এবং বিশেষ ক'রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লৌকিক ভাষায় তত্ত্ববোধিনী

সভা ও পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল এবং বাঙালী আপামর জনসাধারণ পেলে নব বল, বলিষ্ঠ চেতনার সতেজ স্পর্শ। সত্যই ৭ই পৌষ দিনটির সূত্রপাত সেই চেতনার অগ্নিদীক্ষা গ্রহণে। রবীন্দ্রনাথ তার দীপ্ত শিখা।

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব এইজন্যই জাতীয় উৎসব বিশেষ। সংস্কৃতি বিকাশের ধারা-বাহক এ উৎসব। দিনে দিনে এটি বিকশিত হয়েছে, আরো হবে। মহর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে জাতির সচল জীবনে পৌষ উৎসবের আগ্রহপূর্ণ জনতার ভিড় দেখে নিঃসংশয়ে একথা বলা যায়। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে জনসাধারণ এসে মিলিত হয়, তার রূপ অপূর্ব। ৫ই ও ৬ই পৌষ বোলপুরের রাস্তা থাকে লোকে লোকারণ্য; ট্রেনে ট্রেনে ভিড়। সবাই শান্তিনিকেতন-যাত্রী। চলতে চলতে সে ভিড় এসে থামে আশ্রমে।

ইতিপূর্বে পুরোনো দিনের উৎসব ও মেলার খবর দেওয়া হয়েছে। এবারে হাল আমলের খবরটি পেলে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক পৌষ-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে ধারণা গঠনে সুবিধে হবে। ১৩৫৮ সালের (১৯৫১) পৌষ উৎসব ও মেলার বিবরণ নিম্নে সংকলিত হল। পঞ্চাশ বছরের আনুষ্ঠানিক উৎসবরূপে এটি স্মরণীয়।

সাতই পৌষের প্রভাতে যখন পূর্ব দুয়ার ভেঙে জ্যোতির্ময় দেখা দিল—সে সময় পৌষ-উৎসবের অগ্নিদীক্ষার উদ্বোধনে উপাসনা হল সপ্তপর্ণীর বেদী-প্রাঙ্গণ-তলে। বেদী প্রাঙ্গণ আলপনায় সাজানো, বেদী খালি, শুধু বড়ো একটি পাত্রে রাখা আছে কিছু ফুল। বেদীর বিপরীত দিকে আচার্যের আসন। চারপাশে ঘিরে উপরে নীচে অগণিত দর্শক। গানের শেষে উৎসবের উদ্বোধন হল। আচার্য বললেন ৭ই পৌষ উৎসবের তাৎপর্য, বললেন তার সফলতার কথা। সে অনুষ্ঠান-শেষে ছাতিমতলা পরিক্রমা ক'রে গাওয়া হল 'কর তাঁর নাম গান'। গান গেয়ে উত্তরায়ণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণতি জানাবার পর শুরু হল

পৌষ মেলার উৎসব। তিন দিন মেলা এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারা বয়ে চলল।

আটই পৌষের প্রভাতে সমাপ্ত হল বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব। আম্রকুঞ্জে জনতার ভিড় বাধা মানে না। গত বছর বিশিষ্ট অতিথি এসেছিলেন শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিখনলাল আত্রেয় প্রভৃতি। বিশ্বভারতী তখন বিশ্ববিদ্যালয় হবার মুখে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেছিলেন—ভারতে এখনো আরো বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আছে। সবগুলো যেন এক ছাঁচে ঢালা না হয়। কোনোটি হোক শিল্পকলায় বিখ্যাত; কোনোটি উন্নত হোক বিজ্ঞানে, কারিগরিতে; আবার তত্ত্ববিদ্যার চর্চা নিয়ে থাক্ কোনোটি। প্রত্যেকটি তার নিজস্ব আদর্শে গঠন করুক উৎকৃষ্ট ছাত্রদল, গঠন করুক দেশ জাতি; বিশ্বে সম্মান শ্রদ্ধা পেয়ে আবার ভারতবর্ষ মাথা তুলে দাঁড়াক। বিশ্বভারতীর আদর্শ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তাকে ভালোভাবে জানতে হবে, সবাই মিলে তাকে সঠিক রূপ দিতে হবে। রবীন্দ্র-সাধনার বৈশিষ্ট্য রক্ষাতেই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা।

গত বছর বিকালে চীন-ভবনে চীনভারত মৈত্রী সমিতির শেষ অধিবেশন হয়। তাতে অধ্যাপক আত্রেয় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, আজকাল রাজনীতির যুগ। যাঁরা রাজনীতির নেতা, তাঁদেরই মানসম্মান। তাঁরা আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। যে দল ক্ষমতা লাভ করে তারাই গভর্নমেণ্ট দখল করে, দেশের শাসন-ক্ষমতা হয় তাদেরই মুষ্টিগত। দেশের লোক তাদেরই অনুসরণ করতে থাকে। মানুষকে এই করে বীরপূজার নেশায় পেয়ে বসে। মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুগামী হয়। প্রাচীন ভারতে শেষোক্ত পরিণতিই ঘটেছিল। এখান থেকে যাঁরা ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁরা রাজ্য বাড়াতে যান নি, গিয়েছিলেন সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচার করতে, মানুষকে মানবিকভাবে উন্নত করতে। তাঁদের পতাকা আজও অবনমিত হয়নি। দিকে দিকে তা উড্ডীন রয়েছে;

সুদূর মহাচীনেও তার নিদর্শন বিরাজিত। বিশ্বভারতীর চীনভবন তারই প্রতীক।

বর্তমান বছরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সর্বপল্লী রাধকৃষ্ণণ এসে বলে গেলেন—বিশ্বে বিবদমান দুটি ধারা চলছে; একটিতে যা বলছে, অন্যটিতে তার বিপরীত সুর তুলছে। আজ,—হয় এটা, নয় ওটা,—এই হচ্ছে দুয়েরই বুলি। এটাতেই বরাবর সংঘর্ষকে জিইয়ে রাখছে। প্রাচ্যের বাণী হচ্ছে—জগতে দুয়েরই স্থান আছে এবং তাদের পাশাপাশি থাকা সম্ভবপর। এই সত্যকে বিশ্বাস ক'রে দুইটি বিরোধী ধারার সমন্বয় করতে হবে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ অর্থসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতবাসী জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ক'রে সাগরের তলদেশ ও ভূগর্ভ থেকে মণিরত্ন আহরণ করত। তার জ্ঞান ও সাহিত্য-সম্পদেরও অন্ত ছিল না। সে-সব যে সম্ভব হতে পেরেছিল তার কারণ, এই অপূর্ব সাহিত্য ছিল কঠোর পরীক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা-সংযুক্ত, উন্নত ধরনের বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত শিক্ষা-প্রণালীর পরিণত ফল। আচার্যের কাছে ছাত্ররা নিজেরাই এসে জুটে যেত, ফলে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আপনি গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হয় সরকারী সাহায্যে, নয়তো দেশের লোকের ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর নির্ভর করে চলত। তখন তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, নালান্দা, কাশী, কাঞ্চী বিক্রমশীলা, মাদুরা, বলভী প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। আজকাল যেমন লোকে শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করবার জন্য ইউরোপ আমেরিকা যায়, এক সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসত। ভারতবর্ষকে আবার সেই স্তরে উন্নীত করতে হবে। আচার্যগণ এই বাণীই শুনিয়ে থাকেন বর্ষে বর্ষে আটই পৌষের সমাবর্তন উৎসবে।

৯ই পৌষের প্রভাতের প্রথম অনুষ্ঠান হল 'স্মৃতি-সভা'—আশ্রমের পরলোকগত ব্যক্তিগণকে স্মরণ; সন্ধ্যায় যীশুখ্রীষ্টের স্মরণ-তিথি—২৫শে ডিসেম্বর। মৃতগণ

যে আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নন, অচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ, এ কথাই এ অনুষ্ঠান থেকে জানা যায়। উৎসবের দিনেই অন্তরে বেজে ওঠে, আমাদের প্রিয়জনগণ কোথায়। একদিন তো তাঁরা এমনি সত্য ছিলেন, আজ কি এমনি মিথ্যা হলেন। চোখের দেখায় মিথ্যা হলেও আমাদের মনের প্রেমে তাঁদের আমরা প্রত্যেক উৎসব-তিথিতে স্মরণ ক'রে উৎসব-আনন্দ পূর্ণ করি। পিতৃগণকে স্মরণ করি, স্মরণ করি মৃত সন্তানগণকে—পরলোকগত হয়ে তাঁরাও পিতৃলোকেরই হয়ে গেছেন। অতীতদের নমস্কার ক'রে বর্তমানের আমরা কাজে অগ্রসর হই।

সকালের এই ঘরোয়া সুরের সঙ্গে সন্ধ্যায় আরেক বড় বেদনার সুর লাগে। এই দিনটিতেই জগতে মহামানব যীশু এসেছিলেন। একদিন এমনি শীতের রাত্রে জন্মেছিলেন তিনি। সেদিন মানুষ তাঁকে ঘরে স্থান দেয় নি। তাঁর স্থান হয়েছিল পশুর খাবারের পাত্রের মধ্যে। আজ পর্যন্ত মানুষ তাঁকে আপন করে নিতে পারল না, স্থান দিল না অন্তরে। সেখানে হিংসার ছুরিতে পড়ছে শান, বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরিত হচ্ছে, মহামানবদের প্রেম হচ্ছে উপহসিত। মহাপুরুষগণ দেহে বাঁচেন না, বাঁচেন তাঁদের আদর্শের মধ্যে। দু' হাজার বছরের সভ্য মানব আজো প্রতিদিনই তাঁকে আদর্শের অপঘাতে দুঃখ দিচ্ছে।

১০ই পৌষ উৎসবের শেষ দিন। পৌষ উৎসবে যারা ভিড় ক'রে এসেছিল, তাদের ফেরবার তাড়া পড়ল। দোকানে দোকানে সাড়া জাগল। উৎসব শেষ, যেতে হবে, এবার যেতে হবে। কিন্তু যেতে যেতেও যাওয়া হল না, ভাঙতে ভাঙতেও মেলা সারাদিন লেগেই থাকল।

১১ই পৌষ, ভোরবেলা। সবাই ব্যস্ত। তবিল গোটাচ্ছে, চালা ভাঙছে, লাভ লোকসানের হিসেব কষছে। চুড়িভাঙায়, ছাইগাদায়, ছেঁড়া কাগজে মাঠ ভর্তি। সে কতদিনের কথা, ৭ই পৌষে তখন একদিন মাত্র মেলা (১৯১৫ সন ?) বসত। তখন সমাবর্তন উৎসব নেই, আশ্রমের অন্য অনেক-সব অনুষ্ঠানও ছিল না, সেদিন ৮ই পৌষের মন্দিরের উপাসনায় গুরুদেব বলেছিলেন—

"ভাঙামেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতা-পাতা পেলে বেঁচে যাই, তখন এমনি হয়েছিল যে, না হলে চলে না!······

কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি—ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।······

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন ভোর হবে হবে করছে, তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে—ওরে চল্ রে, ওরে গোরু কোথায় রে, ওরে গাড়ি কোথায়। তখন ওই রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলা এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠেছে।······

সমস্তই রইল—পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে—এবার যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে।"

মহর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ পেরিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে ভারত নতুন যুগের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হল। নতুন যাত্রা পথে শান্তিনিকেতনের উৎসব থেকে একটি বিশিষ্ট চেতনা জাতির জীবনে সঞ্জীবিত হতে থাক্। মহর্ষি এবং রবীন্দ্র-নাথ সংস্কৃতির যে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, বর্ষে বর্ষে তা আমাদের শীতের কুহেলি ও জড়তা থেকে আলো উত্তাপে মুক্তি দিয়ে চলুক।

এ পর্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া গেল, মোটামুটি অনুষ্ঠানের এই বাঁধা সূচী অনু-সারেই প্রতিবার উৎসবের ধারা চলে আসছে। অন্যান্য বারের অনুষ্ঠিত একটি বড়ো ব্যাপার এবারে বাদ গেছে—সেটি চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন।

এবারকার বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাচার্য রথীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সমাবর্তন সভার বাংলা ভাষণটি। মামুলি বক্তৃতা নয়। সাহিত্যশিল্পে খচিত সুন্দর একটি উপভোগ্য রচনা; অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের স্বাদ এতে কিছুটা মিলেছিল।

এবারকার উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল—প্রাক্তন ও বর্তমান আশ্রমবাসী-দের সম্মিলন। ৯ই পৌষ বিকালে আমবাগানে অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল। বর্তমানগণ প্রথমে কয়েকটি গান, আবৃত্তি ও একটি ক্ষুদ্র ভাষণের দ্বারা প্রাক্তন-গণকে স্বাগত করলেন, তার পরে প্রাক্তনদের পক্ষ থেকে তিন চারজন প্রবীণ ব্যক্তি উঠে আশ্রমের অতীত নানা ঘটনা ও আদর্শের বিষয় একে একে বলে সকলের আনন্দবিধান করলেন। দু একজনের উক্তির সরস ভঙ্গিমায় সভাটি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

এ ছাড়া, চিত্রকলা ও সাহিত্যের প্রদর্শনীটিও সকলের আগ্রহ জমিয়েছিল। গত পঞ্চাশ বছরে আশ্রমের যাঁরা যে বই লিখেছেন, বা ছবি এঁকেছেন, সে সবের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সকলের চেয়ে বড়ো কাজ—গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'। লাইব্রেরি-ঘরের সংলগ্ন পাঠাগারে থরে থরে সাজানো ছিল অনেকগুলি বই। উৎসবের আনন্দে আশ্রমিক-লেখকদের সাহচর্যের স্পর্শও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে প্রমথ বিশী টেবিলে স্থান জুড়েছিলেন অনেকখানি। 'দেশবিদেশে'র লেখক মুজতবা আলীও গ্রন্থ প্রদর্শনীতে আবির্ভূত হয়ে সকলের আনন্দ ও ঔৎসুক্য বর্ধন করেছিলেন। একখানি নূতন বই ছিল—'কবি-কথা'। এবারকার ৭ই পৌষ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা টুকিটাকি খবরে বইখানি ভর্তি।

শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলা এবং উৎসব যেন একবৃন্তে দুটি ফল। এদের একের রসধারা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে উভয়কে প্রাণবান করে রেখেছে।

প্রাচীন অতিথি-নিবাসের সন্নিকটস্থ একটি গৃহের ছাদে প্রভাতী সুরে সানাই বাজছে, তার করুণ মূর্ছনায় ভোরের আকাশ ভরে উঠেছে। এদিকে ৭ই পৌষের উপাসনার বেদী-প্রাঙ্গণ সপ্তপর্ণীতলা প্রতীক্ষারত জনতার কলকাকলিতে মুখরিত। যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হল। আচার্য

ক্ষিতিমোহন সেন পৌরোহিত্য করলেন। সুরের ঝংকার উঠল, 'জাগো জাগো সকল অমৃতের অধিকারী', 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন', 'আমি কেমন করিয়া জানাব' 'তুমি আমাদের পিতা', 'করো তাঁরি নাম-গান'— ইত্যাদি সংগীত সমবেত জনতাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাদের অন্তর-জগতে টেনে নিল।

উপাসনা শেষ হতেই জনতা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সাধারণত আমোদ-প্রমোদ, হাস্যরসিকতা, খোশগল্প, সাজসজ্জা, অফিস-আদালত, গৃহ-সংসার এই সকলের মধ্যেই লোকেরা আপনার ব্যক্তি-সত্তাকে হারিয়ে ফেলে, অন্তরের গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে কণামাত্র আত্মোপলব্ধি তারই বা সময় কোথায়! আর ঋষি-চরিত্র এর বিপরীতধর্মী। তাঁদের পক্ষে আত্মোপলব্ধিই বিশ্বপ্রেমের উৎস স্বরূপ। কবিগুরুও আপন সাধনার ফল আমাদের দান করে গেছেন, আমরা তাঁর দানের যোগ্য হতে পারব কিনা, সে আমাদের দায়িত্বের ও চেষ্টার বিষয়। মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জীবনের কথা ভাবছিলাম, সহসা একজন আশ্রম-বন্ধুর সম্বোধনে স্বপ্ন ভেঙে গেল। তার হাস্য-পরিহাসের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার মনের সেই সহসালব্ধ সুন্দর ভাবটি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। মনে খানিকটা অনুতাপ জন্মাল, কিন্তু ততক্ষণে মেলার সীমানায় এসে পড়েছি, নানা কলকাকলি কানে প্রবেশ ক'রে মনকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

কখন ভিড়ে মিশে গিয়েছি। দেখতে দেখতে লোকের ধাক্কায় এগিয়ে চলেছি। অনুভব করলাম আমার চারপাশে দেখবার মত অনেক জিনিস রয়েছে। বুঝলাম, শান্তিনিকেতনের মেলার একটি নিজস্ব রূপ আছে। সাধারণ গ্রাম্য মেলার মত এতে নোংরামি নেই, দোকানগুলির মধ্যেও একটা পারিপাট্য আছে। প্রত্যেকটি দোকান আপন সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বকীয় পণ্য-সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, সাড়ম্বর

অথবা নিরাড়ম্বর, শহুরে অথবা গ্রাম্য ধরনের নানা প্রকার দোকান পাশাপাশি রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা নেই, আছে আত্মপ্রকাশের সহজ ভঙ্গি। স্থানমাহাত্ম্যে এই মেলায় অল্পদামের জিনিস ও বেশি দামে বিক্রী হয়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে করলে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। কারণ, একটিমাত্র পয়সাও পকেটে না নিয়ে, কেনাকাটা কিছুমাত্র না করে নির্লিপ্তভাবে মেলায় ঘুরে বেড়াও, তা হলেও উপভোগে কিছুমাত্র কম্‌তি পড়বে না। সে ক্ষেত্রে মন অযথা বস্তুভারে জর্জরিত হয় না, বিষয়বস্তুর কথা, বর্ধিত মূল্যমানের কথা না ভাবলেও চলতে পারে। এখানে আপাতদৃষ্টিতে মূল্যহীন বস্তুও মূল্যগৌরব লাভ করে, যেমন বাঁশের ছড়ি। তার নমুনা ছোটবড় প্রায় সকলের হাতেই শোভা পাচ্ছে। একদল নাগরদোলায় চড়ে ছড়ির সাহায্যে অজস্র সৌখীন রঙ্‌চঙে রুমাল ছোঁড়াছুড়ি ক'রে আনন্দ করছে। দেখে শুনে পার্শ্বস্থিত বন্ধুটি প্রস্তাব করলেন, 'আমাদেরও ছড়ি কিনলে হয়।'

রাস্তার দু'পাশের মিষ্টির দোকানগুলিতে গ্রাম্যলোকদের ভিড় জমছে, একটি নিটোল গড়ন স্বল্পবয়সী গ্রাম্যবালক একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিষ্টিগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, মনের ভাবটি এরূপ—অনুমতি পেলেই হয়, কী পরিমাণ মিষ্টি সে খেতে পারে, তার নমুনা দেখাবে।

আর একদিকে সারি সারি স্টেশনারী দোকান। আয়না, চিরুনি, ছোট্ট চকচকে সেলুলয়েডের ভ্যানিটি ব্যাগ, মস্ত মস্ত বেলুন, চুলের ফিতে, ছেলেভুলানো খেলনা, হাতঘড়ি প্রভৃতি রকমারি জিনিসে দোকানগুলি ঠাসা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উপুড় হয়ে পড়ে পরম আগ্রহে সে সকলের রহস্য-ভেদ করছে। পাথরের বাসন-কোসন, হাঁড়ি-কুঁড়ি, ঝাঁঝরি, দাঁ, বঁটি, খুন্তিরও অভাব নেই। সে দিকটাতে বয়স্কাদের ভিড়। কৃষ্ণনগরের পুতুলের দোকানটি বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছে; সুতো দিয়ে ঝোলানো চিংড়িমাছ ও ফলগুলি, বিশেষত ছোট্ট কাঁঠালটি সকলের চোখে ধাঁধাঁ লাগাচ্ছে।

বোলপুর তাঁতঘর এবং অন্যান্য কুটির-শিল্পের দোকানেও অল্প-বিস্তর ভিড় আছে। নানাবিধ রঙিন কাপড়, থান, দামী শাল, কাজ-করা রুমাল ইত্যাদিতে দোকানগুলি সুসজ্জিত রয়েছে।

শ্রীনিকেতনের শিল্পজাত নানা কারুকার্যশোভিত দ্রব্যসামগ্রীরও অভাব নেই। বয়ন এবং মৃৎশিল্পের প্রদর্শনী, বাতিকের সূক্ষ্ম কাজ, দেশী সিল্কের উপর ডিজাইন-তোলা ব্লাউজ-পীস্, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ নানাবর্ণানুরঞ্জিত গাত্রাবরণ এবং চিত্র-বিচিত্র শয্যাবরণগুলি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করছে।

মেলার একপাশে রয়েছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রদর্শনী। কবি-রচিত গ্রন্থসমূহ, তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণমূলক নানাবিধ মূল্যবান গ্রন্থ, কবির চিত্রলিপি, তাঁহার অনিন্দ্যহস্তাক্ষরশোভিত পাণ্ডুলিপি এই বিভাগটিকে মেলার মধ্যমণি করে রেখেছে।

মেলার ছোটবড় হোটেল রেঁস্তোরাতে বহু লোকের নিত্য আনাগোনা। আহারের চেয়ে একস্থানে জেঁকে বসে গল্প করে সময় কাটাবার সুযোগই তাঁরা বেশি খুঁজছেন। নাগরদোলা সশব্দে পাক খাচ্ছে, হৈ-হৈ কলস্বরে উৎসব জমে উঠছে। দশ বৎসর আগেকার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। নাগরদোলার কী আকর্ষণ-ই না তখন ছিল। আজ দেখলাম নিজেদের ভিতরে সেই উচ্ছ্বসিত ভাব আর নেই। জীবনের পটভূমিকা কত দ্রুত বদ্‌লে যাচ্ছে তা অনুভব করা গেল।

একটু অগ্রসর হলাম। কবিগানের আসর বসেছে। খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম, পদ-কর্তার ছন্দবিহীন কৃত্রিম মিলগুলি কানে বড় লাগছিল; তবে দেখলাম বহুলোক বসে বিশেষ আগ্রহসহকারে শুন্‌ছে। বুঝলাম তারও একটা অর্থ আছে, তাদের মন মজেছে বিষয়বস্তুতে। পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে, উভয়-পক্ষের কথা চালাচালিতে, বাক্যবাণে কবি-গান জমে ওঠে। দোহারও ভাল হওয়া চাই। ঢুলিটিও হওয়া চাই মনোমত। প্রশ্নের উত্তরটি যদি শ্রোতাদের মনঃপুত হয়ে প্রশ্নকর্তাকে যথার্থভাবে বিদ্ধ করতে পারে, জবাবটি যদি ঠিক

পাল্টা জবাব হয় এবং উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করতে পারে, তাহলেই আর কথা নাই, প্রশ্নকর্তা একেবারে তেতে উঠবেন, উত্তরকর্তাকে আবার নূতন করে কিরূপে বিপাকে ফেলবেন মনে মনে তার প্ল্যান আঁটতে ও প্যাঁচ কষতে থাকেন। এভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে দুপক্ষে বিপুল দ্বন্দ্ব বেঁধে ওঠে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে প্রচুর আনন্দ সঞ্চারিত হয়। সে সকল মারপ্যাঁচের রকমারি এবং পদকর্তার বিশেষ ভূমিকা না জানা থাকলে কবিগান সহসা মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

যাত্রাগান অতটা প্যাঁচালো নয়। গায়কগণ যদি সুকণ্ঠ হয়, অভিনয় যদি ভাল হতে থাকে, যুদ্ধ বিগ্রহকে অবলম্বন করে ঘন ঘন অসি আস্ফালন হতে থাকে, তার সঙ্গে বেহালা বাঁশির সংগত যদি একটু জমকালো থাকে তাহলে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়।

শহর থেকে যাঁরা এসেছেন, উচ্চাঙ্গ সংগীতাদির সংগে তাঁদের পরিচয় থাকলেও এ ধরনের গান-বাজনার সম্পর্কে তাঁরা একটি বিশেষ ঔৎসুক্য পোষণ করে থাকেন।

শহুরে গ্রাম্যে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে মেলবার এ একটি উপলক্ষ এখানে মন্দ নয়। মেলার আর একটি আকর্ষণ—আতশবাজি। সকল লোকের পক্ষেই এটি আনন্দদায়ক। এদেশের জনসাধারণ মেলা অথবা দোকানপাট দেখতে অনভ্যস্ত নয়, মেলার জন্য বীরভূমের খ্যাতি আছে; কিন্তু এমন ধারা রঙ-বেরঙের আতশবাজির খেলা এখন তারা কদাচিৎ দেখতে পায়, নিশ্চিত এটি তাদের আনন্দের খোরাক জোগায়।

এই উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব নানারূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। গ্রাম্যলোকেরা সে সকল আনন্দানুষ্ঠানে তত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেয় না, তাদের নেই তেমন শিক্ষা-দীক্ষার জোর; তা না থাকলেও মেলার আনুষঙ্গিক এই সকল গান-বাজনা, খেলা-ধূলা, সাঁওতাল নাচ ও বাউলের গান তারা খুবই উপভোগ করে থাকে।

এখানে শান্তিনিকেতনের আশে-পাশের সাঁওতাল-পল্লীতে অনেক সাঁওতালের বাস। দৈহিক ক্রীড়ানৈপুণ্যে, তীর-ধনুকের খেলায় এরা বিশেষ পারদর্শী। তাদের জন্যও মেলার মধ্যে ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা থাকে। তাহাদের অদ্ভুত ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে দর্শকবৃন্দ প্রচুর আনন্দলাভ করেন। প্রতিবারের মত এবারও তাদের খেলা আনন্দদায়ক হয়েছিল।

এবারকার সাঁওতাল নৃত্যে তেমন একটা জমজমাট-ভাব দেখা গেল না। মাদলের ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করল না। সভ্য-জগতের নৈরাশ্য কি শেষে সাঁওতালদের পল্লীতেও কালোছায়া ফেলল। তাদের আনন্দ আর ভদ্রসমাজে তেমন স্বতস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না।

মেলায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম। আগেকার মতো বাউলের আসরও জমে নি। মেলার বটগাছতলা একেবারে শূন্য খাঁ খাঁ করছে। ৮ই পৌষ রাত্রিতে বাড়ি ফেরবার মুখে দেখলাম, ঝোলাঝুলি নিয়ে কোথা থেকে দুটি বাউল এসে বটগাছতলায় দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। সেখানে শ্রোতার সংখ্যাও কম, গায়কের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। অথচ পূর্বে দেখতাম, 'বাউল গান' শান্তিনিকেতনের মেলার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গায়ক ও শ্রোতার অভাব কখনও হত না, পরস্পর পরস্পরের রসে মজে থাকত।

পুরানো দিনের শান্তিনিকেতন

পুরানো দিনের শান্তিনিকেতন

১৮২৩ শকে মহর্ষির ৮৫তম বৎসর বয়ক্রমকালে ১২ই মাঘের দিন তাঁর জনকয়েক ভক্ত তাঁকে প্রণাম করতে যান। সে-সময় তিনি তাঁদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করে কিছু উপদেশ দান করেন। সে প্রসঙ্গে ভক্তদের মধ্যে শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায়, 'শ্রীমন্মহর্ষিদেবের একটি উপদেশের ভাষা' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেন—

"দেখা যায়, নিত্য নূতনতর আবিষ্কার পুরাতনকে অবজ্ঞা করিয়া নিজেকেও অনাস্থায় নিক্ষেপ করিতেছে। যে নূতন বিজ্ঞান নবীন দর্শন পুরাতনকে মিথ্যা করিয়া পৃথিবীতে আপনার জয়পতাকা প্রোথিত করিল; নূতনতর বিজ্ঞান নূতনতর দর্শন আবার তাহার উন্নত পতাকা পদদলিত করিয়া অবজ্ঞাত পুরাতনকেই গুরু-গৌরবে বরণ করিল, এরূপ ঘটনা মর্ত্য জগতে একান্ত দুর্লভ নহে।...যখনই আমরা দেখিতে পাই দর্শন বিজ্ঞানের শতচ্ছিদ্র সমাচ্ছন্ন করিয়া 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' রূপে তিনি বিরাজমান; তখনি সমস্ত অপ্রতিষ্ঠা ও অব্যবস্থা-দোষের সমাধান হইয়া যায়।"

এ মহর্ষিদেবেরই কথার প্রতিধ্বনি। সুতরাং দেখা যায়, তাঁরাও সেকালে জানতেন 'অব্যবস্থা-দোষ অপরিহার্য'। সেই দোষ থেকে উদ্ধার কামনা করতেন একটি উপায়ে,—সেটি সত্যের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' ভাবে মনকে স্থির করার চেষ্টায়। তিনি বলেছেন, "ইহা বলা হইতেছে না যে, তাঁহার রাজ্যে বিজ্ঞান দর্শনের উপযোগিতা নাই। জ্যোতির্বিদ্যা, জীবতত্ত্ব বা বিশ্ববিজ্ঞান তাঁহারই প্রতি মনুষ্যকে অগ্রসর করিবে,...ইহাই বিদ্যার উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের সার্থকতা, দর্শনের সফলতা এবং তর্কের লক্ষ্য; সেই মহদুদ্দেশ্যবিরহিত বিজ্ঞান অজ্ঞানতা, দর্শন অন্ধতা এবং তর্ক কলহমাত্র। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' পূর্ণ

পরমেশ্বরের অভেদ্য বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসস্তম্ভে জগতের যাবতীয় শিক্ষালতা জড়িত হইয়া উঠিলেই তাহা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, তাহা না হইলে মূল্যহীন নিরাশ্রয় শিক্ষা শূন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

এ হল শান্তিনিকেতনের ভিতরের পরিচয়। বাইরের দু'একটি পুরানো পরিচয়ের কথার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য বিদ্যার্ণব মহাশয়ের লেখা উপরোক্ত রচনাটি থেকে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটুকু। ছাতিমতলায় বেদী-তৈরির সময় মাটি খুঁড়ে 'নরকপাল' প্রাপ্তি, বৃক্ষহীন প্রান্তরে দুটি (সচরাচর এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য) ছাতিমগাছের অবস্থিতি এবং বীরভূম জেলায় বহু তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রের প্রাদুর্ভাব,—এই সকল আলোচনা করে 'শান্তিনিকেতনের কথা'র লেখক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' নামক পুস্তকে এই অনুমান লিপিবদ্ধ করেছেন যে, স্থানটি ছিল তান্ত্রিক সাধকদের একটি কেন্দ্র। বীরভূমে বহু তান্ত্রিক কেন্দ্র রয়েছে। প্রবাদ, 'বোলপুর' নামের উৎপত্তি হয়েছে 'বলিপুর' থেকে। তা ছাড়া 'কালিকাপুর' 'কংকালীতলা' ইত্যাদি নাম তাৎপর্যপূর্ণ। আশে পাশে অনেক পীঠস্থানও আছে। এই সমস্তই জ্ঞানবাবুর অভিমতের পোষকতা করে। এমন কি, শোনা যাচ্ছে, নিকটবর্তী স্টেশন 'গুস্‌করা'র এক তান্ত্রিক সাধকের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের তখন পরিচয় ছিল। এ সব থেকে শান্তিনিকেতনের মূলে তান্ত্রিকসূত্রের অনুমানকে মূল্য না দিয়ে পারা যায় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা মহর্ষির জীবিতকালের তাঁরি প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত অন্য ধরনের একটি উক্তিকেও এখানে উদ্ধৃত করছি। এটিও পুরোনো কালের ঐতিহাসিক সূত্র। তাই সত্য নির্ণয়ের পক্ষে এরও মূল্য রয়েছে। বিদ্যার্ণব মহাশয় লিখছেন—

"এই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' বিশ্বভুবনপতি এবং তাঁহার প্রশান্ত মঙ্গল ভাবকে দিগ্‌দিগন্তে স্বদেশে বিদেশে নগরে অরণ্যে সজনে নির্জনে সংকটে সম্পদে অন্তরে বাহিরে বহুকালের সাধনায় নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুণ্যকীর্তি প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমন্মহর্ষিদেব যখন বঙ্গীয় বীরভূমির অন্তর্গত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের

নিস্তব্ধতায় সপ্তচ্ছদ-তরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া অস্তগমনোন্মুখ সান্ধ্য-সূর্যের রক্তিম কিরণচ্ছটায় সর্বাশ্রয় ত্রিভুনপতির অনন্ত মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া শান্তিসাগরে মগ্ন হইয়া পড়িলেন, তখন শুনিতে পাইলেন, এই প্রান্তরের নির্জনতায় অসহায় নিরাশ্রয় পথিকগণ অনেক সময় দস্যুহস্তে ধনরত্ন এবং প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিয়া থাকে এবং সেই নিহত পান্থগণের মস্তক এই সপ্তপর্ণ পাদপের মূলদেশেই প্রোথিত হয়। একদিকে প্রকৃতিরম্য নির্জন প্রান্তরের নিস্তব্ধতার আকর্ষণ আর এক দিকে সেই নৃশংস দস্যুগণের নিষ্ঠুর বৃত্তি দমনের আগ্রহ তাঁহাকে এখানে আশ্রম নির্মাণে একান্ত উৎসুক করিয়া তুলিল। তিনি অবিলম্বে সেই সপ্তচ্ছদ তরুর মূলদেশে এক উপাসনা বেদী প্রস্তত করিতে আদেশ দিলেন ; সেই স্থান খনন করিতে সত্য সত্যই অনেক নরকপাল বাহির হইয়া পড়িল। যখন দস্যুগণের নিষ্ঠুর নরহত্যার ক্ষেত্র সর্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা বেদীকায় পরিণত হইল ; যখন দিগন্তব্যাপ্ত প্রান্তরের নিস্তব্ধতা চিরকৃত দস্যু-পোষণের নরকলীলা পরিহার পূর্বক মহর্ষিদেবকে করুণাময় পরমপিতার অনন্ত শান্তি সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিল ; তখন সেই প্রস্তরবেদীর সম্মুখভাগে শ্বেত মর্মরনির্মিত দুটি পরিপাটি স্তম্ভের অগ্রভাগে বিন্যস্ত শ্বেত প্রস্তরে গভীরভাবে খোদিত হইল—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'।"

এই উক্তি থেকে মনে হয়, স্থানটিতে ডাকাতি রাহাজানির ঘটনাই ছিল প্রসিদ্ধ। 'তত্ত্ববোধিনীতে'ই ইতিপূর্বে ১৮১৩ শকের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মঠপ্রতিষ্ঠা' নামক রচনায় লেখা আছে 'সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলদেশ খনন করিতে গিয়া অসংখ্য নরকংকাল প্রাপ্তি'র কথা। সেস্থলে 'নরকপালে'র উল্লেখ নেই। গোটা 'কংকালে'র কথাই আছে।

বেদীর স্থানটিও বৃক্ষবহুল ছিল। সেখানে ডাকাতি করে পালাবার সুযোগ ছিল না এমন নয়। তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়, 'শান্তিনিকেতনে সপ্তম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব' রচনায় (মাঘ ১৮১৯ শক) চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণের একস্থলে রয়েছে—

"বহুকাল ধরিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনা-ক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনে থাকিয়া বিশাল প্রান্তরের সহিত হৃদয়ের তার মিলাইতেন। তাই সপ্তচ্ছদতলস্থ ঐ প্রস্তর বেদী উদ্যানকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রান্তরের কূলে সংস্থাপিত। পরিপুষ্ট বৃক্ষরাজিসমন্বিত এই উদ্যানের পশ্চিমোত্তরে বৃক্ষের এত অল্পতা কেন, তাহার কি সন্ধান রাখিয়াছ? মহর্ষি চিরকালই 'সূর্যের অস্তমিত মহিমা' সন্দর্শনের পক্ষপাতী। যখন এই অংশের তরুলতা বিবর্ধিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিল। তিনি তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ করিলেন।" (পৃ ১৪৯-৫০)

ছাতিমতলার দক্ষিণ পার্শ্ব জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল এবং সেখানকার শাল গাছ ইত্যাদির আশেপাশেও মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে—'তত্ত্ববোধিনী'তে সংকলিত আরেকটি ইংরেজি লেখায়ও একথা জানা যায়।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা সম্বন্ধে শিবধন বিদ্যার্ণব ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় যা লিখেছেন সে-সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—

"মহর্ষিদেবই আগে এসেছিলেন; তিনি নরমুণ্ডাস্থি ভিন্ন আর কিছুর কথা কাউকে বলেছিলেন বলে একেবারেই জানা যায় না। এঁরা অন্যের কাছ থেকে শোনা কথাই লিখেছেন, মহর্ষিদেবের তখন এরূপ কেন, কোনো প্রকার আলোচনাই করবার শক্তি ছিল না। সম্ভবত শিবধন বিদ্যার্ণব 'নরকপাল' লিখতে নরকংকাল লিখে থাকবেন। এই অনুমান যে ঠিক তা আরো এই কারণে মনে হয় যে, ইনি নরকপালের কথা এখানে বলেনই নাই, কিন্তু আর-একটি লেখায় নরকংকালের কথা বলেন নাই, কেবল নরকপালের কথাই বলেছেন। নরকংকাল কেবল এঁর এই লেখাতেই উল্লিখিত আছে, আর মহর্ষিদেব হতে আরম্ভ করে অনেকে নরকপালই দেখেছেন। বিদ্যালয় হওয়ার পরেও খুঁড়তে খুঁড়তে ওখানে নরকপাল পাওয়া গেছে, দেহের অন্য কোনো অংশের অস্থি নয়। এখানে 'অসংখ্য নরকংকাল' কোনোদিন প্রোথিত হলে তার সকল চিহ্ন দূর হত না, এখনো তার দু'চার খণ্ড পাওয়া যেতে পারত। আর তিনি

মহর্ষিদেবের কাছে শুনে থাকলে সে-কথা জোর কলমেই লিখতেন। মহর্ষিদেব সে-সময় কেবল মাঝে মাঝে পরমেশ্বর ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই দু'চারটি বলতেন।

"শান্তিনিকেতনে ২০ বিঘা জমির সীমানার বাইরে এক দক্ষিণ দিকের ছোটো একটি শালবন ভিন্ন অন্য তিনদিকে কেউ গাছ দেখে নাই। এখানকার ডাঙা যাঁরা ২৫।৩০ বছর আগেও দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে, সেখানে ঘাস ও বন-খেজুরের ঝোপই ছিল, আর কোনো গাছ ছিল না। সেই 'ব্রহ্মডাঙা'য় আর কিছু জন্মাতো না। এমন কি, কাছাকাছি তাল কি খেজুর গাছও ছিল না। দূরে নীচু জমিতে এবং বাঁধের ও রেল লাইনের তোলা মাটিতেই কেবল তালগাছ দেখা দিয়েছিল।

"বলে এলাম দক্ষিণদিকের শালবনটি ছিল ক্ষুদ্র। বস্তুত ঐদিকে আশ্রম-সীমার নিকটেই একটি খোয়াই ছিল, তারপরেই নীচু বাংলা। সুতরাং শালবনটি বড় হতেই পারে না। এই খোয়াই ভরাট করার পর চীনাভবনের কিয়দংশ ও হিন্দিভবন তার উপর নিমিত হয়েছে ব'লে মনে হয়। এই সেদিনও বাঁধের দীঘি কাটার সময় মাটি এনে এই স্থানের অনেক গভীর অংশ ভরাট করা হয়েছে। আমরা যখন পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নীচু বাংলোয় দেখা করতে যেতাম, আমাদিগকে বেশ একটু খোয়াই ভাঙতে হত।

"আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম সীমারেখা ছাতিমতলার নিকটেই। মহর্ষিদেব এই অনুর্বর স্থানে বহুব্যয়ে বাগান করিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' পুস্তকে উদ্ধৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত অঘোরনাথ-লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য। সেই সময় ছাতিমতলা ও সীমারেখার মধ্যবর্তী ক'এক হাত মাত্র জমিতে অতিরিক্ত গাছ জন্মে থাকলে মহর্ষিদেব পশ্চিম দিগন্তের দৃশ্য অবারিত রাখার জন্যে নিশ্চয়ই তা কাটিয়েছিলেন, কারণ সান্ধ্যকালে ছাতিমতলায় বেদীতে বসে পশ্চিমদিগন্তে সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা দেখে উপাসনা করাই ছিল তাঁর আশ্রম জীবনের দৈনন্দিন বিশেষ আকর্ষণ।"

সে যা হোক, দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কার্যব্যবস্থা এ স্থানটিকে নির্বিঘ্ন করে; শুধু তা-ই নয়, বেদী, উদ্যান, মন্দির, অতিথিশালা ও উৎসবাদির সমাবেশে এককালের হত্যা-বিভীষিকাময় শ্মশানভূমি-সদৃশ স্থানটি প্রকৃতপক্ষেই মনোরম শান্তিনিকেতনে পরিবর্তিত হয়।

বেদী উপলক্ষে মহর্ষির একটি বাসনা দ্বারা তাঁর উদারতার বলিষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পায়। 'তত্ত্ববোধিনী'তে উদ্ধৃত 'Unity and the Ministers' পত্রের তীর্থযাত্রীর বিবরণীতে লেখা আছে—

"The Maharshi, we were told, had several times expressed his desire that others should also sit on the Vedi as he had done, but everybody who visited the spot, naturally felt it impudence and effrontery for him to occupy it."

মহর্ষি নিজে যে এ-বেদীতে বসেছিলেন—এ কথারও সমর্থন এসঙ্গে মিলছে।

১৯০১ সনের ১৩ অক্টোবরের 'Unity and the Minister' নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'Pilgrimage to Shantiniketan of Bolpur' শীর্ষক রচনায় শান্তিনিকেতনের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনাস্থলে যা লিখিত হয়েছে, ১৮২৩ শকের ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে দু'একটি কথা জানবার মতো। বিবরণদাতা খোঁজ নিয়েই তা জেনেছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতিবাদ-শূন্য উদ্ধৃতি দ্বারা তার সমর্থনই অনেকটা বুঝায়। বিবরণে আছে,—মহর্ষিদেব কলকাতার হট্টগোল ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে তাঁবু ফেলে শান্তিনিকেতনের ডাঙায় নির্জনবাসে কাটাতেন। ঐ ছাতিম গাছ দু'টির তলা ছিল তাঁর ভগবৎ-আরাধনার বিশেষ স্থল। ক্রমে জমি কেনা হল, গাছ-গাছড়া পোঁতা হয়ে একটি বাগান তৈরি হল। একজন মালীও এল এর পরিচর্যায়। মালীর একটু পরিচয় আছে। শান্তিনিকেতনের পত্তন যে মালীর হাত দিয়ে হয়, সে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের পরিচারক; তার নাম রামদাস। রাজা রামমোহন তাকে সঙ্গে করে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রভুর মৃত্যু হলে সে দেশে ফিরে আসে এবং বর্ধমানের মহারাজার 'গোলাপ-বাগে'র কাজে নিযুক্ত হয়। মহর্ষি তাকেই নিয়ে এসে লাগান শান্তিনিকেতনের বাগান তৈরিতে। 'Unity and the Minister'-এর ভাষায়—

"It is a note-worthy fact that the gardener, by name Ramdas, who laid the Shantiniketan garden had at first been in the employment of Raja Ram Mohon Roy who took him to England, and after the death of the master, he returned to India and was engaged by the Burdwan Maharaja to his famous Golapbag Garden. The Maharshi, whose taste in these matter is princely, had engaged this man for doing good work."

'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে—

"রামমোহন রায়ের সহিত রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায় নামক তাঁহার দুইজন হিন্দু ভৃত্যও ব্রিস্টলে আসিয়াছিলেন।"

এই 'রামহরি দাস'কেই 'Unity and the Minister'-এর বিবরণদাতা 'রামদাস' নামে উল্লেখ করেছেন সন্দেহ নেই। ছাতিমতলার বেদীতে মহর্ষি বসেছিলেন কিনা, এই নিয়েও বিবরণদাতার লেখা থেকে জানা যায়—

'Much has been done by art to give a sacred aspect to the spot, but underneath the old weather-beaten historic tree, on which is inscribed in Bengali the words, 'Sing the song of his name.' ['কর তাঁর নাম গান'] is a white marble Vedi or small elevated seat on which the Maharshi used to sit and hold communion with God.'

১৮১২ শকের (বাং ১২৯৭ সাল) ২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় শান্তিনিকেতন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি তাম্রফলক ভিত্তিগর্ভে প্রোথিত করেন। তাতে খোদাই করা ছিল—

"ওঁ তৎসৎ। ঠাকুরবংশাবতংসেন পরিমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার্পিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সংবৎ, ৪৯৯১ কল্যাব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।"

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ হয় মন্দির-প্রতিষ্ঠা। ভোজ্য ও বস্ত্রাদি-বিতরণের পর উৎসবের শেষে বাজি পোড়ানো হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম সাংবৎসরিক উৎসবে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান অভিনীত হয়েছিল। বাং ১৩০৮ সালের বাৎসরিক উৎসবে ৬টি ছাত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করেন—

(১) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, (৪) প্রেমকুমার গুপ্ত, (৫) অশোককুমার গুপ্ত ও (৬) সুধীরচন্দ্র নান।

এরপর ৫ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে দীক্ষাপর্ব ঘটেছিল, তাতে এঁদের মধ্যের ৩ জন মাত্র ছিলেন।

বিদ্যালয়-স্থাপনার পরিকল্পনা মহর্ষির ট্রস্টডীডেও উল্লিখিত ছিল—

"আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টিগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সংকার"…ইত্যাদি।

কিন্তু সূচনার পূর্বেও সূচনা আছে। মহর্ষির এক পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, বলেন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে তাতে বাধা পড়ে। ভারতব্যাপী একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে যোগাযোগ-স্থাপনই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য শেষে শিক্ষা-প্রচারের একটি কেন্দ্র-স্থাপনেরই তিনি বিশেষ প্রয়োজন বোধ ক'রে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে যোগাযোগ-স্থাপনের জন্য একখানি আবেদন মহর্ষির নিকট পূর্বেই এসেছিল। ১৮০২ সনের চৈত্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে সেখানি মুদ্রিত হয়। M. G. Ranade ও Atmaram Pandurang নাম ব্যক্তিদ্বয় হচ্ছেন আবেদক। পত্রের শেষে লেখা রয়েছে—

"May the spirit of God bless the movement, of which you are such a gifted leader, and may all Theists in India, Europe and America, be gladdened with the welcome tidings of a United Theistic Church in India."

বিদ্যালয়-স্থাপনের পর থেকে কোনো সময়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি স্থির হয় বুধবার। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার নির্দিষ্ট দিন 'বুধবার' অনুসারে আশ্রমেও উপাসনার দিনের সংগতি রেখে একই ব্যবস্থা চলে। সেইজন্য এই সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা অন্য কোনো বারে না ফেলে 'বুধবারে'ই ফেলা হয়—এইরূপই কেউ-কেউ মনে করেন। এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ধারণা থাকতে পারে। আশ্রম সম্পর্কে প্রাচীন কোনো বিশেষ উপলক্ষের বারই বুধবার নয়।

মহর্ষির আত্মজীবনীর আধুনিক সংস্করণের পরিশিষ্টে এবিষয়ে ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা রয়েছে। সেখানেই লেখা আছে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবসটি হচ্ছে বুধবার, ৬ই ভাদ্র, অগস্ট, ১৮২৮ সাল। এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক ; কারণ, বুধবারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই বারটির প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজের অনুরাগ সহজেই বোধগম্য। এখানে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আরো কয়েকটি বারের কথা জেনে রাখা ভালো—১২৫০, ৭ই পৌষে মহর্ষিদেব অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেটি হল বৃহস্পতিবার।

আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের দিনটি রবিবার (১২৯৭, ২২ অগ্রহায়ণ)।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় সোমবার (১২৯৮, ৭ই পৌষ)। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন রবিবারে (১৩০৮, ৭ই পৌষ) 'বিশ্বভারতী'র উদ্বোধন হয় সোমবারে (১৩২৫, ৮ই পৌষ)।

১৩০৮ সালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দীক্ষার পূর্বে, ১৩০২ সালে শান্তি-নিকেতনে একটি বালকের চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ আছে 'তত্ত্ববোধিনী'তে। ১২ ফাল্গুন এ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সংস্কারপ্রাপ্ত বালকের

নাম সুরেশচন্দ্র সমাদ্দার (দেববর্মণ), ঢাকা-বিক্রমপুর নিবাসী গুরুচরণ সমাদ্দার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; বয়স ছিল তখন এগারো। তখনকার আশ্রমাধ্যক্ষ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ঘটনাটির বিবরণদাতা।

বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়ে বিদ্যালয় একবার অনেকটা এগিয়েছে। এখানকার গ্রন্থাগার বিপুল ; বহু বিষয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থায় এরূপ নানা বিভাগে এ স্থান হয়েছে সমৃদ্ধ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়ে বিশ্বভারতী এবার নব জীবন লাভ করল সে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে ; তার অর্থাভাব অনেকটা দূর হয়েছে। নূতন নূতন কর্মী আসছেন ; বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নব নব যোগ ঘটছে ; তাতে নানাবিধ আত্মীয়তার সৃষ্টি করছে ; বহু নূতন পরিকল্পনা আলোচিত হচ্ছে। বিচিত্র সম্ভাবনায় সকলের চিত্ত আজ ভরপুর।

আমাদের গন্তব্য স্থান কোন্ পথে—কোথায়, আমাদের সার্থকতা কোন্ গৌরবোজ্জ্বল পরিণতিতে, তা সূচিত রয়েছে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এ। মানব তার জীবনের পরম সাধনার দ্বারা সেই লক্ষ্যে আরোহণ করবে। এই সাধনার স্তর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধের (সবুজপত্র, ১৩২৪, আশ্বিন-কার্তিক) একস্থলে বলেছেন—

"ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রস-ভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখনকার তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনাসংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে উঠা। সেখানে যে-আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক

চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে।"

সকল রকম জ্ঞান, কর্ম, লোক-সংহতি সব-কিছুর সার্থকতা যে এই অমৃতের অধিকার-লাভে, অন্য সব কথার আগে সে সার-কথাটি আমাদের বিশেষরূপেই স্মরণীয়।

বিদ্যালয় চলছে। আয়োজন তখনো সামান্য। অনাড়ম্বর জীবন। ছাত্র, শিক্ষক যে ক'জন আছেন সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এজন্যই ঘনিষ্ঠতা তাঁদের প্রগাঢ়। নানা কাজে তাঁদের উৎসাহ। ১৩১৮—১৩১৯ সনের আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে আশ্রমাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়ের লেখা একটু বিবরণ এখানে তুলে দেওয়া গেল—"বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একত্র বাস, একত্র আহার এবং একত্র পাঠ ও ক্রীড়া অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে যেমন ভক্তি ও স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছে ছাত্রদের পরস্পরের হৃদয়ও সেই প্রকার এক অপূর্ব বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। আশ্রম বালকগণ পরস্পরকে সহোদরের ন্যায়ই দেখে। সুহৃদ্‌কুমারের মৃত্যুর পর সমস্ত আশ্রম-বালকদিগকে যে প্রকার বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, তাহা কেবল পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। বহুকাল হইল আশ্রম-বালক যোগরঞ্জন গুহঠাকুরতা এবং সরোজরঞ্জন মজুমদারের মৃত্যু হইয়াছে। এই আশ্রমেই তাহাদের মৃত্যু হয়। আশ্রম ভ্রাতৃগণ এই দুই লোকান্তরিত বালকের স্মৃতি রক্ষার জন্য আশ্রমের অদূরে শ্মশান ক্ষেত্রে প্রত্যেকের উদ্দেশে যে দুইটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের বন্ধুতা যে কত দৃঢ় অনুমান করা যায়। অপরাহ্নের অধ্যয়ন শেষ করিয়া খেলাধুলা ফেলিয়া তাহারা সেই শ্মশান ক্ষেত্রে ছুটিয়াছে, নিজেরা চুন সুরকি প্রস্তুত করিয়া নিজেদের হাতে ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভ দু'টিকে গড়িয়াছে। কত দিন দেখিয়াছি, দিবসের কঠোর শ্রমের পর তাহারা জ্যোৎস্না রাত্রিতে সেই স্তম্ভদ্বয় গাঁথিতেছে।··· প্রতি বৎসরেই পরলোকগত আশ্রম-ভ্রাতৃগণের শ্রাদ্ধবাসরে বালকগণ যে হবিষ্যান্ন আহার করে এবং দীন দরিদ্রগণকে ভোজন

করায়, তাহা হইতেও আশ্রমবাসীদিগের পরস্পরের হৃদয়ের যোগ বুঝিতে পারা যায়।'

* * * *

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮৩৪ শকের মাঘ সংখ্যায় এই কার্যবিবরণী মুদ্রিত রয়েছে। তা পাঠ করলে তখনকার আশ্রমের নানাদিকের একটি পরিপূর্ণ জীবনকে অনুভব করা যায়। কত দিগ্‌দেশ থেকে ছাত্রেরা আসছে, কী তাদের ব্যয়, কী শিক্ষাপদ্ধতি, ক'জন শিক্ষক, কী তাঁদের অধ্যাপনার বিষয়, পুস্তকাগার ও ল্যাবরেটরি, পূর্তবিভাগ, বনভোজন ও ভ্রমণ, আশ্রমের রুগ্নাবাস, গোষ্ঠ, সেবাভাণ্ডার, সংগীত শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা, ধর্ম ও নীতিশিক্ষা, বিশিষ্ট অতিথি, অভিভাবকগণের সঙ্গে যোগ রক্ষা ইত্যাদি নানাবিষয়ে বহু তথ্যের সমাবেশে তা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণক্ষেত্রে একটি বছরের কথা উল্লিখিত হল। এরূপ বছর-বছর শান্তিনিকেতনের আদর্শ বহুমুখী কর্মের মধ্যে বিপুল বিচিত্র রূপ লাভ ক'রেই তখন থেকে চলে আসছে। বহুল তার বিস্তার যেমন ঘটেছে, বহুদিককার সাহায্যও তাকে ফলবতী হতে সুযোগ দান করেছে, সে-কথা সুবিদিত, কিন্তু অতীত দিনে স্বল্প আয়োজনের স্বল্প বিস্তারের জীবনে প্রধান সম্বল ছিল কবির চেষ্টা, আর ছিল নানা ক্ষয়-ক্ষতি বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও কর্মিগণের আশ্রমপ্রীতি ও সম্মিলিত একটি আদর্শ-জীবন-যাত্রার অদম্য উৎসাহ। সে-যুগের এমনি একজন আদর্শনিষ্ঠ ছাত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে সে সব কথা আমরা জানতে পারি। তখনকার ছাত্র এবং পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকশ্রেণীভুক্ত শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে শিষ্য গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যেখানে সত্য সেখানে এই নিয়মটি সুন্দর।

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তোমরা সেই গুরুরূপেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছ অর্থাৎ ইহা তোমাদের পক্ষে ইস্কুল নহে—ইহার সহিত তোমাদের হৃদয়ের কল্যাণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এইজন্য ইহার সহিত তোমাদের দান প্রতিদানের সম্বন্ধ সত্য।

তোমরা জান আশ্রমের বিদ্যালয় বাহির হইতে প্রায় কোনো সাহায্য পায় নাই অন্তত বাংলা দেশ হইতে। সে জন্য ইহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা এখনও ঘোচে নাই। আমি চাঁদার উপর ভরসা রাখি না—যদি এমন দিন আসে যখন আশ্রমের ছাত্ররাই ইহার অভাব মোচনের ভার গ্রহণ করে তবে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য ভাবিতে হইবে না। এইরূপ ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা, সুতরাং ইহাই সুন্দর ও কল্যাণময়।

এইজন্যই তোমার চিঠিতে যখন জানিলাম বিদ্যালয়ের কোনো অভাব মোচনের জন্য তুমি নিয়মিত ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমি মনে বড়ই আনন্দ এবং উৎসাহ বোধ করিলাম। কারণ তোমার এই দৃষ্টান্ত অন্যকে বল দিবে এবং তোমাদের পথও সহজ করিয়া তুলিবে।

বর্তমানে আমাদের একটি অভাব গুরুতর। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ছাত্রের জন্য একটি পৃথক্‌কৃত হাসপাতাল নিতান্তই আবশ্যক। এ ঘর আগাগোড়া পাকা না করিলে রীতিমত ইহা ধোওয়ামাজা সম্ভব নহে—ইহার ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র কূপ, রান্না ঘর ও শুশ্রূষাকারীদের ঘর দরকার। এই হাসপাতাল মাঝারি-রকম করিতে হইলে পাঁচ হাজার টাকা ও ছোট-রকম করিতে হইলে তিন হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে। এই টাকা সংগ্রহ করিবার ভার যদি তুমি গ্রহণ কর তবে আমাদেব উপকার হইবে সন্দেহ নাই। ইতি—২৯শে আষাঢ়, ১৩২৬।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ বাইরে থেকে বিশ্বভারতীর যত আনুকূল্যই আসুক না কেন, তার ভিতরের ভিত্তি সেদিন কবির দৃষ্টিতে ছিল, তাঁর ছাত্রদেরই আদর্শনিষ্ঠা ও আশ্রমপ্রীতির উপর। দেখা যাচ্ছে তিনি স্পষ্টই বলে গেছেন—"আমি চাঁদার উপর ভরসা রাখি না—যদি এমন দিন আসে যখন আশ্রমের ছাত্ররাই ইহার অভাব-মোচনের ভার গ্রহণ করে তবে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য ভাবিতে হইবে না। এইরূপ ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা, সুতরাং ইহাই সুন্দর ও কল্যাণময়।" এ কথারও পূর্বেকার দিনের আরেক মহাপুরুষের আরেকটি গোড়াকার বাণী এখানে স্মরণ হচ্ছে। তিনি কোনো কিছুর উপরেই ভরসা না রেখে এবং মূলেই কোনো ভাবনা না করে, বরং অন্যান্য উদ্বিগ্ন ব্যক্তিদের ভরসা দিয়ে নিশ্চিন্ত করবার জন্যই একদিন বলেছিলেন—"তোমরা কিছু ভেবো না, ওখানকার জন্য কোনো ভয় নাই,—আমি ওখানে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্‌কে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও একস্থলে এরূপ একটি উক্তির কথা বিবৃত আছে।

এবারে আগেকার আশ্রমের ছবি এখানে কিছুটা আঁকবার চেষ্টা করব যা নিজেও দেখেছি। তখন শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' স্থাপিত হয়েছে। প্রায় পঁচিশ বছর হল, তখনো সকাল সন্ধ্যে দু'বেলাই উপাসনা হত। ৭ই পৌষের উৎসবেও সকাল সন্ধ্যা দু'বার মন্দিরে উপাসনার রীতি ছিল। দৈনিক উপাসনা বন্ধ হয়নি কোনোদিন। ছাত্রেরা রোজ প্রাতে আসন নিয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণের গাছতলাতে বসত। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে একত্র দাঁড়িয়ে করত মন্ত্রপাঠ। পঁচিশ বছরের আগে সে মন্ত্র দু'বেলায় ছিল দু'টি। সকালবেলায় প্রথম থেকেই মন্ত্র ছিল 'পিতা নোহসি', এক সময়ে চিন্তামণি শাস্ত্রী প্রবর্তন করেন 'নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়' মন্ত্রটি ; পরে অবশ্য 'পিতা নোহসি'-ই চলছে। আর বিকেল বেলায় মন্ত্র ছিল 'যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্‌সু'। বিকেলে এখন সে-মন্ত্রই চলছে, কিন্তু সকালের উপাসনাটি আর হয় না। আগে এখনকার মতো সকালের সমবেত বৈতালিক

অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না; বৈতালিক গান হত প্রতিদিন রাত্রে, একদিন ছেলের দল আর একদিন মেয়েরা,—শালবীথির তলা দিয়ে পায়চারি ক'রে ক'রে সকলের শোবার আগে সে-গান করত। জ্ঞানবাবু বলেন, "পূর্বে সন্ধ্যায় কোনো সমবেত উপাসনা হত না। 'যো দেবোঽগ্নৌ' মন্ত্র প্রচলন কে করেন জানা যায় না। 'পিতা নোঽসি' মন্ত্রই এখানকার মন্ত্র, প্রথম থেকেই। গুরুদেব এখানে বরাবর 'পিতা নোঽসি' মন্ত্র দিয়ে উপাসনা আরম্ভ ক'রে উপদেশ শেষ করতেন 'যো একোঽবর্ণো' মন্ত্র দিয়ে।"

* * * *

আশ্রমে ফুটবল খেলার খুব ধুম ছিল। সাঁওতালপাড়া ও ভুবনডাঙার নৈশবিদ্যালয়ে ছাত্ররা পড়াতে যেত; বুধবারে-বুধবারে আশ্রম পরিষ্করণের পালা ছিল। খাওয়ার ঘরে মেঝেতে লাইন করে সবাই গিয়ে বসত কুশাসনে, সঙ্গে নিয়ে যেত নিজ নিজ থালা-বাটি,—খাওয়ার পরে সে সব নিজেরাই ধুয়ে নিত এবং সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে আসত। গান-বাজনা যা হত, তার সঙ্গে সংগতের বাহুল্য ছিল না; অনেক সময় খালি গলাতেই গানের রেওয়াজ ছিল। খুব সকালে ছেলেরা স্নান করত,—জলের কল ছিল না, কুয়ো ছিল। বড় কুয়ো থেকে বলদে টেনে তুলত জলের মশক; ব্যায়াম ও খেলাধূলা সেরে সকাল-সন্ধ্যায় হৈ-হল্লা করে ছেলেদের সেখানে স্নানের এক উৎসব জমত। দুর্ভিক্ষে, বানে প্রায় প্রতি বছরই আগে এ-অঞ্চলে বা বাইরেও নানাস্থানে দারুণ অভাব দেখা দিত। বিদ্যালয়ের ছেলেদের নিয়ে কর্মীরা গান ক'রে ক'রে কোনো-কোনো বার বোলপুর শহরে গিয়ে চাঁদা ও চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনতেন। এজন্য একবারের বাঁধা একটি গান মনে পড়ে: 'কাঁসাই নদীর বন্যাজলে মেদিনীপুর যাচ্ছে তল'। গ্রীষ্মে, চারপাশের গ্রামে অগ্নিকাণ্ডও ছিল একরূপ বাঁধা-ই। পাঁচটা-পাঁচটা ঘণ্টা পড়লেই ছেলেরা দৌড়ে যেত দল বেঁধে। প্রতিবেশীর আপদে বিপদে তারা সত্যি প্রতিবেশীরই কাজ করত। এখনও সে সব উৎসাহ আছে। উপলক্ষগুলি কিছু কমেছে মনে হয়। বিশ্বভারতীর তখন

নূতন পত্তন হয়েছে। সেই বিভাগে ছাত্র ছিল কম, অবাঙালীই বেশি ছিল। একটি বাঙালী ছাত্র সেবার আশ্রম থেকে বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন; খুব সম্ভব নাম ছিল 'গণেশ', অরেকজনের নাম ছিল 'কুমুদ'।—এঁদের সঙ্গে অল্প কিছুদিন মাত্র আলাপের সুযোগ হয়। এঁদের দেখে এঁদের মধুর ব্যবহারে লেখক এখানকার জীবন-আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে আরো অনেক ছাত্র, কর্মী ও আশ্রমবাসীর সঙ্গে নানাসূত্রে নানা যোগাযোগ ঘটেছে। তাঁদের সকলের স্মৃতি মধুর হয়ে মনে জাগছে; নূতন আরো অনেকে আসবেন যাঁদের সঙ্গ এবং বিচিত্র ভাবের লেনদেনে আশা করি ভবিষ্যতেও জীবন এমনি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ

সূর্যের একটি প্রদক্ষিণ-কক্ষ আছে ; সে পুব-সাগরে স্বর্ণ-সঞ্চয় করে পশ্চিম-সাগরকে উপহার দেয় ; পশ্চিম-সাগরের স্তব্ধতা নিয়ে উদয় হয় পুব-সাগরে। ঘুরে চলে বর্ষ মাস দিন ; নিত্য-নূতন রূপে রসে তার সঞ্চলন। আমাদের এই যে তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনের সঞ্চলন, এর দুটি রূপ আছে ; একটি বাইরের, একটি তার কেন্দ্রের। প্রতিদিনের প্রভাত আসে, আলোর হাসি উছলে পড়ে, পাখির গানের উৎস খুলে যায়, বিকীর্ণ হতে থাকে মানুষের চলাফেরা, কাজকর্ম নানা ধারায়। এটা তার বাইরের প্রতিদিনের রূপ ; তার সৌন্দর্য তার বেদনা আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য,—তাকে প্রতিদিন বহন করে চলি। কিন্তু বর্ষশেষে এই যে একটি প্রভাত বিশেষ হয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, তাকে আমরা বলি নববর্ষ, আমাদের বছরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে সে। স্নানের শেষে যেমন সবার অন্তর জুড়ে বিরাজ করে একটি মনোরম পবিত্রতা, তেমনি সমস্ত বছরের ধূলিধূসর আবরণকে ধুয়ে নিয়ে এ দিনটির মঙ্গল আবির্ভাব।

ভারতের নববর্ষের বাণী হয়েছে শক্তি-সঞ্চয়ের বাণী, মানুষের প্রেমে মানুষের একতায় দুর্জয়কে জয় করবার উদ্যমের বাণী, জীবনকে জয়-টীকা পরাবার বাণী। মানুষকে এই দুর্জয় শক্তির মন্ত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— "মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম ক'রে আপন অধিকার লাভ করে—আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ ক'রে তবে তার অভ্যুদয়।

"বিশ্ব-বিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে-তেজের মুকুট পরিয়েছেন, দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন, তিনি তাকে

সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধন করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হবে—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।”

নির্মল অরুণালোকে আশ্রমে এই মন্ত্রদীক্ষা দিতে ব'সে তিনি তাই বলেছেন—

“সেইজন্যই আমি বলছি, এই প্রত্যুষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুগন্ধি শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়—যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ, যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি স্তব পাঠ করে নামগান করে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে আমরা যথার্থরূপ নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।”

প্রকৃতির নববর্ষের সঙ্গে মানুষের নববর্ষের পার্থক্যের রূপটি দেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন—

“এই যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যুষটি আজ আকাশ-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল—কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না;—আকাশ ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল;—কুঁড়ি যেমন করে ফোটে, আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল—তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না।...তার অন্ধকার রাত্রি এত সহজে প্রভাত হয় না।...

“সেইজন্য বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, একদিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না, এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো বিশেষ দিন নেই—সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না—তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়—বিশ্বের চির নবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি

করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।"

তাঁর এই নববর্ষের মন্ত্র চিরকাল সুখে দুঃখে সংঘাতে বিপর্যয়ে জীবনে জীবনে নন্দিত হবে। যখনই আমাদের বাস্তব জীবনে অশান্তি অন্যায় প্রবল হয়ে ওঠে, যখনই আমরা প্রপীড়িত হতে থাকি, তখনই মনে পড়ে তাঁর কথা,—নানাভাবে এ যা বলে গেছেন তিনি। নিশ্চয়ই অসত্য লুকিয়ে আছে কোথাও, জড়ত্ব জমে অচল করেছে জীবনের গতি, তাই আমাদের জীবনে এত ব্যথা, এত দুর্যোগ। সমস্ত শক্তির বলে তখন সমস্ত মোহ সমস্ত আলস্য অসত্যকে ত্যাগ ক'রে মানুষ বেরিয়ে আসবে, এই জন্যে তার যুদ্ধ, সে সংগ্রাম যেমন বাইরে তেমনি ভিতরেও। নববর্ষের দিনটিতে সেই অন্তর বাহির দুদিকের আহ্বানই জানালেন রবীন্দ্রনাথ। সে আহ্বানে ধ্বনিত হয়েছে—

"মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও—পাঠাও তোমার মৃত্যুদূতকে ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে—সে তো সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, এত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু কত মিথ্যা আর বলব, বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব, বাক্যের অর্থ অলংকারকে আর কত রাশিকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক—সেই বেদনা-বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র করো।"

এই প্রার্থনা আমাদের আজকের জীবনের একান্ত প্রার্থনা! ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনের কোণে কোণে অন্যায়কে পুষে জীবন পঙ্কিল করবার অশান্তি দুঃসহ। আসুক সংঘাত, আসুক নববর্ষ সমস্ত অসত্যকে অন্যায়কে দূর করবার বল নিয়ে, 'মানব-অভ্যুদয়ের' হোক জয়।

এ যেমন দেখা গেল ভাবের দিকে, তেমনি বাস্তব দিক দিয়ে কি ভাবে কবির দিনটি কেটেছে, এ সঙ্গে তারও কিছু খবর নেওয়া যাক। নববর্ষের দিনটির জন্য কবি বৎসরে বৎসরে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছেন, কখনো শান্তিনিকেতন আশ্রমে কখনো বাইরে। কয়েকখানি পত্রেই সেই আগ্রহের পরিচয় মেলে। আশ্রম থেকে কন্যা মীরা দেবীকে লিখছেন, "পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে"। (চৈত্র ১৩১৭,চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড, পৃ ১৯)

আরেকবার, বিদেশে রয়েছেন। লিখছেন—

"এবার আমাদের পয়লা বৈশাখ সমুদ্রের মাঝখানে দেখা দিয়েছে—সকাল বেলায় যখন সব যাত্রীরা ক্যাবিনে পড়ে ঘুমুচ্চে তখন আমরা তিনজনে সেলুনের এক কোণে বসে নববর্ষের উপাসনা করলুম। যতদিন থেকে আমার ইস্কুল হয়েছে—পয়লা বৈশাখটা বরাবর সেইখানেই সম্পন্ন করেছি—এগারো বৎসরের মধ্যে এইবার প্রথম বাদ পড়ল।"

মীরা দেবীকেই উদ্দেশ ক'রে ১৩২৩-সনের পয়লা বৈশাখে লেখা একখানি পত্রে দেখা যায় এই বিশেষ দিনটিতে মনে মনে কবি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছেন আসন্ন বহির্যাত্রায়—

"মীরু তোরা আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

"এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল—মনটা তাতেই পূর্ণ হয়ে আছে।" (চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড পৃ ৭১)

আধুনিক রীতিতে নববর্ষের প্রচলন হয় কলকাতা থেকে। 'আদি ব্রাহ্ম সমাজে'র উদ্যোগে এর অনুষ্ঠান হয়ে থাকলেও শেষাবধি সেই 'সমাজের' মতো এই বিশেষ অনুষ্ঠানধারাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কবি তাঁর শান্তিনিকেতনে এ উৎসবকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন যথোচিত শ্রদ্ধায় ও আয়োজনে। সেই কথারই উল্লেখ ক'রে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

"তোরা দুজনে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিস। সকালে মন্দিরের কাজ সেরে এসে লিখতে বসেছি। কলকাতা থেকে নববর্ষ বিদায় নিয়েছে। সেটা তেমন বেশি শোচনীয় নয় যেমন শোচনীয় মৃত পদার্থকে আঁকড়িয়ে পড়ে থাকা। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। এ কথাটা অর্ঘ্য দেওয়া সম্বন্ধেও খাটে। অশ্রদ্ধার দানে অশ্রদ্ধাকেই মূল্য দেওয়া হয়!···আজ যদি আশ্রমে থাকতিস্ তাহলে দেখতে পেতিস্ এখানে এটা বেঁচে আছে। তার মানে এই নববর্ষের দিনের সঙ্গে বাকি ৩৬৪টা দিনের নাড়ীর যোগ আছে। কলকাতার পাঁজিতে সে বৎসরটাই নেই যে-বৎসরের প্রথম দিনকে বিশেষভাবে গণ্য করা চলে।" (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ৮১)

অবশ্য, কবি বেঁচে থাকতেই দিনের বদল দেখে গেছেন। কলকাতার সেদিন নেই, এখন কলকাতাতেও নববর্ষের উৎসব জমজমাট।

১৩৪২ সাল। নাতনী নন্দিতা দেবী এবার পত্রের উদ্দিষ্টা। রহস্যালাপে মুখর তার প্রতি ছত্র। শান্তিনিকেতনের একটি নববর্ষ-দিনের অনুষ্ঠানের ছবি ধরা দিয়েছে তার মধ্যে—

"মেম সাহেব

আজ পয়লা বৈশাখ তোর চিঠিতে তোর কুশল সংবাদ শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম।···

আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমবাগানে নববর্ষের নাচ-গান হবে। আমি দুই একটা কবিতা আব্রিত্তি করব। শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ উঠবে আকাশে। লোভ হচ্ছে না শুনে?······আর সব খবর, ভালো। নববর্ষের আশীর্বাদ।" (চিঠিপত্র ৪র্থ, পৃ ১৯৫)

ঐ দিনেই বৌমা প্রতিমা দেবীকেও লিখেছেন একখানি চিঠি। তাতে আশ্রমের বহিঃপ্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মিলিয়ে কবিকে আজও যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। লিখছেন—

"বৌমা, আজ পয়লা বৈশাখে মন্দিরের কাজ শেষ করে এসেই তোমাদের চিঠি পাওয়া গেল।"······(চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ ১১২)

কবিকে নিবিড় ক'রে জানবার ক্ষেত্র তাঁর পত্রগুলি। আজ থেকে বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ নববর্ষের আর-একটি দিনে আরেকখানি পত্র তিনি প্রতিমা দেবীকেই লিখেছিলেন। তাতে পাই সংসারের চিরজীবনের 'সহায় সুহৃদ পিতামাতা'র কথা। চিঠিখানি পড়লে তাঁর আশীর্বাদের জীবন্ত স্পর্শ লাভ করা যায়—

"বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্বত্র দেখতে পাও এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান—নিজের সুখস্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো—সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে শেখ—প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো—প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চির-জীবনের সহায় সুহৃদ পিতামাতা—তাঁরি কর্ম ব'লে সংসারের কর্ম করবে—এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ দ্বারাই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক—সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন—তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না—খুব করে সে কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল

এই অধ্যায়ের গোড়াতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি ছিল ১৩১৮ সনের। এই একই দিনটিতে সেখানে তিনি আশ্রমের মন্দিরে সমবেত সর্বসাধারণের সম্মুখে বসে বলছেন রুদ্রের—"ভীষণং ভীষণাণাম্"—তেজের রূপের কথা, আর এই চিঠিতে ব্যক্তিগত মণ্ডলীতে ফুটেছে একটি আনন্দময় মধুর রূপের পরিচয়। শক্তির দুই রূপেরই আলো নববর্ষকে বর্ষে বর্ষে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে তুলবে।

(২)

একদিন ছিল, যখন ভারতে অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ ছিল বছরের প্রথম মাস, যখন নবীন ধান্যে অঙ্গনতল হত স্বর্ণময়, আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে থাকত ফসলের সুগন্ধ, ঘরে ঘরে সবার মুখে উপচে পড়ত হাসি। সেদিনকার সামাজিক উৎসব ছিল নবান্ন। দিনে দিনে সে রীতি গেল বদলে। অগ্রহায়ণের আগুপিছু কিছু বৈচিত্র্যময় ছিল না। তার পিছনে হেমন্তের ধূসরতা, সামনে শীতের কাঠিন্য; এতে মন হয় নির্জীব, বছর আরম্ভের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। বসন্তের উচ্ছলতা ফুরালে ফল-সম্ভারে পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা বহন ক'রে আসে বৈশাখ, বাইরে কী তার নিরাভরণ রূপ, কী তার রুদ্র তপস্যা। বাঞ্ছিতকে পেতে হলে এমনি তপের যে একান্ত-প্রয়োজন, জীবনের চলার পথে সে সেই দীক্ষাই দেয়। তারপর যেদিন সেই তপ ভাঙে, সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের আর অবধি থাকে না, রসের থাকে না দৈন্য; প্রাণের সজীবতায় আষাঢ়ের নববর্ষায় আসে সেদিন ধরণীতে শ্যামল-সুন্দরের পূজার ক্ষণ। বসন্তে আপনাকে ছড়িয়ে হারিয়ে বিকীর্ণ ক'রে বৈশাখে মানুষ আবার শান্তম্ শিবমের দীক্ষা গ্রহণ করে, হয় শান্ত, পায় শান্তি; জীবনের ফসল ফলানোর উৎসাহে এগিয়ে চলে সামনে। এই তো নববর্ষের উপযুক্ত ঋতু। আশ্রমের উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে সে ঋতুটি তার সমস্ত তাৎপর্য নিয়ে এসে দেখা দেয়। উৎসব জমে ওঠে।

বর্ষশেষের দিনে বাইরে থেকে নিজেকে অন্তরে গুটিয়ে নেবার কাজ। দিন অবসান হয়; ক্ষয়, ক্ষতি, শোক, দুঃখ, আনন্দের ভরা নিয়ে আশ্রমবাসী সমবেত

হন মন্দিরে। দূর ঈশান-কোণে বাজতে থাকে—কালবৈশাখীর গুরুগুরু ধ্বনি, সেই ধ্বনিতে লয় মিলিয়ে বেজে ওঠে কবির কথা—

'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি'; গানে শোনা যায়—

নিখিলের অন্তরমন্দির-প্রাঙ্গণে—
ওই তব এল আহ্বান।

নববর্ষের প্রভাতে, বৈতালিক গানে শোনা যায় 'চির জ্যোতির্ময়ে'র আহ্বান। সকলে মন্দিরে আসেন—আজ নতুনকে বরণ করবার ব্রত।

আশ্রমের প্রথম নববর্ষের অনুষ্ঠান হয় ১৩০৯ সনে। সেদিনকার 'নববর্ষ' নামক বিখ্যাত ভাষণে কবি প্রকাশ ক'রে দেখিয়েছিলেন ভারতের ব্রতের রূপটি, বলেছিলেন ভারতের সনাতন-শক্তির কথা—"সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যু-ভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য লোক-ব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম-রক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে।...আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম।"

সেদিন নূতনের মধ্যেই পুরাতনকে তিনি দেখিয়েছিলেন এক ক'রে—"আজ যে নব কিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসব-বস্ত্র পরিয়াছেন, এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে। যে ঋষি-কবিরা ত্রিষ্টুভছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীত-হরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এ সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নব সূর্য-করে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ-জীবন স্নান করিতে পায়।......নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চির পুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব। সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখনো সেই অম্লান-গৌরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ

করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে।" নববর্ষের উদ্বোধন উৎসবে আজও তাঁরই সুরে কথায় শোনা যায় চির নূতনের মধ্যে মানুষের জীবন বিকাশের চির প্রার্থনা—

হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে।

বৈশাখ মাস পুণ্য মাস। বছরের প্রথম মাসটি বলেই নয়, বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাপুরুষের আগমনে এ মাসটি মহিমময়। ভারতবর্ষব্যাপী পুণ্যোৎসবের ধারা বয়ে চলে সারা মাসটিতে; বছরের প্রথম দিনটি নিয়ে আসে মহাপুরুষের মৃত্যুহীন জন্মের রোমাঞ্চ; যাঁরা এসেছিলেন, আর আজও যাঁরা অনাগত,— গানে তাঁদের সবার স্পর্শ লাগে নববর্ষের উৎসবে সমাগতদের মনে, সকলে যখন তারা শোনে,—

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।

রাত্রির জড়ত্ব ভেঙে অরুণালোকে নববর্ষের উদ্বোধন হয় এমনিভাবে; সন্ধ্যার নিবিড়তায় তার সমাপ্তি হয় নৃত্য গীত জলসা কিংবা নাট্যাভিনয়ে। হৃদয় পূর্ণ ক'রে সবাই ঘরে ফেরে। স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে নববর্ষের উৎসব ভারতে তত ব্যাপ্ত নয়। তবে হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ; বর্ষশেষ এবং নববর্ষে ভগবতী-যাত্রা অথবা গো-পূজা, গাজনের মেলা, চড়ক পূজা,—বাংলার পল্লী-অঞ্চলে এ সব বরাবরই চল্‌তি ছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' বইতে এইসব অনুষ্ঠানের সুন্দর চিত্র পাই।

এই দিনে ব্যবসায়ী-মহলে শুভ মহরৎ—হালখাতার উৎসব। তারও চিত্র পাই পল্লীচিত্রে।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এই যে নববর্ষের অনুষ্ঠান, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, শ্রদ্ধা-প্রীতি জ্ঞাপন, উপহার এবং মিষ্টান্ন বিতরণ—এ অনেকটা ইংরেজদের নববর্ষের আনন্দোৎসবের প্রভাবেই

দেখা দিয়েছে। প্রথমে ব্রাহ্মদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সূচনা ক'রে গিয়েছিলেন। তিনি আদি সমাজে সামাজিক যোগের সূত্রস্বরূপ নতুন কতকগুলি উৎসব প্রবর্তন করেন, তার মধ্যে ভাদ্রোৎসবের মতো নববর্ষের উৎসবও একটি। নূতনরূপে এ অনুষ্ঠানের পূর্ণতা দান ক'রে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝেছিলেন দিনে দিনে ভারতে মিলনের প্রয়োজন যাবে বেড়ে। সবার মিলনের বড়ো প্রাঙ্গণ চাই। কোনো দলীয় আনন্দ নয়, মানুষে মানুষে মিলন ঘটাতে হবে। আজ বাংলায় শুধু নয়, বাংলার বাইরেও শিক্ষিতদের মধ্যে নববর্ষের উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে; সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে সে। কলকাতার ময়দানে পার্কে পার্কে প্রতি নববর্ষে জমে কিশোর কিশোরীদের প্রীতি-সম্মেলন, কুচকাওয়াজে খেলাধুলায় তরুণ প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, বাড়ি বাড়ি নৃত্য-গীত খাওয়া-দাওয়ারও পালা চলে। প্রবাসে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরেও অনুরূপ আনন্দানুষ্ঠান হয়ে থাকে। শান্তিনিকেতনের উৎসবে আজ আর কেউ বড়ো-কোনো-একজনকে দেখবার প্রত্যাশায় আসে না; তবু এখানকার অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের বাঙালী অবাঙালী দর্শকবৃন্দের ভিড় লেগেই থাকে। সবাই আসে ভারতের সেই মিলনের রূপটি দেখতে,—সেই সার্বজনীন কল্যাণমুখী সৌন্দর্য এবং মিলনের ধারা সৃজন ক'রে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসবে উৎসবে সে ধারা বজায় রেখে চলেছে আশ্রম। দেশের কাছে সে মেলে ধরেছে অনাবিল আনন্দে উৎসব-উদ্‌যাপনের সংযত রূপটি। কবির এ একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিরস্থায়ী দান। রবীন্দ্রনাথের উৎসবের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে সৃষ্টির একটি মহৎ প্রেরণাও রূপ পেত নানা কলাশিল্পে ও বাণীতে, সেটির আকর্ষণও কম ছিল না। চিরদিনই আমাদের সেইটিও বিশেষ করেই মনে রাখতে হবে।

বর্ষে বর্ষে নববর্ষের দিনে আশ্রমে কবি নূতন নূতন একটি প্রেরণার দীক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম নববর্ষ অনুষ্ঠানের বছরে (১৩০৯ সনে) আশ্রমের নিরালা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখলেন কবি ভারতের

শাশ্বত নিরাভরণ তপঃসিদ্ধ রূপ। এই দিনটিকেই উপলক্ষ করে কবি 'নববর্ষের গান'-এর মধ্যে চেয়েছিলেন 'মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ……মন্ত্র'। কিছুকাল পরে ১৩১৯ সনে 'রোগীর নববর্ষে' পেলেন আরেকদিন নূতন এক সঞ্জীবনী শক্তির প্রেরণা। সে প্রেরণা প্রেমের। "ঐ প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ঐ প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো।…সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল।" আরো পরে একদিন ১৩২৩ সনের 'নববর্ষের আশীর্ব্বাদ' দিতে গিয়ে কবিতায় কবি বললেন,—

ওরে যাত্রী
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

বাধাবিঘ্ন ঠেলে এই মৃত্যু থেকে জাগরণের বাণীতেই কবি চিরদিন এমনিভাবে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করে এসেছেন; আয়ুর শেষ কিনারায় পৌঁছে শেষ নববর্ষের দিনেও দিয়ে গেলেন যে বাণী সেও মৃত্যুঞ্জয়েরই বাণী—একদিকে তার অন্ধকার আরেকদিকে আলো। ভাবী ভারতের মর্মোদ্ঘাটন ক'রে সেদিন তিনি বলেছিলেন "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করবে।" তবু তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যান নি, ভরসাই রেখে গেছেন, সেই আমাদের সম্বল। বলে গেলেন—"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।…মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

কবির তিরোধানের পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে আজও বর্ষে বর্ষে নববর্ষ এবং জন্মদিনের উৎসব হয়ে থাকে; এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যে দ্রুত

পরিবর্তনের মধ্যে যে বাস্তবকে দেখেছি, যে ঘনঘোর ঝঞ্ঝার মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত বিশৃঙ্খল জীবন নিয়ে শ্রান্ত হয়ে দিশাহারা হয়ে নববর্ষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি তার থেকে পরিত্রাণের দীক্ষা পাব কোথায় ? তাঁরই বাণীতে আছে আমাদের সম্পদ, আশ্রমে দেশ-বিদেশের জনতার মিলনে সে সম্পদকেই নতুন করে জানি বর্ষে বর্ষে। "পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মনুষ্যের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।......

আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।......

প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।"

বহুবার কবির বহু গ্রন্থের প্রকাশে সাহিত্যের ডালি সমৃদ্ধ হয়েছে এই দিনগুলিতে। তার মধ্যে শেষ ভাষণ গদ্য পুস্তিকা 'সভ্যতার সংকট' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যখানার প্রকাশ ঘটে নির্দিষ্ট এই নববর্ষের তিথিতেই।

শেষবার নববর্ষের উৎসবে সমাগত অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব এবং রাধারাণী দেবী। দুজনে সকালে কবিকে প্রণাম করতে এলেন উত্তরায়ণে। কবি খুব খুশি। বিশেষ করে তাঁর স্মিতহাস্যের উজ্জ্বল আভাটি ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন কবি-দম্পতী নানাকথার মধ্যে বলছিলেন,—নববর্ষ এখন বাংলার জাতীয় উৎসব। এ আর শান্তিনিকেতনে বাঁধা নেই। দেশ-বিদেশে বাংলার প্রাণকে এ জাগিয়ে তুলেছে, মিলিত করেছে আনন্দে, উদ্দীপনায়, শুভ্র সংযত শৌর্যমাধুর্যে। কবিকে দেশ যে একেবারে প্রাণের ভিতরে এবং সংস্কারেও গ্রহণ করেছে, এ অনুষ্ঠানটি তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। নববর্ষ বাঙালীর উৎসব, রবীন্দ্রনাথের উৎসব, মানুষে মানুষে মিলনের এই সহজ পথটি ধরিয়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন আজ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ উৎসবের আনন্দই আজকের নববর্ষের দিনটিতে দেশবাসীর নিকট শান্তিনিকেতনের প্রাণের ডালির চির-নবীন প্রীতি-উপহার

শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, এই কথাটি অন্তর থেকে উপলব্ধি করবার,—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাধনাটি কী ? সে কি, নির্জলা ঈশ্বর-সার ধর্মসাধনা, না, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নিরীশ্বর বিজ্ঞানসাধনা,—না, দুয়ের যোগে অন্য কিছু আদর্শ যা শান্তিনিকেতনে কবিরই প্রবর্তনায় থেকে কাজ করে চলেছে, যার তাৎপর্য এখনো সকলের সম্যক্‌রূপে বোঝবার সময় ও সুযোগ আসেনি।

আজ কবির কথাই শুধু মনে পড়ে—"হায়রে দুরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়, যারা তরুণ, আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়, কেউ আমাদের আমল দেয় না।"

(২)

১৩২৩ সাল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। দেখা দিল ধর্মের অছিলায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি। হিন্দু-মুসলমান খেপে উঠল—উপলক্ষ হল মসজিদের কাছে বাজনা। সে সময়ে দেশবাসীর মতিগতি দেখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরের উপাসনায় বলেছিলেন, "এই কি হল ধর্মের চেহারা···এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজা-সুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো···আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি আস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া, একেবারে নূতন করে আরম্ভ করা ছাড়া, আর কী পথ আছে, বুঝতে তো পাচ্ছিনে।" (প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়)

একমাত্র পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ভিত্তি। কিন্তু কী গভীর দুঃখ পেয়ে নাস্তিকতার কথা যে তাঁরও লেখনীর মুখে সেদিন বেরিয়েছিল তা অনুভব করবার বিষয়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাঁর সাধনা একদিকের নয়,—জীবনের ন্যায় তা বৈচিত্র্যময়। বিশ্বমানবের বহু বিচিত্র সাধনাকে আপনার সাধনার অন্তর্গত ক'রে তিনি তাঁর পিতৃদেবের আশ্রমকে এক আশ্চর্য রূপ দান করেছিলেন। জীবন বিচিত্রতায় মুক্তিলাভ ক'রে কাল-কালে নানা পরিবর্তন এনেছে। বস্তু-ভার বর্জন করার চেষ্টা থাকলেও, বস্তুর আমদানি সেখানে কম হয়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতারও অনেক দান সেখানে সমাহৃত হয়েছে, পুরাতন রীতি ধীরে ধীরে কিছু কিছু সরে গেছে। কিন্তু এ সব পরিবর্তনের মুখেও যে ক'টি বিষয় এখনো যথাপূর্ব টিঁকে আছে, তার একটি এবং প্রধানটি হচ্ছে মন্দিরে বুধবারের উপাসনা, অন্যটি দৈনিক সকাল ও সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা। আরও যা চোখে পড়ে তা খোলা হাওয়ায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং বিবিধ উৎসবাদি। এখানে অফিস প্রভৃতি আছে সবই। কিন্তু এ সব বস্তু বা ব্যবস্থাভার আশ্রমের ঈশ্বরোপাসনা-রীতিকে ব্যাহত করেনি। উপাসনা হতেই হবে, কিছুতে তার বাধা জন্মাতে পারে না,—এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। যাঁরা নাস্তিক, বা উপাসনায় অবিশ্বাসী তাঁদের এই আধ্যাত্মিক সাধনার আশ্রমে খাপছাড়া মনে হতে পারে। কিন্তু কবির কাছে তাঁরাও স্বাগত হয়েছেন, অবহেলা পাননি। উপাসনার সময়ে তাঁরাও সমবেত-মণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন পুণ্যানুষ্ঠানে মৌনভাবে যোগদান ক'রে।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-জীবনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিস্তার এবং সে আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট অর্থ ভগবানের সত্তা অনুভব করার সাধনা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদিগের ছাত্রদিগকে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই আমি বোলপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদিগের পুরাতন আরণ্য বিদ্যালয়ে আমরা সেরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ পাই। জীবনে ভগবানের সত্তা অনুভব করা যে-সকল শিক্ষকের কাম্য ঐ সকল বিদ্যালয়ে তাঁহারাই গৃহী ছিলেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অসীমের জন্য আকাজ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল। ছাত্রগণ

শিক্ষকদিগের নিকটে থাকিত এবং তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের সত্তার অনুভূতি লাভ করিত।" (গল্পভারতী, শ্রাবণ, ১৩৫৮, পৃ ২১৯-২০) এ কথার অর্থ অতি স্পষ্ট; কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাস অনুসরণ ক'রে এ কথার অর্থ আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে আমাদের বোঝবার আছে। সে অর্থ টুকুই আজ আলোচ্য।

কবির এই ভগবৎ সাধনার কথার প্রসঙ্গে পাশাপাশি একটি বিপরীত ঘটনা মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের একজন পুরাতন ছাত্র, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। নিজে কাব্যতীর্থ, প্রাচ্য ভাষা ও ধর্মের গবেষক; ছোটো বেলা থেকে শান্তিনিকেতনেই বর্ধিত। তিনি এবং আর-কয়েকজনে একরূপ খেলার ছলে গড়েছিলেন একটি ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী। ধর্ম বা লোকাচারের কোনো মেকী অঙ্গই তাঁরা মানবেন না,—ভালোর দিকে এইটুকু ছিল তাঁদের গূঢ় উদ্দেশ্য। এমন কি তারুণ্যের ঝোঁকে, না-মানার দিকে একটু মাত্রা ছাড়িয়েও যেত-বা। যেটা নিষিদ্ধ, সেটাই তাঁরা খাবেন, খেয়ে সংস্কার-মুক্ত হবেন; কিন্তু খাওয়াটা তাঁদের কাছে বড়ো ছিল না, এজন্য সব-কিছু একবার করাই ছিল যথেষ্ট। এ-হেন মণ্ডলীর অধিপতি সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যুবক নিজেও ছিলেন কবি। তবে তাঁর কবিতার অধিকাংশই রচিত হত ঈশ্বরকে আক্রমণ ক'রে। সংসারের দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর কাব্যের বিষয়। ঈশ্বরের বিচার-ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ থাকত তীক্ষ্ণ বাঁকা ভাষায়। গুরুদেব তাঁকে জানতেন, বরাবরই বিশেষ স্নেহও করতেন। কিন্তু জানতেন না তাঁদের মণ্ডলীটির অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা। একদিন ছাত্রটি তাঁর কবিতার খাতা দিয়ে এলেন গুরুদেবকে। দু'চারদিন বাদেই ডাক পড়ল। তিনি ভাবতে ভাবতে চললেন,—কীই না ঘটে। ঈশ্বর-নিন্দায় ভরা চার্বাক-বাণীর সগোত্র ঐ লেখাগুলিকে গুরুদেব সহ্য করবেন তো! কিন্তু তিনি ধরে রেখেছিলেন, গুরুদেব কখনো ভুল করবেন না। গুরুদেব ডেকে যখন তাঁকে বললেন,—করেছিস কী? নির্জলা ঈশ্বরনিন্দা! লোকে মারবে যে! ছাত্রটির তখন ভাবনা ধরেছে, তবে আর বুঝি আশা নেই। কিন্তু 'এরপরেই

গুরুদেবের প্রসন্নদৃষ্টি তাঁর মুখের উপর পড়ল। বললেন, যা লিখেছিস, ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে,—অনেক ঈশ্বর-স্তোত্রও নাস্তিকতার আড়ালে-প্রবাহিত ঐ বেদনা-ফল্গুর ধার দিয়েও যেতে পারবে না। এই নাস্তিক ছাত্রই পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতা ঘোচাবার আন্দোলনে সমগ্র ভারতে প্রচারক ও সংগঠকের কাজ করেন আর্যধর্মের ব্যাখ্যাতা হয়ে। বর্তমানে শান্তিনিকেতনেই তিনি চীনভাষা ও বৌদ্ধধর্মের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। এ-থেকেই বোঝা যায় যে নাস্তিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা ছিল না।

(৩)

এ কথা সত্য, কবির কাজ চলেছিল মানুষের মনের দিক ধরেই বেশি। নানা দেশের সংস্কৃতির চর্চার পথে নানা দেশের লোকের মধ্যে আত্মীয়তা বাড়ানোর ঐকান্তিক কামনা নিয়েই তাঁর কাজ আজো চলছে। এ ছাড়াও এর বাইরে হাতে-কলমের কাজ যা আছে, তারও ভিত্তি হল অন্তরে, কেবল তা বাইরের শুষ্ক নিয়ম-মানার কাজ নয়,—তা সরস সেবার কাজ। পারস্পরিক সহানুভূতি, সৃষ্টি ও একতাবন্ধনের তা উপলক্ষ মাত্র। শুধু মানুষ নয়, বস্তুর সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কবির সেই বেদনাসূত্রেরই সংযোগ চলছে।

আধুনিক কালের ক্রিয়াকলাপ ও মনোধর্মের ব্যাপ্তি দেখে বস্তু-বিজ্ঞানকে পৃথিবীর প্রাচীন চারটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মতো অন্যতম একটি প্রধান ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে হয়। নাস্তিকতার তা সগোত্র নয়, কিন্তু তাকে লোকে অনেকদিন থেকে ধর্মবিরোধী ব'লে সন্দেহ করে আসছে। তবু তার প্রভাব কমবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, বরঞ্চ দিন দিন সে প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ না-হবেই বা কেমন ক'রে,—কারণ, যা ছিল গোপন অপ্রত্যক্ষ, তাকে চোখের সামনে আনার যে-সাধনা বিজ্ঞান করছে, তার কি তুলনা আছে? রবীন্দ্রনাথ একজন প্রগাঢ় একেশ্বরবাদী, তাই বলে বস্তু-বিজ্ঞানকে তিনি কোনোদিন শ্রদ্ধাদানে কার্পণ্য করেন নি। এ'কে কবি কী ভাবে দেখেছেন সেটা তাই

আমাদের দেখবার বিষয়। কবির আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সঙ্গে একালের বস্তুতত্ত্বের কথাটা পাশাপাশি রেখে যোগাযোগটা বিচার্য। তাহলেই সে সঙ্গে পুরোনো ও আধুনিক কালের শান্তিনিকেতনের সাধনার তাৎপর্যও কতকটা ব্যক্ত হবে। আধুনিকতা বা বিজ্ঞানের যোগ আশ্রমে বাড়তে দিয়ে আশ্রমের ধর্মকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন, কিংবা আবার তার উল্টো পুরাতন কালের প্রচলিত উপাসনা, মন্ত্র, বৃক্ষতলে অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে নবীন যুগের প্রগতিকে উপেক্ষা ক'রে অধর্ম করেছেন—রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান দ্বারা এ বিষয়টি আজ পরিষ্কার হওয়া দরকার।

এক ভূমাই যে সর্বলোকে বিস্তৃত হয়ে আছেন, চেতনে অচেতনে, পদার্থে প্রাণীতে, বিন্দুতে সিন্ধুতে, তার বিচিত্র বিকাশ দেখা এবং সেইসূত্রেই এক ও বহুর মর্ম উপলব্ধি করা—এইটিই যে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, নানাস্থলে নানাভাবে কবি এই কথাকেই পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। একস্থলে লিখছেন—"এই জগতকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য, তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব-পরমাত্মা। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই; বিশেষ কোনো দেশকালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই; ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন; ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূত ভবিষ্যৎকে পূর্ণ ক'রে আছেন নিখিল মানব-লোকে।"

কবির এই কথাগুলিকে এবার আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে দেখা যাক্।

দেখতেই তো পাই, এই সংসারে যেমন 'বহু'র তেমনি 'একে'রও স্থান হয়েছে। কিছুই পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। বহু ও একের সমন্বয়ে চলেছে সৃষ্টিধারা। স্তরে স্তরে গুণের সঙ্গে গুণের যোগবিয়োগেই এক-এক স্তরের এক-একটা বিশেষ সত্তার প্রকাশ ঘটে চলেছে। আমরা এক-একজন মানুষ তার

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অসংখ্য জীবাণু, তারা বিভিন্ন সত্তার সচেতন জীব। আমাদের দেহের স্তরে আমাদের মধ্যে তারা উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের মধ্যেই রয়েছে তারা এই মুহূর্তে স্বাধীনভাবে সক্রিয়। এই দেহ সেই ক্ষুদ্র জীবস্তরের ব্রহ্মাণ্ডবিশেষ। তার পরে আসে হাত-পা-মাথা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহু অংশ নিয়ে একটা স্পষ্টতর সত্তা। সেও এই মুহূর্তেই; সে-স্তরে আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়সীমার জীব। স্থূল প্রবৃত্তিই তার বিশেষ ধর্ম। তার পরে আমাদেরই মধ্যে দেখি সচেতনতা, সেখানে আমরা এই মুহূর্তেই কত কিছু চিন্তা করছি। ভিতরে-ভিতরে সাধু, শয়তান কত রকমে প্রকাশ পেয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। সূক্ষ্ম বিবেক ও মনরূপী 'আমি',—দেহ ছাড়িয়ে চলেছে সে বারেবারেই, আবার কতবারই দেহপ্রবৃত্তির দাস হয়ে স্থূলে এসে আকণ্ঠ ডুবিয়ে খেলে যাচ্ছে। অথচ জানি, জীবাণু-স্তরের ভিত্তিতেই দেহের উৎপত্তি, এবং দেহস্তর থেকেই ঘটেছে চেতনার বিকাশ, আবার এই চেতনাস্তরকে অবলম্বন ক'রেই দেখা দিয়েছে বিবেক, কিন্তু এ-সব খণ্ড সত্তা একই সঙ্গে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বরূপে একটি 'আমি' নামে পরিচিত। আমার মতো অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের আশ্রয় হয়ে আছে সংসারের বিচিত্র মানবধারা। সে-সব ধারাই শেষে অখণ্ড একটি মানবসমাজে পরিণতি লাভ করেছে। কবি বলছেন, "জীবকোষগুলি একদিকে স্বতন্ত্র অন্যদিকে সমগ্র দেহের সম্পর্কে বিশ্বতন্ত্র। সমস্ত দেহের সম্বন্ধেই তারা সত্য, একান্ত পার্থক্যে তারা নিরর্থক, সমস্ত দেহের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদানের দ্বারা তারা সার্থক।" ('নরদেবতা')

সুতরাং খণ্ড অখণ্ড কোনো সত্তা বা কোনো গুণধর্মটিই অবহেলা করবার নয়। কারণ, একটি পরমাণুর নির্দিষ্ট নীতির ব্যতিক্রমও প্রলয় সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীর কাছে সেই সত্যের রহস্য পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিয়েছে। তার থেকে হয়েছে আণবিক বোমারও আমদানি। স্থূল ও বাস্তব সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগতকে এক মহাপরিবর্তনের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও মহৎ পরিবর্তন অপেক্ষা করছে মানুষের আরেক সূক্ষ্মতর নীতি-প্রভাব থেকে। আণবিক শক্তির

কৃতিত্বটা তো নানা কালের হাতে আহৃত নানা তথ্য ও ক্রিয়ার যোগাযোগের ফলস্বরূপ একটি স্থূল ঘটনা মাত্র। চিরদিন ঘটনার গতিমুখেই একদিকে মানুষ জ্ঞাতা, কর্তা ; অন্যদিকে আবার নিজেই নিজের কর্ম হয়ে পরিণতি পেয়ে চলেছে। —সুতরাং মানুষের 'আমি'-টা হচ্ছে চিরকালের ঘটনা বা নিয়মেরই সমষ্টিস্বরূপ, —কবির ভাষায় 'কর্ম ও ছবি' ('নরদেবতা' প্রবন্ধ)। নীতির এই সূক্ষ্ম রহস্যের উপলব্ধি হলে স্বভাবত মনে এই প্রশ্নটা জাগবে যে, কোনো ঘটনায় 'আমি'-টাকে নিয়ে মানুষের পক্ষে অহংকার বা আপশোষ করবার কারণ কী থাকতে পারে? আমরা আমাদের স্বভাবধর্মে, সুখ-দুঃখ নানা বেদনা অনুভব করি ; সেটাও বাস্তব-ধর্মের ক্রিয়া ব'লেই নিরাসক্তচিত্তে উপভোগ করার বিষয়। চেতনাশীল হয়েও যারা জড়ের সামিল এমন অনেকে কেবলমাত্র তত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যাপারটা বুঝেই যাবে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে সত্য উপলব্ধি না হলে বিকারের ছোঁয়াচ্ বাঁচিয়ে চিত্তকে আনন্দময় রাখতে পারবে না ; পরিণততর চেতনার মানুষ তা-ও পারবে। নীতিজ্ঞ হয়ে নীতি-অনুসারী সদাউদ্যমী সদানন্দ হবে তারাই। কী করলে কী ফল হয়, তারা সেটা জানে ব'লেই নীতিসম্মত কাজ তারা করে থাকে। তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী হোক-না-হোক তাতে কিছু আসে যায় না। নীতির ক্ষেত্রে আস্তিক নাস্তিক সবারই মর্যাদা সমান। স্থূল বৈজ্ঞানিক তথ্যের মতো সূক্ষ্ম এই আনন্দময় নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত নানা সঞ্চয়ও আহৃত রয়েছে কালেরই হাতে। কোনো সার্বভৌম প্রক্রিয়ায় তার ব্যবহারও যখন বিশ্বব্যাপী মানবসমাজে বাস্তব হবে, তখনই স্ফুরিত হবে দিব্যজীবনের অপূর্ব দ্যুতি। তার প্রভাব অচিন্তনীয়। বাস্তব আণবিক বোমার ক্রিয়া তার কাছে হবে নিতান্তই তুচ্ছ। আস্তিক নাস্তিক দুই রকমের সিদ্ধ মহাপুরুষদের ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব থেকেই তা অনুমিত হয়। রবীন্দ্রনাথ আস্তিক হলেও, দেখা যাবে, নাস্তিকদের মহৎ স্তরের দৃষ্টি ও কাজ উপলব্ধি করবার ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধা কালে কালে তাঁতে প্রকাশ পেয়েছে। এরি অন্যতম পরিচয় দেয় তাঁর বস্তুতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিকতার প্রতি সুগভীর আকর্ষণে।

(৪)

বহুদিন ধ'রে পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদই বেশি প্রচারিত; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে সবচেয়ে বস্তুতত্ত্বই আজ বেশি প্রগতিশীল। এর কারণ হচ্ছে এই যে, লোকের কাছে এই ধর্মই এখন অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। ঈশ্বরকে দেখা যায় না, সংসারে নিয়মগুলিই অনেকটা তবু স্পষ্ট বোঝা যায়। এইজন্যই নিয়মের উপর লোকের বিশ্বাস সহজেই আনা সহজ, সহজে তা এসেও থাকে। সহজে যা আসে, তাকে নিয়েই কাজ শুরু করা ভালো; কারণ, সহজ থেকে কঠিনে পরিচিত থেকে দূরের দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। অবশ্য, এ হচ্ছে বস্তুতন্ত্রের দিকের চিন্তাপদ্ধতি; রবীন্দ্রনাথের বিচার-পদ্ধতি এসম্বন্ধে অন্যরূপ, এ বিষয়ে তাঁর 'নরদেবতা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

স্থলবিশেষে আস্তিকশাস্ত্র গীতায়ও যেন বস্তুতন্ত্রের চিন্তাপদ্ধতির কিছুটা সায় মেলে। 'ব্যক্ত মধ্যানি ভারত,'—আপাতত 'ব্যক্তমধ্য' নিয়েই আমাদের কাজ; অনাদি অনন্ত নিয়ে যখন মাথা ঘামাবার পালা আসবে তখন দেখা যাবে।—অনেকের পক্ষেই তো তা অনেক পরের ব্যাপার;—সংসারে যতটুকু ব্যক্ত আছে,—তার শেষই আগে পেয়ে নিই, তা পেলেই আমাদের বর্তে যাওয়ার কথা; চৌদ্দ আনা লোকের পক্ষে সেটুকুই কোনোমতে সম্ভব হলেও হতে পারে; সেটুকু ছাড়িয়ে উঠলে সিদ্ধি আপনা থেকেই নূতন নূতন সাধনার পথ খুলে দেবে। পথ খোলার ব্যাপারে অংশত গীতার ধারায় মিল রেখে বস্তুতত্ত্বের দিক থেকে একথা বলা চলে—যতটুকু বোঝা যায় বুঝে চলি, সে বোঝার কারবার শেষ হলে তারপরের বোঝবার বিষয়টা আপনি দেখা দেবে। যা বুঝিনে, প্রথম থেকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই কেন? সহজবুদ্ধির বিষয় ব'লে পৃথিবী ভ'রে লোকে যে-বাস্তবকে দেখছে, কোনোস্থলেই তার সত্য কোনো ঐন্দ্রজালিক প্রহেলিকার বিষয় নয়। সে নীতিস্বরূপ। সেই নীতির অজ্ঞেয় অংশে সেই নীতিকে শেষটায় মহাকাল বা ঈশ্বর নাম দিয়ে যাঁরা তৃপ্তি পান, তাঁদের সঙ্গে এই বস্তুতান্ত্রিকদের ভাষার মতান্তর ঘটতে পারে মাত্র, ব্যবহারে পরস্পরের মনান্তরের কোনো অর্থ

মেলে না। কিন্তু আস্তিকে ও নাস্তিকে, কালে-কালে অনর্থ ঘটে আসছে। ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, পৃথিবী আজো এই দু'দলেই বিভক্ত। পুঁজিবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধনিক দল, অর্থাৎ ইঙ্গ ও আমেরিকান মণ্ডলী, মোটের উপর ঈশ্বরবাদী; আর, অপরপক্ষে পুঁজিবিরোধী অর্থতাত্ত্বিক সাম্যবাদী রুশ-চীন দল নিরীশ্বরপন্থী। দুয়ের মনোধর্মে, জীবনযাত্রায় সর্বত্রই বাঁধছে দ্বন্দ্ব। অতীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের মূলেও ছিল একদিন এই ধর্মের পার্থক্য বা আস্তিকে-নাস্তিকে জীবনদর্শনের মতাধিপত্য। প্রকারান্তরে সেই 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা'র পূজা করা-না-করা নিয়েই চিরদিন নানা সংকটের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ এই চির সংকটের মূল কারণ নির্ণয় ক'রেই অজাতশত্রুর কথায় 'পূজারিণী' কবিতাতে লিখেছিলেন—

বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার
ভুলিলে বিপদ হবে।

সেই একই বিপদ আজো হচ্ছে।

(৫)

এই সংকট থেকে প্রাণীর ত্রাণ প্রার্থনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ একটি চিরন্তন গান গেয়েছেন। পৃথিবী থেকে হিংসা দূর হয়ে গিয়ে পৃথিবী শান্ত হোক, কলঙ্কশূন্য হয়ে অমৃতময় হোক। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে বুদ্ধজন্মোৎসবের উপলক্ষে ১৩৩৩ সনে গানটি লেখা হয়। পরে তাঁরই 'পূজারিণী' কবিতা-ভাঙা নাটক 'নটীর পূজা'-তে বৌদ্ধভিক্ষুদলের মুখে গানটিকে তিনি বসিয়ে দেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।

উৎসবের গান লিখলেন,—কিন্তু শুধু নীতিবাক্য ব'লে রাখলেই তো এই শান্তির দেখা মেলবার নয়। বাণীকে সার্থক করবার জন্য বাস্তব জীবনে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ আচার-আদর্শের একটি পরিবেশ মানুষের কাছে মূর্ত ক'রে ধরা দরকার। কবি সেই একটি জীবনের জয় দিয়ে, তথাগত বুদ্ধকে এনে এই গানের লক্ষ্যস্থলে স্থাপন ক'রে সেদিনই বলেছেন,—

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

সত্যই যিনি দেশের সব-কিছুকে উল্‌টে দিয়ে, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ঐশ্বরিক কাজ দেখিয়েছেন, সেই 'মানুষ'-বুদ্ধদেব কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই দেন নি; দুঃখতাপ-দগ্ধ সাধারণ লোকের পক্ষে যা সহজে বোঝবার, সেই পার্থিব নীতির কথাই তিনি বলেছেন বরাবর। নীতিকে জেনে জেনে অগ্রসর হতে হবে; নীতিসংগত কর্মসাধনাই বৌদ্ধমতে জীবন্মুক্তির উপায়। এস্থানে এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মানুষকে মুক্তি দিতে এই গানে কবিও সাকার-নিরাকারের প্রশ্নের অবকাশ রাখেননি, দৈবে নির্ভর না ক'রে সোজাসুজি ইহলোকের মানুষকেই বসিয়েছেন মানুষের মুক্তিদূতের পদে। কারণ, সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে পরম সত্য তাকে কবি দেখেছেন মানুষেরই পরম বোধের দ্বারা।

বস্তুবাদ ও বৌদ্ধধর্ম দুটিই ঈশ্বর-নিরপেক্ষ,—এই অর্থে দুটিই সমপর্যায়ভুক্ত,—নাস্তিকতার দুটি শাখা। দুটির বৈশিষ্ট্য দু'রকম। বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই,—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে এই নেতিমূলক বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানসাধনায় এগিয়ে চলেছে বৌদ্ধধর্ম। বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিপরীতমুখী। অর্থাৎ, তার প্রতিপাদ্য হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একমাত্র বস্তুই সর্বত্র বিরাজ করছে, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বস্তুকে অস্বীকারের সাধনা হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের, আর বস্তুকে স্বীকারের সাধনা হচ্ছে বস্তুতন্ত্রের। সাধনার ক্ষেত্রে পথের অংশটুকুতে দুয়েরই বস্তুর পরিচয় নিয়ে কাজ। এইখানেই বস্তুতত্ত্বসাধনায় দু'য়েকে একদিক দিয়ে সমধর্মী বলা

হচ্ছে। প্রভাব বিস্তারের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে প্রাচীনতর দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম, আধুনিক হয় বস্তুতন্ত্র। প্রাচীনতর বৌদ্ধধর্মেরও প্রভাব আবার ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর, আধুনিক বস্তুতন্ত্রী মার্কসপন্থীরাও যে কোনোদেশেই সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়, তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ নাস্তিকতার এই দুই বিপরীত শাখার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তবে, বস্তুতন্ত্রের পৌরাণিক পার্শ্বচর বৌদ্ধশাখার সঙ্গেই কবির বেশি পরিচয় ঘটেছিল। গভীর এবং ব্যাপকতর হয়েছিল সে যোগ নানা দিক দিয়ে নানা কারণেই।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। তীর্থদর্শন ক'রে পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভের আশায় বা পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে নয়, জ্ঞানধর্মের কেন্দ্র ও বিশিষ্ট লোকসমাগমের স্থল রূপেই কাশী, শ্রীক্ষেত্র, প্রয়াগ তাঁকে যে আকর্ষণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হরিদ্বারেও তাঁর যাত্রার সংকল্প হয়েছিল, কিন্তু যাত্রা হয়ে ওঠেনি। আরেকটি তীর্থে তিনি গিয়েছিলেন—গয়ায়। তীর্থ-পর্যটনের তাৎপর্য তাঁর রচনায় বিশেষভাবেই বিবৃত আছে। গয়ার নিকটবর্তী বুদ্ধ-গয়ায় কবি দু'বার যান, একবার ১৩১১ সনের ২২শে আশ্বিনে, অন্যবার ১৩২১ সনে, সেও আশ্বিনমাসেই। ভগবান বুদ্ধকে কবি পরম শ্রদ্ধা জানাবেন এবং বুদ্ধের সাধনাস্থলের স্পর্শলাভ করবেন,—এই ছিল কবির বড়ো আকর্ষণ। শোনা যায়, তীর্থস্থানগুলির মধ্যে একমাত্র এই বুদ্ধগয়াতেই বুদ্ধপাদপীঠতলে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন; অথচ বুদ্ধের ধর্মকে আমাদের দেশে নাস্তিক ধর্ম এবং বুদ্ধকেও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আখ্যা দিতে কসুর করা হয়নি। বেদবিরোধী ব'লে এদেশে বহুদিন হল বৌদ্ধধর্ম তার প্রতিপত্তি হারিয়েছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কবির অনুরাগ এ ধর্মেও প্রবল ছিল, তা সকলের বিশেষভাবেই জানা আছে।

কবির জীবনে বিশ্বমৈত্রী সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মৈত্রীর সাধনা ছিল বুদ্ধের। শাস্ত্রমতে বৌদ্ধমতের সারতত্ত্ব রয়েছে চতুরার্য-সত্যে। চতুরার্য-সত্য হচ্ছে এই চারটি তত্ত্ব, যথা—১। দুঃখ, ২। দুঃখের কারণ, ৩। দুঃখের

নিরোধ, ৪। দুঃখ নিরোধের পথ। কিন্তু এই দুঃখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির কথাটা কবির কাছে বড়ো হয়নি। কবিচিত্ত তার মধ্যে অবগাহনের সুযোগ পায়নি; কিন্তু দুঃখনিবৃত্তি কথাটি এসেছে যে-মৈত্রীভাবনার সুধানির্ঝর থেকে, সেইটি কবির চোখে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে আর-একটি বিষয়ও ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে-সব অনুভূতির পরিচয় রেখে গেছেন তার সাহায্যে যদি আমরা যুগপ্রবর্তকদের আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, বুদ্ধদেব কবির হৃদয়ে একটি বিশেষ আসনই পেয়েছিলেন। শুধু মানবপ্রেমের উপরে ভিত্তি ক'রেই যদি এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে বুদ্ধদেবের সঙ্গে একাসনে অন্যান্য যুগ-প্রবর্তকদের প্রতিষ্ঠিত দেখা যেত। কিন্তু তা যে হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মানবমৈত্রী ছাড়াও তারই আনুষঙ্গিক আরো-কিছু কবিকে বুদ্ধদেবের সাধনায় আকৃষ্ট করেছিল, বরাবর তাঁকে মুগ্ধ মধুপের ন্যায় ফিরে ফিরে আসতে হয়েছিল সেই সাধনার পুষ্প-বিতানে। এ হলো বুদ্ধের যুক্তিবাদ। মানবের ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা প্রদর্শনও বুদ্ধদেবের মতো কম লোকেই করেছেন।

বুদ্ধদেব যখন মরদেহ ত্যাগ করছেন, শিষ্যদের ডাকলেন। সকলেই নীরব। প্রধান শিষ্য আনন্দ এগিয়ে গেলেন। সংঘের ভবিষ্যতের পথ জানতে চাইলেন। তথাগত মাত্র এইটুকু বললেন,—"তোমরা আত্মাকে প্রদীপ ক'রে পথ চলবে, আমার উপর কেউ নির্ভর করবে না।" সেদিন বুদ্ধদেব মানুষের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা দান করে মানুষকে যে মুক্তির বাণী দিয়েছিলেন, সেই অনন্য শ্রদ্ধাই কবিকে তাঁর প্রতি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেছিল। এ অনুমানের সত্যতা মেলে এই হতে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু বাণীতে মানবমৈত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মানবের মহিমা ঘোষণা সমানভাবে করেছেন।

এ দুটির সন্ধান পেয়েই পরম রসে কবিচিত্ত আপ্লুত হয়। তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণা বুদ্ধকে অবলম্বন ক'রে গদ্যে পদ্যে গানে নাটিকায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। কবির বুদ্ধ-অনুরাগের মূল রহস্য এই।

স্মরণ করা আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথও প্রথম কর্মজীবনে বেদ-ব্রাহ্মণের সমাজ-অনুশাসন নিয়ে বিশেষভাবেই ভেবেছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের তৎকালীন প্রাক্তন জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মণ-অধ্যাপককে পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখেছিলেন—

"প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু-সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।...ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণগুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না ?...১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯।" (স্মৃতি)

কিন্তু গভীর উপলব্ধির পরিণতির দিনে এই রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন বাইরের জনৈক নবীন জিজ্ঞাসুকে,—"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি।...আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হতে পারবে।...জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস। ১১ মার্চ ১৯৩১।" (প্রবাসী ১৩৩৮ ভাদ্র)

কেমন ক'রে কবির মধ্যে দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল, শুধু কাব্যে নয়, ব্যবহারেও তিনি সর্বানুভূতিকেই প্রধান ধর্মরূপে কখন থেকে গ্রহণ করলেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া অপেক্ষা তার রহস্যও বড়ো কম নয়।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। এর পূর্বে আধুনিক বস্তুতন্ত্রের সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হল, সেটি আমাদের সাধারণ দৃষ্টির কথা; কবির সর্বাস্তিবাদ তা থেকে একস্থলে স্বতন্ত্র। বস্তুতন্ত্রের উচ্চ স্তরে একটি

আনন্দরস আছে, সেটিও অহং-বিমুক্তির ভাব,—নিছক তা জ্ঞানযোগের দান। কিন্তু গোড়ায় আছে তার নীরস নীতির তত্ত্ব, কেবল শক্তির খেলা। কবি এই শক্তি বা নীতির যোগাযোগ-জালকে দেখেছেন বিশ্বসত্তার বহিরঙ্গরূপে। "মণ্ডলের কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতাণু ও সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরছে ঋণাত্মক বৈদ্যুতাণু"—এ তাঁর ভালো করেই জানা আছে। কিন্তু তিনি বলেন, "এই আবিষ্কারটি পরম বিস্ময়জনক, কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর এদের সম্বন্ধ-সূত্র। ...যে সত্যকে আমরা কেবল শক্তিরূপে জানি, প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই আপন শক্তির সঙ্গে তার যোগ সাধন করি। আমরা চাই অন্ন। কিন্তু এখানেই তো শেষ হল না, আরও মস্ত চাওয়া বাকি রইল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ চায় আনন্দ, এই আনন্দের পূর্ণতা পায় যার কাছে, সে শক্তি নয়, সে ব্যক্তি। ··আত্মা আপন আত্মীয় সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ অনির্বচনীয়, এই সম্বন্ধ সকল দৃষ্টির মূলে। এই সম্বন্ধের অন্তরতম উপলব্ধিকেই বলে প্রেম। এর কাছে সকল প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখনই বলা সহজ হয়, 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না।" কবির কথায় বোঝা যায়, এই প্রেমই হচ্ছে সৃষ্টির অন্তরে নিহিত নিগূঢ় শ্রেষ্ঠতর আনন্দের বিষয়। কবি বলছেন, "নিখিল পুরুষের ব্যক্তিরূপকে যদি নিজের ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিবিড় প্রেমে উপলব্ধি করি তাহলেই বাহিরের ব্যক্তি-বিশেষের ধনে যে লোভ তার বন্ধন কাটে।...বিশ্বভাবকে নিয়ে তার মানবধর্ম, এইখানেই সর্বমানবের সত্য সে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করে, যে-মানব ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে অধিষ্ঠিত।...অন্য জন্তুর মতো নিজের সত্তাকে আর-সব থেকে পৃথক জানার বুদ্ধি অসত্য। বিরাট পুরুষের মধ্যে মানুষ সত্য।"

একটু পরেই আরো পরিষ্কার করে কবি বলছেন—"সূর্যে আগুনে বাতাসে যে জাগতিক ক্রিয়া তার মধ্যে ভালমন্দের আদর্শ নেই, তার মধ্যে মানব-সম্বন্ধের তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ব্যবহারের সম্বন্ধ, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ, সেবার সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ সেখানে আমাদের অর্থ, কিন্তু পরমার্থ নয়।

"এক সময়ে জাগতিক শক্তির কাছ থেকে অন্ন, ধন ও শত্রুপরাভবের প্রত্যাশা করে থাকি। কিন্তু যখন থেকে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়কে বড়ো করেছি, অর্থের উপরে পরমার্থকে, তখন থেকে যাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি মানবিক। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের যোগ নয়, ভালবাসার যোগ। সংসারযাত্রায় সিদ্ধিলাভ জাগতিক নিয়মে, আত্মার চরিতার্থতালাভ পরমাত্মার প্রেমে। বৈষয়িক অভাব, সাংসারিক ব্যর্থতা দ্বারা তার ন্যূনতা ঘটে না—সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রেমেরই মধ্যে।...এই প্রেমের সত্য প্রমাণ কোথায়? ভাবুকতায় নয়, বিশ্বকর্মে।"

কবি বলছেন, বিশ্বকর্মের দ্বারা যতক্ষণ সমাজের সর্বসাধারণের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। বস্তুতন্ত্রের পথে নীতিজ্ঞান, কর্তব্যপালন—এসব ভালো, কিন্তু এসবের উপরের সত্যবস্তু হচ্ছে প্রেমের সম্বন্ধজাত আনন্দ। এ আনন্দই তিনি বুদ্ধদেবের মৈত্রীধর্মের মধ্যে পেয়েছিলেন। কবির কাছে ভক্তির পাত্র ছিলেন বুদ্ধদেব—শুষ্ক নীতির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর এই মৈত্রী করুণার সরসতার জন্য। কবি লিখেছেন,—"এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব মানুষের মধ্যে শক্তিমান হয়েছে ব'লেই মানুষের দ্বারা সমাজ-সৃষ্টি সম্ভব হল। সমাজে মানুষের প্রয়োজন সাধন হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন-সম্বন্ধের চেয়ে সত্যতর আনন্দের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধটি যদি সমাজে কাজ না করে তবে কেবল স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কোনো সমাজ বেশীদিন টেঁকে না।" নিখিলকে একদিকে যেমন নিয়মের রাজত্ব বা 'কর্ম ও ছবি'র একটি পদার্থ-সমষ্টি রূপে, বস্তুতন্ত্রের বাহির-পরিচয়ে জানতে হবে, তেমনি মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণায় আত্মীয়ভাবে অন্তরের পরিচয়েও জানা চাই,—তবে জানা ও পাওয়া হবে সম্পূর্ণ। আধুনিক বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে তাই কবির সংগতি আছে, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে আছে তাঁর সাধনা জ্ঞানের উপরে,—প্রেমের মহলে। প্রত্যক্ষের ওপারেও অনন্ত-অপরোক্ষ এক অখণ্ড সত্যকে তিনি চোখের সামনের বস্তুর মতোই প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি 'সর্বাস্তিবাদী'।

যা দেখা যায়, আর যা দেখা যায় না,—সমস্তই তাঁর কাছে আছে। এজন্যই আধ্যাত্মিক সাধনার রূপে তাঁর তৃপ্তি নেই, রূপের অতীতেই তাঁর তৃপ্তি। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে বিজ্ঞানে সেই রূপেরই তিনি পূজারী যা অরূপের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর শেষদিককার কাব্যত্রয়—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে'র মধ্যেও এসব কথা আরো স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

ঈশোপনিষদের বাণী ব্যাখ্যা ক'রে 'পরিব্যাপক পরম সত্য' সম্বন্ধে কবি বলছেন,—"তাঁকে যারা একান্ত সীমাবদ্ধভাবে দেখে তাদের মন তমসাবৃত হয়। কিন্তু যারা তাঁকে একান্ত অসীমভাবে দেখে তারাই সত্যকে জানে। অর্থাৎ এই পরম পুরুষ বিশেষের মধ্যেও এবং বিশেষকে অতিক্রম ক'রেও। বিশেষকে একবারে 'না' ক'রে দিয়ে যে অসীম সে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়।" (নরদেবতা)

কবিকে বস্তুর উৎপাদন ও ব্যবহারিক আদান-প্রদান ক্ষেত্রে, দোকানে কারখানায় নানা উৎসবের প্রবর্তন করতে দেখি। কৃষিক্ষেত্রে তাঁর সীতা যজ্ঞ বা হলকর্ষণ উৎসব, শ্রীনিকেতন শিল্পভবনে শিল্পোৎসব এবং পার্শ্ববর্তী বাঁধগোড়া গ্রামে ইন্দ্র-উৎসব,—এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি বস্তুকে সামনে রেখে বস্তুর মধ্য দিয়ে মানুষেরই ক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তার কল্যাণ সম্বন্ধটিকেই বারবার তাঁর মন্ত্রে, গানে, নাটকে, ভাষণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটক প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থের একস্থলে বলেছেন, "সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী।…প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা।" বস্তুতন্ত্রের সাধনা সাধারণত যে প্রতাপের দিকটায় ঝোঁক দেয়, তার অনর্থ থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যই কবির এই প্রেমের বাণী নিয়ে তাঁর 'রক্তকরবী' ফুটে উঠেছে।

১৩৩৬ সনে স্বরুলে শ্রীনিকেতনের হলচালনা উৎসব উপলক্ষ ক'রে যে একখানি পত্র লেখার কথা এ প্রবন্ধের সূচনায় উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তিনি

লিখেছিলেন,—"আজ স্কুলে হলচালনা উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করতে হবে বলে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল লাঙল কাঁধে ক'রে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে, বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয় রথের বাহন।...শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ব্যাপারে আমি আর আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি কিন্তু যে-শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না। এই দুঃখ অনেকদিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে-বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে। এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই বলতে পারিনে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক।"

কবির এই কথা থেকে, বিষয়টিকে আমরা বুঝছি। বস্তুর জ্ঞান নিয়েই তো বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের বাহন হয়েছে যন্ত্র। মানুষ সেই যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর স্থূলতা ও জড়তার উপরে বিজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা তাকে দিয়ে মানুষের মতো কাজ করাচ্ছে। এইখানে উৎসবের মধ্যে কবি বস্তুকে এবং সেই সঙ্গে বস্তুবিজ্ঞানাশ্রয়ী মানুষের সক্রিয় মনঃশক্তিকে অভিনন্দিত করছেন।

'শান্তিনিকেতন কী'—লোকমতের এই অস্পষ্টতা নিয়ে ক্ষোভ করলেও, আসলে কবি বলতে চান,—শান্তিনিকেতনের কর্মধারা পুরাতন নয়, নূতনও নয়, সে হচ্ছে চিরন্তন। সকল কালের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে

যেটুকু সকলের জন্যেই শ্রেয় হয়ে প্রকাশ পায়, সেটিই দেশকালপাত্রনির্বিশেষে শান্তিনিকেতনের সাধনার বস্তু। আর এই সাধনাতেই শান্তিনিকেতনের সার্থকতা নিহিত। শান্তিনিকেতনের পুরাতন ও নূতন কালের কাজকারবার-গুলির খবর নিয়ে অতঃপর আমরা এ সিদ্ধান্তেও পৌছাতে পারি যে, শান্তি-নিকেতনের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ঈশ্বরের মধ্যেই সার্থকতা খুঁজলেও, নিরীশ্বর মনোভাবকে তা উপেক্ষা করে না। এই দৃষ্টির প্রসার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেশ্বর ও নিরীশ্বর সর্বমানবের আত্মীয়তায় বাঁধা। আধুনিক বিজ্ঞান বা নিরীশ্বরতাও দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাচ্ছিল্য লাভ করেনি, এ কী কম কথা। সকলকে নিয়েই তাঁর শান্তিনিকেতন, এবং তা পূর্ণতার পথে গতিশীল। একে কোনো বিশেষ এককালের বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে মাপলে অসম্পূর্ণ পরিচয়ে দেখা হবে। ঈশ্বরের দ্বারাই সব পরিব্যাপ্ত, তারি মধ্যে নিরীশ্বরতা বা বস্তুবাদী আধুনিকতা একটি বিশেষ অপূর্ণ ধাপ,—একদিন তাও পূর্ণতায় পৌছবে অখণ্ড ঐশ্বরিক 'সোঽহং' উপলব্ধিতে ;—এই বিশ্বাসেই সমন্বয়ী পূর্ণতার সাধক রবীন্দ্রনাথ সমস্তকে শান্তিনিকেতনে স্বীকার করেছেন ধৈর্যে ও শ্রদ্ধায়।—এ জিনিস এই উদারতা তাঁর সাধনার ক্রমবিকশিত মহৎ পরিণতি। সেই উদারতার মাপকাঠিতেই শান্তিনিকেতন চিরকাল বিচার্য।

বলা আবশ্যক, বস্তুতান্ত্রিক নিরীশ্বরতার মহৎ দিকের আদর্শ নিয়েই এ প্রবন্ধের যা-কিছু আলোচনা হলো। এর নিকৃষ্ট দিক যা প্রগতিবিরোধী, এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক লালসা যার মূলে, এবং ভোগ যার লক্ষ্য তা জড়বাদের অন্তর্গত। জড়বাদ বরাবরই কবির কাছে পরিত্যাজ্য ছিল। শান্তিনিকেতনেও সত্যান্বেষী আধুনিকতা বা নিরীশ্বরতা গভীরভাবের সাধনা নিয়ে যেখানে যতটুকু বা যতখানি প্রকাশ পেয়েছে বা পাবে, তা 'শান্তিনিকেতন কী' চিরদিন এ প্রশ্নের সদুত্তরই বহন করবে, কিন্তু কবি-কর্তৃক পরিত্যক্ত জড়বাদ প্রশ্রয় পেলে নিশ্চয়ই তা কবির আদর্শ ও শান্তিনিকেতনের ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করবে।

(৬)

কবি চেয়েছেন, নানাদিক দিয়ে সত্যকে প্রেমের সঙ্গে উপলব্ধি করতে ; এজন্য সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসার উদ্যম যাতে সক্রিয় থাকে, বাঁধাধরা বিধিনিষেধ,—শুধু নিয়মের জন্যই নিয়মানুসরণ, অভ্যাসের এই অন্ধ পুনরাবৃত্তিতে কোথাও যাতে মানুষ ঠেকে না যায়, এর দ্বারা একদেশদর্শিতায় সত্যকে কেউ খর্ব না করে,—এই ছিল তাঁর একান্ত চেষ্টা। সকলের প্রতি প্রাণের যেখানে সহজ বেদনার প্রসার, সেইখানেই তিনি দেখেছেন প্রগতি,—যেখানে দেখেছেন সংকীর্ণতা, সেখানেই জেনেছেন জড়ত্ব। তাঁর কাছে সংকীর্ণতা বা জড়ত্বের লক্ষণ হচ্ছে চিত্তের বিমুখতা। ধর্মে-কর্মে, মননে, জীবনযাত্রার যে-কোনো ক্ষেত্রে যখন কোনো কারণে মানুষের মধ্যে এই জড়ভাব সঞ্চারিত হতে দেখেছেন—তখনই কবির বাণী উঠেছে অগ্নিময়ী হয়ে। আপন বেদনা দিয়ে, আপন আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, পরের বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য যেখানে অনুভব করা যায়, সেইখানেই প্রকাশ পায় সহৃদয়তা। সভ্যতার সেইটিই হল পরম দান।

সর্বভূতকে আত্মবৎ যে দেখে সেই ঠিক দেখে থাকে—শাস্ত্রের কথাও হচ্ছে এই। এর অর্থ এমন নয় যে, জগতে আমিই একমাত্র সর্বেসর্বা—সকলে আমার মত হোক এইটিই আমি দেখতে চাই। এরকম দেখার থেকেই দেখা দেয় জড়বাদ। আত্মসর্বস্বতায় সৃষ্টি করে অপরের প্রতি চিত্তের অসাড়তা। কবি বলেছেন—"একেই বলে তামসিকতা অর্থাৎ মেটিরিয়ালিজম্—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা।" (পথে ও পথের প্রান্তে পৃ ৯৪) সাধারণ একখানি চিঠিতে ফুল-ফলের প্রতি আমাদের উদাসীনতা সম্পর্কেই যদিও এ উক্তিটুকু তিনি করেছেন, কিন্তু তার থেকেই জড়বাদের এই সাধারণ সংজ্ঞাটি নিয়ে আমরা সমাজে ধর্মে রাষ্ট্রে ও শিক্ষায় সর্বত্র সত্য যাচাই করে দেখতে পারি।

সমাজে জড়বাদের প্রাদুর্ভাব দেখেছেন—এমন অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে কবির 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' নামক

রচনাটিতে (সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ)। ঘটনাটি হামারগ্রেণ নামক সুইডেনবাসী একজন যুবককে নিয়ে। বাংলা দেশে তিনি পর্যটনে এসেছিলেন। তিনি "বাঙালির বাড়িতে বাস করিতেন, বাঙালি ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন, যাহা কিছু পাইতেন তাহাতে বহি কিনিতেন ও সেই বহি ছাত্রদিগকে পড়িতে দিতেন, এবং পথের দরিদ্র বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিতেন······ শুনা যায় লাইব্রেরি স্থাপন চেষ্টার জন্য গুরুতর অনিয়ম ও পরিশ্রমই তাঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ।···মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার লাইব্রেরির কথা ভুলিতে পারেন নাই।

"হামারগ্রেণ মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহের দাহ হইয়াছিল।" এতে কোনো-কোনো মহলে কথা উঠে, কেন এই বিদেশীকে নিমতলায় পোড়ানো হল; নিতান্ত অন্ত্যজ জাতির কাউকে সেখানে দাহ করায় কোনো কথা ওঠে না। 'সাধনা' পত্রিকার একই সংখ্যায় এই প্রবন্ধটির অব্যবহিত পরেই জয়কালী দেবী ও শূকর শাবক সম্পর্কিত 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সঙ্গেই মনে পড়ে 'চতুরঙ্গে'র নাস্তিক জগমোহন-চরিত্রের উদারতার কথা।

ধর্মের ক্ষেত্রে মুখোসপরা মেকী সাকারবাদ বনাম জড়বাদের উৎকট খেলা দেখিয়েছেন কবি তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে। তাতে 'গোঁসাই' একটি সুন্দর নমুনা। 'গোরা'র পানুবাবু ও হরিমতিও ঐ একই শ্রেণীর।

এ-যুগের বস্তুবাদের মহৎ রূপ কবির যে চোখ এড়ায়নি, তার পরিচয় আছে, 'যাত্রী' গ্রন্থের নৃতাত্ত্বিক জর্মণ বৈজ্ঞানিকের মধ্যে, আছে তা সোভিয়েট-লোকব্যবস্থার প্রশস্তিবাদে 'রাশিয়ার চিঠি'তে। কবি বৃদ্ধবয়সেও প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিলেন রাশিয়ার অবস্থা ও ব্যবস্থা।

রাশিয়া-ভ্রমণের প্রসঙ্গে একটি সমসাময়িক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। কবি রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। আচার্যরূপে তিনি উৎসবের উদ্বোধন সভায় ভাষণ দান করতে আসীন। কবিকে তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণের পর সকলে ফিরে পেয়েছে। এমনিতেই সকলে কত উৎফুল্ল। তা ছাড়া, বিদেশের অভিজ্ঞতা শোনা যাবে, বিশেষত রাশিয়ার। সকলের উৎসাহের অন্ত নেই। ভাষণের প্রথমে শুরু হল কবি-বন্দনা। একজন বিশিষ্ট আশ্রমকর্মী সমাগত সাঁওতালদের অর্ঘ্য-নিবেদনের ইংগিত করলেন, নিজেও অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে নিবেদন করলেন কবির পায়ের কাছে। সকলের প্রণতির এই ভঙ্গিটি খুবই স্বরুচি ও শিল্পস্বন্দর হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিকে গম্ভীর দেখাল। কবি ভাষণ দান করলেন। মানুষের প্রতি মানুষের বেদনাতে এবং মানুষের বৈষয়িক ব্যবস্থার সাম্যনীতিতে দুঃখ দুর্দশার যে কিরূপ আশ্চর্য বিলয় ঘটাতে পারে, দারুণ আঘাতের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার কাজ ক'রে মানুষ কতদূর শান্তি ও উন্নতির পথে এগোতে পারে, সেসব কথাই তিনি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বললেন। কিন্তু বিকেলে যখন কবি উত্তরায়ণে বিশ্রাম লাভ করছিলেন, তখন তাঁর একজন ছাত্র তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—শেষে কি গুরুদেবও মানুষকে পূজা করা সমর্থন করবেন। কবি অবাক। ছাত্রটি সেইদিনকার শ্রীনিকেতনের সভার পুষ্প-নিবেদনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অমনি কবির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল; অপরিসীম লজ্জা ও ক্রোধে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগলেন,—ঘটনাটা নিতান্তই আকস্মিক,—কিন্তু সেটা নিজেও তিনি লক্ষ্য না করেছেন, এমন নয়। সরল সাঁওতালদের ঠেকাবার উপায়ও ছিল না আর তাতে সভায় গোলযোগেরই সৃষ্টি হত। বাধা দিলেই লোকে বরং এটা আরো খুঁটিয়ে দেখত। কিন্তু রাশিয়ার কথা জেনেও কী করে বড়-রা সাঁওতালদের দিয়ে তাঁরি আশ্রমে এই মানুষ-পূজার তালিম দিতে পারলেন, এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। কবি সেদিন মুহ্যমান হয়ে

ধিক্কারের ভাষাই শুধু খুঁজছিলেন। উল্লিখিত ছাত্রটি পরে শান্তিনিকেতনে গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হন। এই স্মৃতি তাঁর মনে বিশেষভাবেই রেখাপাত করে।

মূর্তি-পূজকদের দেশে মানুষ-পূজার এই প্রক্রিয়া নূতন নয়, এতে অভ্যস্ত দেশীয় লোক-দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বিশেষ দোষাবহও ঠেকে না। কিন্তু কবি তাঁর আশ্রমের জন্য সেদিন বিশেষরূপেই চিন্তিত হয়েছিলেন। কোনো প্রতীক বা তাঁর নিজেরও স্মৃতিপূজা তাঁর আশ্রমে কোনোদিন চলবে না,—এই রেখে গিয়েছেন বিশেষ অনুশাসন। কারণ, এরকম পূজা জড়বাদের নিদর্শন হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনুরাগীদের একান্ত শ্রদ্ধার বস্তু হলেও কবির প্রয়াণের পর তাঁর শ্মশানভস্ম পাত্রটিও কবির মৃত্যু-পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী তাই 'রবীন্দ্র-ভবন' হতে অপসারিত হয়েছে।

পূজাগৃহদ্বার শান্তিনিকেতনে সবদিকেই অবারিত। জীবনের হেন দিক নেই, মানবসভ্যতার হেন পরিচয় বা ক্রিয়াকলাপ কমই আছে, যা তাঁর সাধনায় সংগৃহীত না হয়েছে ও তাঁর যজ্ঞকে পূর্ণাঙ্গ দানে সাহায্য না করেছে। 'গণেশ-মূর্তি' ও তার ঐতিহ্যের গবেষণা নিয়ে একালের এক ইংরেজী-শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির এক জীবন কেটে গেছে রবীন্দ্রনাথের গোচরেই—এই শান্তিনিকেতনে।

বস্তুবাদের নানা শাখার আলোচনাতেও সেখানে অশ্রদ্ধা নেই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্তভাবে বস্তুসম্ভার ও যন্ত্রবিজ্ঞানের যোগে যতদূর অবধি সংসারযাত্রা সুনির্বাহ করা যায়, সে-দিকে চেষ্টা আছে বিলক্ষণই। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সমস্ত কিছুর মধ্যে শান্তিনিকেতনের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে একটি সার্থকতার লক্ষ্যে। সে লক্ষ্যটিকে সুনির্দিষ্ট ক'রে কবিই বলেছেন,—"যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করতে হবে। যে-ভোগে সর্বমানবের ভোজের আহ্বান আছে সভ্যতার স্বরূপ আছে তার মধ্যে। কিন্তু রিপু অতি প্রবল, সাধনা অতি দুরূহ। সেই কারণে এই সাধনায় যতদূর সিদ্ধিলাভ করা যায়,

মনুষ্যত্বের গৌরব ততদূর প্রসারিত হতে থাকে, ব্যাপ্ত হতে থাকে তার সভ্যতা।"

সর্বমানবের ভোজের আহ্বান আছে, এমন ভোগের আয়োজনেই তিনি যত্নবান ছিলেন। শান্তিনিকেতনের সাধনাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনি সেই লক্ষ্যের দিকেই। নামের মোহে, অর্থের মোহে নিজেকে কেন্দ্র করে স্বার্থের যে-কোনো আয়োজনেই এই সাধনা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কাশীর টোলের 'শাস্ত্রী' হয়ে ব্রাহ্মণ এলেন শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত অধ্যাপনায়। কঠোর নৈষ্ঠিক। সন্ধ্যা-আহ্নিকে বাধা পাননি কোথাও, কিন্তু পূজা-অর্চনায় পাননি কবির উৎসাহ। তিনিও তা নিয়ে কিছু বাহাড়ম্বর করেননি। তিনি পড়াশুনায় যখন আগ্রহ দেখালেন, কবি তাঁকে খুলে দিলেন এক বিরাট শাস্ত্রাগার। ছাত্র পড়াবার সঙ্গে সংস্কৃতের পণ্ডিত উদ্যোগী হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা দিলেন। একদিন কবিকে দেখেন দুয়ারে হাজির। হর্ষোৎফুল্ল মুখ। সোল্লাসে কবি তাঁকে জানালেন,—মশায়, আপনি ফেল করেছেন। লোকে জানায় পাশের খবর, আমি আপনার হারের কৃতিত্ব জানাচ্ছি। এ আমাদের ভাগ্য, নইলে আপনাকে আমরা হারাতাম, আপনি ধাপে ধাপে পাশ করে ঠেকতেন গিয়ে কলেজের পণ্ডিতিতে। এবারে ও-পথ ছেড়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বস্থন ভারতীর পূজায়। ও-পথ আপনার নয়। কী যে খুশি হয়েছি বলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ কবির কাছে ছিল বিদ্যার ক্ষেত্রে জড়ের পুজোর সামিল। তা'তে অসীম জ্ঞানান্বেষণের দিকে মনকে মুক্তি না দিয়ে, সাধারণত চাকরি-বাকরির মামুলি-গণ্ডিতে ঘুরপাক খাওয়ায়। সেদিন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কবির প্রভাবে প'ড়ে তাঁরি যুক্তি ধরে জ্ঞানের পথই বরণ করেন এবং কালে বিশ্বের 'সর্বমানবের ভোজের আহ্বান'-স্থলে একজন প্রবীণ পরিবেশকের স্থান গ্রহণে সমর্থ হন।

(৭)

১৩৩৪ সনে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর ভারতের নানাদেশ ভ্রমণে রত ছিলেন। সে সময়ে শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সঙ্গে থেকে কবির বাণী সংগ্রহ করে রাখেন। সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের অপূর্ব গ্রন্থ তাঁর 'দ্বীপময় ভারত'। তার ভিতরকার একটি বাণী এস্থলে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ

"পার্থিব শক্তি আর ঐশ্বর্য নিয়ে এখন মারামারি কাড়াকাড়ি চলেছে, যেদিক দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; সারা জগৎ এই material দিক্‌টা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল হবে না; কিন্তু মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনই যাদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তাঁরা যদি এই intellectual আর spiritual দিক্ দিয়ে মিল করবার চেষ্টা করেন, তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরও সমাধান হতে পারবে।" (পৃ ৩১২-১৩)

মূলে এই intellectual আর spiritual দিকের সাধনার রূপই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। কবি বলেছেন,—

"I love my God, because he gives me freedom to deny him."

নিরীশ্বরতা বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের কাছে আস্তিকতারই অন্তর্গত একটি বিশেষ স্তর রূপে গৃহীত হয়েছিল,—পূর্ণতায় পৌছবার পথে এ সবই এক-একটি অবস্থা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের তথা শান্তিনিকেতনের ঈশ্বর রয়েছেন বিজ্ঞানীর নীতিস্বরূপকে স্বাঙ্গীকৃত ক'রে। তার উপরেও পূর্ণতর তিনি প্রেমরূপে। তাঁরই কথায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

এই প্রেমের জন্যই, নানা মানুষের আপাতবিরুদ্ধ নানা মত থাকা সত্ত্বেও মানুষকে পূর্ণেরই অঙ্গ জেনে নানা সময়ে কবি তাদের আশ্রমে স্থান দিয়েছেন—

সম্ভবমতো সহ্য করেছেন সেই নানা লোকের নানা চালচলন। তাতে শিক্ষা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে কারও যদি মনে হয়, তাঁর প্রতি অনুরোধ এই,—তিনি যেন আশ্রমে আধুনিকতা বা পৌরাণিকতার প্রভাব বিচার করবার আগে কবির পুরাতন (১৩০৯) ও আধুনিক (১৩৩৮) কালের পূর্বোদ্ধৃত পত্র দুখানির নীতি ও প্রেমমূলক বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। নীতিধর্মের বিচারে কোথাও কিছু ক্ষীণতা যদি দেখাই গিয়ে থাকে, তাও আশা করি আরও বেশি সার্থকতার মূল্য পাবে—যখন আমরা দেখতে পাব,—কবির শেষজীবনের অনুভূত ও ব্যাখ্যাত 'সর্বাস্তিবাদ'-এর মর্মস্থল। সর্ববিষয়প্লাবিনী এই প্রেমই ভালোয়-মন্দে সকলের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতনের ক্রমবিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মাপকাঠি রেখে গেছেন তাঁর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-রচনায় (১৩৪৮ আষাঢ়)। তাতে আমরা দেখতে পাই, তিনি একস্থলে বলছেন "…আশ্রমের যারা শিক্ষক হবে তারা হবে মুখ্যত সাধক আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।" এই 'সতীশ' হচ্ছেন স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়। তিনি ঈশ্বরসাধকের চেয়ে বেশী খ্যাত কবি এবং বিশ্বপ্রকৃতির রসসাধক কবি ব'লেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সাহিত্যের…ভাবরসকে তিনি উপভোগ করিতেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে।…সতীশ এমন প্রবল ভোগী ছিলেন অথচ আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল।" প্রকৃতির এই রস-সাধক শান্তিনিকেতনে ঈশ্বর-সাধকের মতোই শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সেখানে প্রতি বছর মাঘীপূর্ণিমায় তাঁর স্মরণোৎসবে সাহিত্যসভা হত।

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বশান্তি

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বশান্তি

যেখানে বিশ্ব একটি নীড়স্বরূপ হয়ে উঠে সকলকে মিলিয়েছে, কবির ধ্যানের সেই কেন্দ্র হচ্ছে শান্তিনিকেতন। সেখানে বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর আশ্রমে বিদেশীদের বসবাসের অসুবিধে নিয়ে অভিযোগ শ্রবণে কোনো-একখানি চিঠিতে কবি আক্ষেপ জানিয়েছেন; আবার একটি চিঠিতে আছে অসুবিধে পেরিয়েও ভাব গ্রহণের অনুপ্রেরণায় বিদেশীরা যোগ জানিয়েছে এবং তা জেনে বেদনার সঙ্গে তিনি লিখছেন,—"বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিক মতো ঘটে ওঠেনি। অথচ ক্ষণে ক্ষণে যখন দেখি বিদেশের লোক এ জায়গাটার ভাবের ছবি দেখে গেছে, তাদের অনেক লেখাতেই সেটা পড়লুম, তখন মনের ভিতর একটা কান্না আসে, এই ছবিটিকে মুছতে দিয়ো না, এর দাম আছে, তোমার যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সজীব এখনো এর মধ্যে উৎসর্গ করো।" (৯ শ্রাবণ, ১৩৩৫)

শেষবার সুভাষচন্দ্র বসু যখন কবিসকাশে আসেন, বিকালে সিংহসদনের বাইরে সাধারণের জন্য এক সভা হয়। সেখানে তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন,—স্বাধীন ভারতই আন্তর্জাতিকতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিশ্বভারতীর জায়গা শুধু শান্তিনিকেতনের বিশেষ এই ভৌগোলিক সীমানাটিতে নয়, সে জায়গা রয়েছে সমস্ত লোকের প্রাণে প্রাণে। সেখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই তার আসল প্রতিষ্ঠা। সর্বজনীন এই প্রতিষ্ঠার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশ্বভারতীর আদর্শ লোপ পাবার নয়; এই বিশেষ জায়গা থেকে শান্তিনিকেতন উঠে যেতে পারে, কিন্তু যেখানেই লোক মানুষের মিলনের কাজ করবে সেখানেই সে জাগ্রত থাকবে। বিশ্বসভায় ভারতের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করবার জন্য বিশ্বভারতীকে আমাদের রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য ভারতবাসী মাত্রেরই কর্তব্য কিন্তু সে সঙ্গে স্বাধীনতার কথাও সমভাবেই

স্মরণীয়।—এই মর্মের ভাষণটি সেদিন উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের এই উদার আদর্শবাদ অনেকের মনেই সেদিন প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি, অনেকের মনে হয়েছিল, কবির আদর্শে এবং অনুরোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এতদিনে সুভাষ বুঝিবা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতির গোলমেলে পথ ছেড়ে দেবেন; সংস্কৃতির সাধনা অবলম্বন করে নেবেন বিশ্বভারতীর ভার।

তারপরে সুভাষের অন্তরীণ ও ক্রমে দেশ থেকে তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে কবির কণ্ঠ এপারে ওপারে অরণ্যে রোদন করে ফেরে বিশ্বশান্তিকামনায়; চার্চিল-রুজভেল্টের নিকটে তাঁর আবেদনপত্র পেশের কথা সুবিদিত। যুদ্ধ যা হবার হয়ে গেছে,—যুদ্ধ দিয়ে শান্তি আনবার কথা আজকেও অনেকের মন থেকে দূর হয়নি। তর্জন-গর্জন সমানই চলছে।

ইতিমধ্যে পট বদলেছে। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন একটি শক্তি। শান্তি-অভিযানে সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। বিশিষ্ট ভূমিকায় তার গতিবিধি। তার কথা আজ নিতান্ত ফেল্‌না নয়। সে কথাই তো এত কাল কবির কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়ে বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছিল ঐক্য, শান্তি ও সংস্কৃতির প্রগতি চেয়ে। স্বতই মনে হয়,—কবি বেঁচে থাকলে আজ কী বলতেন।

কবি দ্রষ্টা, বাণী তাঁর চিরন্তন। কালে কালে সে-বাণী থেকেই লোকের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে হবে। 'টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি'র মধ্যেও অবিচলিত শ্রদ্ধা রেখে চলা চাই আত্মার নিত্য সম্পদে। বিশ্বমৈত্রীর সাধনায় সকলকে দেশকাল নির্বিচারে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে হবে। শান্তিনিকেতনের এই আদর্শের কথা আমেরিকায় বাসের কালে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে। পত্রখানি এই—

কল্যাণীয়েষু

সু, তুই আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিস শুনে খুব খুশি হয়েছি। একদিন আমাদের আশ্রম যখন ছোট চারাগাছ ছিল তখন ওকে বেড়া দিয়ে ঘিরে

রেখেছিলুম। তখন ও কেবল আমাদের দেশের জিনিস ছিল। এখন বেড়ে উঠে দিকে দিকে ওর ডাল ছড়িয়েচে। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে ওর যোগ। এই কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক মত বুঝতে তোদের হয়ত কিছুদিন দেরী হবে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের ঘের আজকাল কাঁটাগাছের বেড়ার মত অত্যন্ত ঘন এবং প্রখর হয়ে উঠেচে—খোলা আকাশ থেকে যে আলো সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে সেই আলো এই সব জঙ্গলে আটকা পড়ে। ভারতের যে বাণী উপনিষদের যে বাণী বুদ্ধদেবের সেই বাণী এখানকার ঘোরতর হট্টগোলের মধ্যে আমার হৃদয়ে এসে পৌছায়। তা না হলে এখানকার গোলমালে আমার মনকে তলিয়ে ডুবিয়ে দিত। আমি এদের টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি যতই দেখি ততই বলি এর মানে কি? ততঃ কিম্! যে শান্তি অন্তরাত্মার যে সম্পদ নিত্যকালের তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্চে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণ-রূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেচে। পশ্চিম ভূভাগ কামান-বন্দুকের আয়োজন করুক—যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। এইজন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' **ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক, সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।** আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে মানুষ। আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেচি। তারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর্—হৃদয়কে উন্মুক্ত কর—শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না উঠে। আমি এখান থেকে শান্তি-নিকেতনে পৌছবার রাজপথ তৈরি করতে বসে গেছি তাই এত দেরি হচ্চে—

যখন সে পথ খুলে যাবে তখন আমার এই তীব্র প্রবাসদুঃখ সার্থক হবে। ইতি ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২০।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, "Letters to a friend" গ্রন্থে একই সময়ে এণ্ড্রুজকে লেখা নানা পত্রে কবির অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

(২)

নানা চেষ্টার মধ্যে সকলের উপরে রক্ষা করে চলতে হবে,—শান্তি। স্পষ্টই লিখেছেন,—

London
October 18th. 1920

Santiniketan is there for giving expression to the Eternal Man—*Asato ma Sat Gamaya*, the prayer that will ring clearer as the ages roll on, even when the geographical names of all countries are changed and lose their meaning. If I give way to the passion of the moment and the claims of the crowd, then it will be like speculating with my Master's money for a purpose which is not His own.

I know that my countrymen will clamour to borrow from this capital entrusted to me and exploit it for the needs that they believe to be more urgent than anything else. But all the same, you must know that I have to be true to my trust. **Santiniketan must treasure in all circumstances that Shanti which is in the bosom of the Infinite.**

আর-একখানা পত্রে লিখেছেন—

New York
November 4th. 1920

We must clearly realize this fact, that the name of Santiniketan has a meaning for us, and this name will have to be made true. I am anxious and afraid lest the surrounding forces may become too strong for us and succumb to the onslaught of the present time. Because the time is troubled and the minds of men distracted, all the more must we, through our Ashram, maintain our faith in Shantam, Sivam, Advaitam.

(এণ্ড্রুজকে লিখিত)

সংসারের জটিলতা ও অশান্তিকে কবি অস্বীকার করেননি। উল্লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানির আরম্ভেই তিনি লিখেছেন,—'I do not mean to say that there is anything wrong in politics, but only that is out of harmony with our Ashram.'

কবির সাধনা যে শান্তি ও সরলতার পরিবেশে অনাড়ম্বর নিষ্ঠায় উদ্‌যাপিত হবার কথা, তার ধারা রক্ষা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

বহুদিন পূর্বে ৩০শে আশ্বিনে একবার আশ্রমে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন হয়। রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়ে তাকে সংকীর্ণ পথে পরিচালিত করবার উপক্রম করে। কবি সে সময়ে একখানি পত্রে যে প্রেরণাটি ব্যক্ত করেন, তা আমাদের বিভ্রান্ত চিত্তকে আশ্বস্ত করে। বিরোধ ও অশান্তির মধ্যে চলবার পক্ষে তার থেকে আমরা এই মন্ত্রটি পাই,—"ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড় হয়ে ওঠে।"

বিরোধের ঘটনা চারদিকে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ যে সহিষ্ণুতা ও শান্তির আদর্শের অনুগত হয়ে চলেছে, এটা কেবল একটা রাষ্ট্রনৈতিক কূট চালের

ব্যাপার নয়, এর মধ্যে ভারতের মজ্জাগত চিরন্তন প্রেরণার অনিবার্য প্রভাব রয়েছে। আজ সত্য বা শান্তির বাণীতে কেউ বড়ো একটা কর্ণপাত করছে না, এতে আমাদের নিরুৎসাহ হবারই কথা, কিন্তু কবি সেদিন বলেছেন—

"যদি লোকের কর্ণ বধির হয়, তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে—অন্ততঃ আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোমতেই আমরা না ভুলি—তার চেয়ে আর কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি। সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড়ো যে বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো"। শুধু ছেলেদের নয়, কালে কালে বিশ্ববাসীকে কবির এই কথাটুকু শোনাবার জন্য শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব রয়েছে। পত্রখানি আশ্রমের অধ্যাপক স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীকে লিখিত। নিম্নে সেখানি উদ্ধৃত হল :

"আগামী ৩০শে আশ্বিন তোমরা একটা উৎসব করতে চেয়েছ আমি তাতে সম্মতিও দিয়েছি। একটি কথা বলবার আছে।

ঐদিন সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করিনে—বস্তুতঃ সে ভাবটি ওজায়গার পক্ষে অসঙ্গত।

ছুটি পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তা হলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড়ো দিক থেকে, সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সংকীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না, আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে রাখিতে আত্ম-পর, শত্রু-মিত্র, স্বজাতি-বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড়ো হয়ে ওঠে—বিরোধের মাটির ভিতরেই যদি সে থেকে যায় তবে সে প'চে মরে। আমাদের রাখি-বন্ধনের বীজ বিরোধের থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে।

বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ-রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে, ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব—এইটেই আমাদের একটা দায়—বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিম, রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ, অন্য দেশের পোলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই—আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার, অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয়, তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না। যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে, তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব, আমাদের উপর এই আদেশ আছে। এখনকারকালে একথা বললে কারো কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না—অনেকে মনে করবেন এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ, কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। সত্যকে কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না।

তোমাদের আশ্রমে রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়ো দিন করে তুলো। বড়ো দিন মানেই প্রেমের দিন, মিলনের দিন—যে প্রেমে, যে মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকেই শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারব না। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, আঘাত পেয়ে, সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব, সকলকে নিয়ে এক হব—এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গবিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক

এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তা' হলেই এই দিনটি ভারতের বড়ো দিন হবে। তা' হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান—সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকাল-স্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তা' হলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি—সেইজন্যে ৩০শে আশ্বিনের মতো দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে—সেইজন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ, যা মহোত্তম, যা সত্যতম, তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। যদি লোকের কর্ণ বধির হয় তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে—অন্ততঃ আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোদিনই কোনোমতেই আমরা না ভুলি—তাঁর চেয়ে আর কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি। সে দিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড়ো যে-বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো। সেদিন সংযম পালন যখন হচ্ছে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়—এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।"

প্রায় এই সময়েই শান্তিনিকেতনকে কবি বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে গড়বার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি লিখছেন—"ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল-বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—**সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।** পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।" (১৯১৬)

আরেকস্থলে লিখেছেন—'আমরা মানব-বিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।…মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ ব'লে গ্রহণ করব।' (১৯১৬) গানেও পাই এই কথাই—

ধ্বনিল আহবান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসংগীত বাজে।
হেরো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গন শোভন মঙ্গল সাজে।
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্বপশ্চিম বন্ধু সংগম—
মৈত্রীবন্ধন-পুণ্য-মন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে॥

(৩)

মহাকবির উক্তি বারবারই আজ মনে পড়ছে—

দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কবি বেঁচে থাকতেই এই দেওয়া-নেওয়ার পথ প্রশস্ত করতে লেগেছিলেন, তার ইতিহাস আমাদের জানা আছে। দেশবিদেশ থেকে মনীষীরা তাতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সাংস্কৃতিক যোগের কাজে।

দেশের মনীষীদের মধ্যে যে-ক'জন একাজে অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু সেদিনো ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী কবির যোগসাধনার মর্ম হৃদয়ংগম করে সর্বান্তঃকরণে তাঁর কাজের সিদ্ধি কামনা করেছিলেন। একখানি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,—পূর্বপশ্চিমের দেওয়া-নেওয়ার যজ্ঞস্থলে ভারতের ও পাশ্চাত্যের ভূমিকা কী রকমের হবে। বাস্তব এবং

আদর্শগত ভাবে দুদিক দিয়েই যে ভারতকে চেনবার ও চেনাবার দরকার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ যে এই দু'কাজেরই মাধ্যম হয়ে বিরাজ করছেন,— অভিনন্দনবাণীতে এ কথা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সেদিন মুক্তকণ্ঠে বলে গেছেন।

পাশ্চাত্য ভ্রাতাদের লক্ষ্য ক'রে পত্রে লিখিত আচার্যের একটি বাণী আজ সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন, আজ পাশ্চাত্যের দিক থেকে ভারতবর্ষকে সমালোচনার সময় নয়, বোঝবার সময়, মিলন হচ্ছে আজ বড়ো জিনিস। মেলবার পক্ষে সমালোচনার চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে পরস্পর-পরস্পরকে উপলব্ধি করা; কার কী ভালো আছে, আগে সেইটির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চাই। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের এই সশ্রদ্ধ অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি দেখতে পেলেই সেখানে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি জন্মে। শুধু পূর্বপশ্চিমের নয়, আমাদের ভারতভূমিতে নিজেদের মধ্যে মেলবার প্রয়োজন বিলক্ষণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রেও আচার্যের কথাটির থেকে আমরা আলোক গ্রহণ করতে পারি।

আদর্শবাদ নিয়ে আমাদের ঘরে বসে থাকলে চলবে না,—বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের যোগ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; সমস্যার সংঘাতে সবাই বিধ্বস্ত। আমাদের যদি দেবার থাকে, তবে এসময় দেবার আছে অখণ্ড এক বিশ্বদৃষ্টি। খণ্ড খণ্ড রূপে বিভক্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্যকে এই অখণ্ডের রসে অনুপ্রাণিত ক'রে কোনো-একটা জায়গায় মিলনের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলা চাই। আচার্য বলেছেন,—'ভারত এই মধু বিতরণ না করিলে কে করিবে।' কিন্তু 'একের রস' বিলোবার আগে আমাদের করতে হবে—'বহুসামগ্রীর আহরণ।' কারণ 'বহুচয়ন না করিলে আমরা এই একরসে পরিণত করিব কোন্ অ-বস্তু? আর আমাদের ভাণ্ডার শূন্য থাকিলে বিতরণ করিব কি?'—বহু চয়নের বিষয়যোগের জন্যই আজ পাশ্চাত্যকেও আমাদের ঘরে নিয়ে ভালো করে জানতে হবে। সমস্যা উভয়দিকেরই, যেমন পূর্বের, তেমনি

পশ্চিমের। এ যে 'সমগ্র মানবজীবনের বিষম হেঁয়ালি।...কেহ কাহাকে ছাড়িলে ঘৃণায় হউক অবিশ্বাসে হউক বর্জন করিলে এ সমস্যার পূরণ হইবে না।' রবীন্দ্রবাণীর পাশাপাশি আচার্যের এই বাণী আমাদের সকলকে বিশ্বযোগের অপরিহার্যতা নির্দেশ করছে। শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় এককালে তাঁর সুদীর্ঘ শান্তিনিকেতনবাসের জীবনে পত্র-সংগ্রহের অভ্যাসে এই পত্রখানিও কবির কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। পাঠকবর্গকে তা উপহার দেওয়া গেল। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র—ভারতাকাশের সমুজ্জ্বল গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ অন্যতম। যে বিশ্বমৈত্রী ও সংস্কৃতির সাধনা বিশ্বশান্তির ভিত্তি, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর স্থাপনাও বিশেষ করে তারই প্রসারের জন্য। ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতীর পরিষৎ' সভার উদ্বোধন হয়। সেই 'যাত্রাশুরু'র দিনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন সে-সভার উদ্বোধনের ভার।

আশ্রমের তৎকালীন মুখপত্র 'শান্তিনিকেতন' নামক পত্রিকার ১৩২৮ সনের মাঘসংখ্যাতে ব্রজেন্দ্রনাথের সেই উদ্বোধনী ভাষণটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত রয়েছে। তার মধ্যে সেদিন তিনি বলেছিলেন,—'য়ুরোপে...রাজনৈতিক ভিত্তির উপর...শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে; এ হবে এবং হবার দরকারও আছে।... কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এ ছাড়া আরো অন্যদিকে চেষ্টা করতে হবে, কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নূতন humanism-এর religious movement হওয়া উচিত।......বিভিন্ন people-এরও conference হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালের কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না, সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।'

মনস্বীদের বাণী মিথ্যা হবার নয়। সামাজিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বন্ধুসংগম' এবং ব্রজেন্দ্রনাথের 'peoples-এর conference'-এর প্রাথমিক চেষ্টা দেখা দিয়েছিল শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বশান্তিসম্মিলনে', সেকথা সকলেরই জানা আছে। আচার্যের আর-একটি কথা বিবেচ্য। তিনি বলেছিলেন, 'যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার (ভারতবর্ষের) দেশ। ভারতবর্ষের ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সবজাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে। তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে—রাজচক্রবর্তী হয়েও—এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।' এর পরে আচার্য সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের message কী, এ কথার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর উল্লিখিত রাষ্ট্র-আদর্শের code-এর গুরুত্ব রাষ্ট্রচালক জওহরলালের আমেরিকার বক্তৃতায় অশোক-রাজত্বের উল্লেখে আরো প্রমাণিত হয়েছে। যাক্ সে কথা, আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের নিকটে লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথের পত্রখানির সম্পূর্ণ রূপ এই—

মহীশূর
২৪শে নবেম্বর ১৯২১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার পত্রের উত্তরে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ডিসেম্বর মাসে খৃষ্টমাসের ছুটিতে আমি দেশে যাইয়া কলিকাতায় হউক বা বোলপুরে শান্তিনিকেতনে হউক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনার প্রবাস সময়ে শান্তিনিকেতনে একবার গিয়াছিলাম—আপনার উপস্থিতিতে একবার যাইতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

Sylvain Levi মহাশয়ের সহিত লণ্ডনে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহোদয় লোক—তিনি শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন শুনিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি শান্তিনিকেতনে যথার্থ শান্তি আনিবেন ও পাইবেন। আমি শান্তি লইয়া যাইতে পারি নাই, কিন্তু তথাপি মহতী শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। তাহা কখনও ভুলিবার নহে।

আশা করি আমাদের দেশের মনীষীগণ বোলপুরে Sylvain Levi মহোদয়ের সহিত মিলিত হইবেন। তবে আমি নামজাদা মনীষীদের প্রতি বেশী ভরসা রাখি না। অনেককেই দূর হইতে বুঝিবার যত সুযোগ হয় নিকট হইতে ততটা হয় না। আমার ভয় পাছে অধ্যাপক লেভি আমাদের আগন্তুক, তুচ্ছতা ও কার্পণ্যবিকার দেখিয়া ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। তবে আপনি আছেন······আর ভারতের চাষা আছে। আর আছে বঙ্গজননী।

Heritage of India Series-এ Thompson যাহা আপনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা আমি পড়িয়াছি। সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার লেখালেখি চলিতেছে।

আমার মতে Europeএ সমালোচকের দল ভারতীয় সাহিত্য বা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সত্য ধারণায় পঁহুছিতে শীঘ্র পারিবে না। একধাপ অগ্রসর হইয়া দুইধাপ পিছাইয়া যাইবে। ভারত একটা মস্ত challenge to the rest of the world (অবশ্য ভারতের moplah বা nankhana Sikh মোহান্ত বা Political agitator নহে)। এই challenge সমুচিত ভাবে গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

এখন উহাদের সমালোচনার সময় নহে, বুঝিবার সময়। দুইটি ভারতপন্থীর একটিকে সহজে গ্রহণ করিবে, আর অপরটিকে হেঁয়ালি বলিয়া ত্যাগ করিবে ইহা সত্য হইতে পারে না। দুইজনেই ভারতবর্ষের 'Life elemental' 'Life Universal' প্রচার করিতেছেন। বহুরূপী বহুভোগী মানুষ ইহাতে তৃপ্তি আস্বাদ করিতে পারে না। বলে ইহা অপ্রাকৃত—অথবা monotonous and empty, শূন্য ও একঘেয়ে।

Thompson একবার Translation করিয়া দেখিতে চায়, দেখুক। কিন্তু শুধু Translation এর কর্ম নয়—Transvaluation চাই।

Europe ও Americaর প্রাকৃতজন masses-রা আর defeated peoples যাহারা ভোগপথের শেষে ফকিরী বা কপ্‌নি গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদের পক্ষে Life elemental, life Universal যতটা নিকট, ততটা Renaissanceএর উত্তরাধিকারী সমাশ্বস্ত সাহিত্যিকদিগের পক্ষে নহে।

আমাদের পক্ষে কিন্তু Renaissanceএর বিচিত্র ভোগ নিতান্ত বিচিত্র নহে। ভারতে কত অগণিত ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সুতরাং বহুরূপে বহুরসে আমাদের রসভঙ্গ হয় না। তবে আমরা সেই খণ্ডরূপ ও খণ্ডরসকে বিশ্বরূপের একরসে পরিণত করি—সেইটা life elemental, life Universal। ভারত এই মধু বিতরণ না করিলে কে করিবে। তবে যাহাদের জীবন অত্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ তাহারাই মধু আস্বাদে মধুময় হইবে। মধু কিন্তু সকলের জন্য। কিন্তু বহু সামগ্রী আহরণ না করিলে—বহুচয়ন না করিলে—আমরা এই একরসে পরিণত করিব কোন অ-বস্তু? আর আমাদের ভাণ্ডার শূন্য থাকিলে বিতরণ করিব কি?

সুতরাং সমস্যা যেমন উহাদের, সমস্যা তেমনি আমাদের। সত্যই ইহা একই সমস্যা—সমগ্র মানবজীবনের বিষম হেঁয়ালি।

কেহ কাহাকে ছাড়িলে—ঘৃণায় হউক অবিশ্বাসে হউক বর্জন করিলে এ সমস্যার পূরণ হইবে না।

Thompson বঙ্গসন্তানকে বর্জন করিয়া বঙ্গের ঠাকুরকে লইতে পারিবে কি—ভারতপন্থাকে ছাড়িয়া ভারতপন্থীকে চিনিতে চিনাইতে পারিবে কি?

আপনার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

খামের উপর যে পোস্টমার্ক আছে, তা অক্টোবর মাসের। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পত্রখানি লেখা অক্টোবরে, কিন্তু আত্মভোলা দার্শনিক পত্রের

মধ্যে তারিখ বসাবার বেলায় স্বভাবসিদ্ধ বৈষয়িক ভ্রমের হাত এড়াতে পারেননি।

আচার্য যে কতদূর সত্যসন্ধ ছিলেন, আজকের দিনে তার প্রমাণ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বঙ্গের ঠাকুরকেই টমসন্ নিয়েছিলেন, বাংলাদেশ ও জাতিকে তার ভাষা ও জীবনের সব দিক দিয়ে ভালো করে না জানা থাকায় বঙ্গসন্তান-টিকে তিনি সম্যকরূপে নিতে পারেন নি, – ভারতপন্থার সন্ধান না রেখেই তিনি ভারতপন্থীকে চিনতে ও চেনাতে গিয়েছিলেন ; তাতেই শেষাবধি তাঁর অনুবাদে কিছু দুর্বিপাকও ঘটেছে। আধুনিক বিলাতী সমালোচনা-আসরের আনাচে-কানাচে তার বেসুরো আভাস গুঞ্জরিত। তবু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগের কাজে টমসনের চেষ্টার মূল্য কিছু স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই ঘটনা থেকেই আরো হুঁশিয়ার হওয়া দরকার হচ্ছে। ভারত-পরিচয়কে আয়ত্ত ক'রে তবে এগোতে হবে যোগের কাজে, এবং ঠিক এই কথাই খাটবে আমাদের দিক থেকে পাশ্চাত্যের লোকদের চেনবার ও চেনাবার আগে। পাশ্চাত্যধারাকে সর্বাঙ্গীণভাবে শ্রদ্ধাসহকারে জানা চাই। কারো প্রতি কারো বিজাতীয় অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য বা অজ্ঞানতা থাকলে তাতেই অশান্তি ঘনিয়ে আনবে।

শ্রদ্ধাসহকারে জানবার চেষ্টাতেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজজীবনের মধ্যে গিয়ে সে দেশবাসীর গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। এজন্য কয়েকবারই তাঁর জীবনে পাশ্চাত্য তথা বিশ্বভ্রমণ ও প্রবাসবাসের ঘটনা ঘটেছে। সে-ইতিহাস সম্পূর্ণ লেখা হয়নি, কিন্তু তা খুব দরকারী একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। কী আকুল প্রেরণায় তিনি বিশ্বযোগপ্রয়াসে উদ্বোধিত। নিজের কথা নিজের মধ্যে আর যেন ধরে রাখতে পারছেন না, বক্তৃতা, রচনা, আলাপ-আলোচনায় তার বেগ যথেষ্ট পথ পাচ্ছে না,—এই উদভ্রান্ত বেদনার ইতিহাসই ধরা দিয়েছে তাঁর শান্তিনিকেতনবাসী সামান্য একটি ছাত্রকে লেখা ছোটো একখানি পত্রের বড় কথায়। সেদিন তাঁর বিশ্বভারতীয় চেতনার আবির্ভাবের দিন। সে সব কথা বলা চাই, কিন্তু কী কথা কাকে কী উপলক্ষে বলছেন সেদিনের বাস্তবে সেকথা

কেমন শোনাবে, সে সব অত বিচার নেই। সেকথা এণ্ড্রুজকেও বলে চলেছেন, বলছেন একটি ছাত্রকেও। আমাদের আজ বারেবারেই তা স্মরণ ও অনুধ্যানের বিষয়। কারণ সে পত্রের ভিতরেই প্রাণযোগের শাশ্বত সেতু তৈরী হয়ে পড়ে আছে।

(৪)

শান্তিনিকেতনকে তিনি গড়ে রেখে গেছেন বিশ্বযোগের ক্ষেত্র ক'রে। আজো বাইরে থেকে অতিথি-অভ্যাগত বন্ধু-বান্ধব যাঁরাই এদেশে আসেন, একবার তাঁরা শান্তিনিকেতনে না এসে যান না।—ভারত সরকারও তাঁদের ডেকে এনে যে-ঘরে বসিয়ে স্বস্তি বোধ করেন, ভারতের সেই চিত্ত-ঐশ্বর্যের সাধনা ও সংগ্রহাগার হচ্ছে শান্তিনিকেতন।

আনন্দের বিষয়, ভারত-রাষ্ট্রকর্ণধার জওহরলাল আজ এই সংস্কৃতি-সাধনকেন্দ্রেরও কর্ণধাররূপে বিরাজ করছেন। সুতরাং ভারতরাষ্ট্র যে সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়েই বিবর্ধমান, এ সত্য বিশ্বাস করতে বাধা নেই। এখন শান্তি-নিকেতনের দায়িত্ব নিয়ে ভাবনার কিছু নেই বলেই ধরা যেতে পারে। অনেক দুর্যোগের মধ্যে এটি একটি সুলক্ষণই বলতে হবে। অবশ্য পূর্বে থেকেই মহাত্মাজীর অনুরাগ শান্তিনিকেতনকে ঘিরে থেকে কবির ধ্যানের সত্যের প্রতি লোকের বিশ্বাসের ভিত্তিকে অনেকটা শক্ত করেছে।

শান্তিনিকেতনের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেই মাহাত্মাজী তাঁর জরুরি রাষ্ট্রব্রতের মধ্যেও এই তীর্থপরিক্রমায় ত্রুটি ঘটাননি। আফ্রিকার ব্রত উদ্‌যাপন-অন্তে ভারতে পদার্পণ করে তিনি প্রথম আশ্রয় করেছিলেন শান্তিনিকেতনের পর্ণকুটীর। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ-বর্ণিত ভারতপন্থা ও ভারতপন্থীদের এটি একটি স্বাভাবিক অথচ সূক্ষ্ম লক্ষণ এবং অমোঘ পরিণতিও বটে।

এইখানে, মধুর স্মৃতিবাহী আরেকখানি পত্র সংকলিত হচ্ছে। পূর্বোক্ত সুহৃৎবাবুর নিকটেই সেখানিও পাওয়া গেছে। একখানি পোস্টকার্ড, তাতে আছে আমেদাবাদ থেকে প্রেরিত প্রাক্তন শান্তিনিকেতন-প্রবাসী ফিনিক্স-স্কুলের

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাক্ষরযুক্ত প্রীতিসম্ভাষণ-বাণী,—একটি ধার ঘেঁষে স্বয়ং গান্ধিজীর হিন্দী স্বাক্ষরটিও তাতে দেখা দিচ্ছে। তখন তিনিহিন্দী সবেমাত্র শিখছেন। ১৯১৫ সনের কথা। তখন সুহৃৎবাবু শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তাঁর সঙ্গে এঁদের যোগ আন্তরিক হয়ে উঠেছিল। দূরে গিয়েও শান্তিনিকেতনকে যে এঁরা কিরূপ কাছের ক'রে দেখছেন, একটি ছাত্রের সূত্রে শান্তিনিকেতনের প্রতি সেই ঘনিষ্ঠতাই এতে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাক্ষরগুলির মধ্যে এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, মগনলাল গান্ধী, রামদাস গান্ধী ও দেবদাস গান্ধীর (বাংলা স্বাক্ষর) নাম লক্ষ্যণীয়।

কালের খেলায় আজ এঁদের মধ্যে সকলেই প্রায় লোকান্তরিত। শান্তি-নিকেতনের সহিত গান্ধীজীর সেই সুদূরকালের জীবন্তযোগের একটি চিত্রকে আজকে এই পত্রখানি অস্পষ্ট অক্ষরের মায়াকুহকে মণ্ডিত ক'রে তুলছে। দেখা যাবে, সকলের স্মৃতিপটে ইতিহাসের পর্যায়গুলি ক্রমোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তার মধ্যে কথা বেশি কিছু নেই,—এক পিঠে আমেদাবাদ গুজরাট কলেজের ছবি অন্যপিঠে অর্থাৎ ঠিকানা লেখবার পিঠের আধখানটায় শুধু লেখা রয়েছে—

Ahmedabad,

Greeting from us all.

এ লেখাটুকু অবশ্য পিয়ার্সনের হাতের।

বিশেষ একটি ক্ষণে এই চিহ্নটুকু বেয়েই প্রাণে-প্রাণে নেমে আসবে একটি মহতী প্রেরণা, অলক্ষ্যে লক্ষ আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর বাণীর মধ্য দিয়ে এক মহাভারতেরই চিরন্তন আহ্বান ভেসে আসছে। তাঁদের বাণী শুধু কেবল তাঁদেরই কালের সীমাঘেরা একটা সংকীর্ণ দেশকালের বাণী নয়। সেই বাণীর শাশ্বত সত্যের প্রমাণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এ যুগের মননশীল নবীন আগন্তুকদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে। রাষ্ট্রীয় যোগের সঙ্গে সঙ্গে এক মানবিক যোগের আয়োজনের আবশ্যকতার কথা সেদিনে যেমন আমাদের পুরোধারা বলেছেন।

আজকেও যে সে কথার মূল্য কত, তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে এবং বিশ্বের আধুনিক পরিস্থিতিকে আমাদের সামনে ধরে দিয়ে বিচার-বিবেচনার সুযোগ দান করবে, এমন একখানি পত্রের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুরক্ত এবং—দেশ-জাতি-নির্বিশেষে—বিশ্বমানবতার সাংস্কৃতিক পথের যোগসাধক ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সম্প্রতি আছেন আমেরিকায়; বড়ো একটা বিচিত্র মেলামেশার মধ্যে থেকে মানুষ ও সভ্যতার হালচাল তিনি খুব কাছে থেকেই প্রত্যক্ষ করছেন। এই আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শান্তিনিকেতনে কোনো তরুণ বন্ধুকে অমিয়বাবু লিখেছিলেন—

Education Department,
Embassy of India.
October 11, '49
2107, Massachusetts Avenue N.W.
Washington D. C,
as from : Howard University
Washington, D. C.

প্রিয়বরেষু

বহুদিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু আমরা পথের ধূলো সঞ্চয় করতে দূর দূরান্তে ঘুরছিলাম, সম্প্রতি মার্কিণ 'রাজ'-ধানীতে পৌচেছি। মেক্সিকো আমাদের কাছে নূতন সভ্যতা, যদিও তার প্রাচীনতাই আমাদের কাছে অধিকতর চিত্তগ্রাহী এবং বিস্ময়কর, সেই দেশে গিয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এখনো সেই মায়া এবং আজটেক সংস্কৃতির হাওয়া ওখানকার লৌকিক আচারে, আতিথ্যে, বিচিত্র সৌন্দর্যশীলতায় নিয়ত অনুভব করা যায়; পুরোণো পিরামিড্ গৃহভিত্তি এবং শত সূক্ষ্ম ব্যবহার-শিল্পে সেই লুপ্ত মহাকালের স্পর্শ এসে পৌছয়। সেখানে মনস্বী আর্টিস্ট ডিয়েগো রিভেরার সঙ্গে আমাদের অনেক সময় কেটেছে

—তিনি নূতন কালের অগ্রদূত, কিন্তু তাঁর চিত্রের মূল মেক্সিকোর বিস্মৃত মাটিতে। শৈলগ্রামে উপত্যকায় সমুদ্রতীর লোকালয়ে আমরা তিনজনে ঘুরেছি; হাটেবাজারে ক্যথলিক গির্জার ছায়ায় এবং মেক্সিকান ইণ্ডিয়ান্ সমাজের নিভৃত পরিবেশে আমরা সময় কাটিয়েছি, তারপর প্রশান্ত-সাগর পাড়ায় ক্যালিফর্নিয়ার কেন্দ্রে হাক্সলির ওখানে এবং অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাপ-আলোচনা জমেছিল; চোখের ও মনের আনন্দিত বহুবিচিত্র ছবি সংগ্রহ করে, কলোরাডো এবং অন্যান্য প্রদেশ পার হয়ে সবেমাত্র আমাদের তীর্থ শেষ হল।

এখানে এসে অবধি শ্রীবিজয়লক্ষ্মীর আহ্বানে Embassyতে প্রায়ই অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে—জওহরলালজীর আগমন উপলক্ষ্যে নানাভাবে আয়োজন করতে সকলেরই সহায়তা প্রয়োজন। তিনি যাতে সৌধবিলাসী ডলারপতি মার্কিণের রাজ্যে লাল শালুর উপর দিয়েই সবখন ভ্রমণ করতে বাধ্য না হন, মধ্যে মধ্যে সাধারণ এবং অসাধারণ অন্যজাতীয় আমেরিকান ও মার্কিণবাসী বিদেশী মনীষীদের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন তার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হবে এবং সম্ভবত টমাস মান্ জওহরলালজীর সঙ্গে দেখা করতে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে আসবেন—লস্ আঞ্জেল্‌স্ শহর অবধি নেহেরু যাবার সময় পাবেন না। এ দেশের শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের বেশির ভাগই জগতের দুই বড়ো রাষ্ট্রিক দৈত্যের কোনো পক্ষেই নন—তাঁরা জওহরলালজীকে যা বলবেন তা ডিপ্লমাট্‌দের প্রতিধ্বনি নয়। এখানে এসে জওহরলালজীর পক্ষেও মস্ত পরীক্ষা, ভারত ভাগ্যেরও পরীক্ষা, জগতের সংকটকালে তিনি এদের দেশে আসছেন। চতুর্দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধন বাণিজ্যের নানারঙের প্রলোভন তাঁকে ঘিরে ধরবে—কিন্তু যে দরিদ্র, স্বাধীন, আদর্শিক এবং নবপথে উদ্যোগী ভারতবর্ষকে তিনি ফেলে আসছেন তাকে তিনি ভুলবেন না। পশ্চিম বা কোনো বিশেষ রাষ্ট্রিক বা ভৌগোলিক খণ্ডের ঐশীশক্তি তাঁকে বশ করবে না—মহামানবের বড় ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের মিলতে না পারে কিন্তু সেই মহাদেশের প্রতিভা বৃহৎ সভ্যতা যে বহুজনগণের জীবন

সাধনাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠছে তার প্রতি শত্রু হওয়া মানুষেরই শত্রু হওয়ার সমতুল্য। আজ জওহরলালজী এখানে এসে পৌছলেন। খুব হৈ চৈ উৎসাহ আনন্দ শুরু হল, এখন ক'দিন সবাই নানা আয়োজনে ডুবে থাকবে। মার্কিণ ডলার এবং ভারতীয় টাকার যে বৈষম্য সৃষ্টি হল তাতে আপনারা বেশ কিছুদিনের মধ্যে এই কুবেরের দেশে আসবেন কী ক'রে? আমরা পূর্বেই এসে পড়েছিলাম তাই আছি। যদি কোনো সুযোগ হয় তো জানাব। যে ভারতবর্ষের বিষয়ে এরা জানতে চায়ে তাতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়েই ওদের উৎসাহ। আধ্যাত্মিক ধর্মকে মানুষ তার সৃষ্টিশীল বিচিত্র বিশ্বকর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবে না—সাধনার মধ্যে যে পরম সহজতা এবং সর্বজনযুক্ত প্রাত্যহিকতার মহিমা তা ভারতবর্ষেই ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছিল। তারই সন্ধান গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন ঋষির মধ্যে এরা দেখতে চায়। সেই সাধনার সঙ্গে চাষবাস, গৃহকর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আত্মিক যোগ আছে। সেই ভারতবর্ষকে নূতন কালের হাওয়ায় মননে আপনারা বিশ্বের কাছে পরিচিত করুন। আপনাদের লেখনীর কাছে আমাদের এই দাবি।

প্রীতি নমস্কারান্তে ভবদীয়
অমিয় চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"

রবীন্দ্রনাথের "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্র বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ছিল আন্তর্জাতিক। জাতীয় রাষ্ট্রের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত হল। এতে বৈষয়িক দিক, বিশেষ করে আর্থিক দায়িত্ব পাকা ভিত্ পেল, এমন আশা করা অন্যায় হবে না। কবিকে বার্ধক্যে পর্যন্ত এই অর্থাভাব মেটাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে হয়েছিল। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-রচনার আরও অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। মানব-সংস্কৃতি সেদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতীর প্রসার এবং নিরাপত্তাবিধানই ছিল তাঁর শেষজীবনের প্রধান চেষ্টা। এই চেষ্টা করাকে তিনি ক্ষতি বলে গণ্য করেন নি। কিন্তু আজকের পথের চেষ্টার কথা সেদিন তাঁর একবারও মনে হয় নি। তিনি সাহায্য চেয়েছেন। চেয়েছেন সকলেরই কাছে; ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র সকলের সাহায্য ও সহযোগের দ্বারাই বিশ্বভারতীর মিলন-সাধনা সার্থক হবে। সেই তো সমন্বয়ের পথ, তার জন্য কোথাও সে বাঁধা পড়বে কোনো সুবিধার আশায়, একথা কবি ভাবেন নি কস্মিন্‌কালেও। বিশ্বভারতী বিশ্বজনের। তাঁর একার সাধনায় তিনি যে-সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাকে সকলের সম্পদ করে সকলের হাতে তুলে দিয়ে যাবার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন তার সার্থকতা। ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র কবির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তৎসত্ত্বেও একটি আশঙ্কা থেকেই যায়। দেশের পরিচালক রাষ্ট্র নানা সময়ে নানা মতের হতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানতে গেলে বিশ্বভারতীও কি নানা সময়ে নানা মত ও দলের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে? তখন কবির আদর্শ রক্ষা পায় কী করে?

কবির পথ ছিল রাষ্ট্রনিরপেক্ষ। এমন কি, কোনো বিশেষ ধর্মের মুখাপেক্ষীও তিনি ছিলেন না। যার যেটুকু দেবার, যার থেকে যেটুকু নেবার সে দেওয়া-নেওয়া ঘটত যার-যার নিজেরই গরজে। বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ওঠে নি।

আজও যে সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এমন নয়। তবে রাষ্ট্রসংস্রব ঘটায় সে প্রশ্ন একদিন ওঠা বিচিত্র নয়, বিশ্বভারতীর বাস্তব সত্তা এইটুকু সম্ভাবনার মধ্যে এসে দাঁড়াল, তা বলতেই হবে।

কবির অবর্তমানে অন্য কারও একার বা সংঘগত সবার চেষ্টার মধ্যেও কবির ব্যক্তিত্বের অভাব মেটে নি; প্রতিভার অভাব পূরণের তো কথাই ওঠে না; পরিশ্রম বা পরিচালনাশক্তিরও তেমন পরিচয় বহুকাল হয়তো দুর্লভই থাকবে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা সাময়িক পরিবর্তন ঘটবে। সেই ফাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কবির আদর্শের মৌলিক কোনো পরিবর্তন বিশ্বভারতীতে যাতে না ঘটে, সেই দিকে সকলেরই অবহিত থাকা কর্তব্য।

(২)

সার্বভৌমত্বই যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আদর্শ ছিল, তা বিশ্বভারতীর আদর্শ-ঘোষণা-পত্রের প্রথম সূত্রটিতেই জানা যায়। তাতে লেখা আছে—

"To study the Mind and Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view."

কারও সত্যকেই কবি বাদ দেন নি; এমন কি স্পষ্টই বলেছেন, পরস্পর-বিরুদ্ধ দিক থেকেও সত্যের পরিচয় পাবার জন্যই তাঁর এই বিশ্বভারতীর স্থাপনা।

এর পরে কবি বলেছেন, সব কাজই চলবে এক পরম সত্তার নামে; তাঁর পরিচয় কোনো বিশেষ নামে নয়, মূর্তিতে নয়—কবি বলছেন তিনি একটি শক্তি মাত্র, সে শক্তি শান্ত, শিব, অদ্বৈত,—এই তাঁর পরিচয়।

শুধু বিশ্বভারতীর আদর্শ নয়, কবির জীবন ও বাণীর আদর্শকে কবি সুস্পষ্ট দেখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত বাণীরূপে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এ। পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বেকার ঘটনা। ১৩১৩ সনে শান্তিনিকেতনে উপাসনার সময় একদিন কবি এই শব্দ কয়টির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন,—

"জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্র শক্তি মানুষের চোখে পড়ে।...শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়।...আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎ-প্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানব-সমাজের ধ্বংস। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য, প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ব হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তারপরে অদ্বৈতম্।...মঙ্গল কর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতা দ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান।

...আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি।"

কবির এই আদর্শের সাধনস্থলই হচ্ছে শান্তিনিকেতন। এই মন্ত্রের শব্দ-বিন্যাসের ক্রমপর্যায়ের সঙ্গে সাধনার ক্রমবিকাশের পর্যায়টিরও একটি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে প্রথমে শিক্ষার পত্তন হয় ১৯০১ সনে। সেটি ছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পর্ব। তারপরে

১৯২২ সন। বিশ বছর পরের ঘটনা। বিত্থালয়-স্তর পেরিয়ে গেল। পরিণত বয়সের সাধনা প্রসারিত হল বিশ্বভারতীতে। তখন শুধু সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরাই পড়ে না, বয়স্ক পণ্ডিত এবং কর্মীরাও মিলেছেন এসে দলে দলে। বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা, শিল্পচর্চা ও জনসেবায় তাঁরা রত। শিবম্-এর কর্ম-সাধনা তখন রূপ পেয়েছে। এই রূপ দিতে গিয়েই কবির জীবনও এসে পড়েছে শেষ সীমায়। তখন তিনি নিজে সাধনার যে স্তরে পৌছেছেন, তাঁর কাছে সত্যের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, সেটি অদ্বৈতের স্তর—সত্যের সেই রূপটি হচ্ছে—'সোহহং'। এ বিষয়ে কবির 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা—এই 'সোহহং'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারার ইতিহাস 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-ই পর্যায়ক্রমে বহন করে। কবি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বসত্তাকে উপলব্ধির একটি পর্যায় নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে এই মন্ত্রটিতে। পরম স্তর অদ্বৈতবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের কর্মজীবনের শেষ সীমা অবধি, কবির 'বিশ্বভারতী'র প্রসার; কবির 'সোহহং'-কে উপলব্ধির সেটি কর্ম-সোপান, কিন্তু শেষ সোপান নয়। সেখানকার পক্ষে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এর মতো মন্ত্রটি সাধন-শৃঙ্খলার পরম্পরা রক্ষা করে।

কিন্তু এই কথাটিকেই কর্তৃপক্ষ প্রথমে বর্জন করলেন। এর ফল ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে, বলা চলতেও পারে। তবে, কর্তৃপক্ষ যে আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই মন্ত্র বর্জন দ্বারা তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতিতেই ধরিয়ে দিলেন সন্দেহ, আপাতত ফল দেখা যাচ্ছে এইটুকু। কারণ মন্ত্র বর্জন আর কিছু করে নি, করে রাখল একটি নজির স্থাপন। এই নজিরের পথে ছোট বড় অনেক কিছু বর্জন বা সংযোজন কালের ধারায় ঘটতে পারে।

শোনা যায়, বেধেছে ধর্মমতে। ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। উপনিষদের মন্ত্র সাম্প্রদায়িকতার ছায়াবাহী! এজন্য সংবিধানে আদর্শগত কাজগুলিকে স্থান দিয়ে ভাষাটুকুকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপাত উদ্দেশ্য সাধু। কারণ

সার্বভৌমত্ব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, সার্বভৌমত্বের প্রসার কল্লেই এই বর্জন ঘটেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্বের অর্থ বা রূপটি কী। এটি কি বৈশিষ্ট্য বর্জন করে সার্বজনীনতার পরিপোষক?—এগুলি জানবার বিষয়। কবির জীবিতকালে বিশ্বভারতীর ঘোষণাপত্র থেকে তিনি তো এ মন্ত্র বর্জন করেন নি। যে-দেশে, যে-ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে যে-বাণী উদ্গত হয়েছে, তাকে নির্বিচারে সাম্প্রদায়িকতার কোঠায় ফেললে, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং মূল রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষ দেশের বিশেষ জাতের মানুষ বলে বাদ দিতে হয়। ভারত-ঐতিহ্য এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। শাস্ত্রবাণী হলেও, তার ভিতর দিয়ে যদি উদার এবং যথাযথভাবে আদর্শের কথাটি ব্যক্ত হয়ে থাকে তবে তার সংরক্ষণই ছিল শ্রেয়। গ্রীক লাটিন ফরাসী ভাষার বিশেষ বচনগুলি ইংরেজী সাহিত্যে সচরাচরই মিলে; তাদের বিশেষ বিশেষ অর্থ অভিধানে বাঁধা আছে। তা জেনে নিয়েই গ্রন্থাদি পড়তে হয়। সেখানে না বাধলে, এখানেও সুস্থ বুদ্ধিতে কোথাও বাধবার কথা নয়। ভারতরাষ্ট্রেও হয়তো সেদিকে বাধে নি। কারণ তার ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের শিরোভূষণ—"সত্যমেব জয়তে"—এই বাণী। সেটিও তো শাস্ত্রবাণী এবং দেবভাষাই। তা হলে বাধবার কথা দেখা যায়, বাণীটিতে নিহিত ঈশ্বরবাদ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি নিরীশ্বরবাদীকেও কোনোদিন বর্জন করেনি। কিন্তু কবির পক্ষ থেকে কিছু বর্জিত না হলেও, পাছে এই মন্ত্রের জন্যই কবির সার্বভৌমিকতা পৃথিবীর কোথাও বাধা পায়—সেটুকু সম্ভাবনার সূত্র দূর করবার জন্যই হয়তো আসলে কর্তৃপক্ষের এই সতর্কতা। তাঁদের প্রয়াসের আন্তরিকতা অনুভবযোগ্য। কিন্তু তাঁদের বুদ্ধিতে হিতে বিপরীত না ঘটে। সতর্কতার পথই সাম্প্রদায়িকতার বোধ ও দাবিকে একদিকে না জাগিয়ে তোলে। সাম্প্রদায়িকতার একটা নূতন শুচিবাই এর থেকে প্রশ্রয় না পায়।

যা হোক, একালে যা করা হল, তার ফল অতঃপর একালে বা কালে-কালে ফলবে। রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন, এখন সেটির সম্যক্

পরিচয় পেতে হবে। আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় সকলের পক্ষেই সে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

(৩)

ধর্মে যখন চরম রকমের গ্লানি ঘটে, তখন নূতন ধর্মস্থাপনের প্রয়োজন হয়। ধর্ম যখন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন তার মধ্যে প্রাণসঞ্চারের ব্যাকুলতা জাগে। রবীন্দ্রনাথ যেমন এই ব্যাকুলতার একটি প্রকাশ, তেমনি একটি সমাধানও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যে সংযোগ,—এইটিকেই তিনি ধর্মরূপে স্বীকার করেছেন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীস্টান—এই সব প্রশ্ন তাঁর মনে বড় হয়ে জাগে নি, বরং যাঁরা নিজ নিজ আনুষ্ঠানিক ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে পালন ক'রেও মানুষের সঙ্গে মানুষের শাশ্বত সম্পর্ককেই বড় করে দেখেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল আন্তরিক।

সংসারের সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে সূর্যের মতো সংসারকে আলোকিত করবার জন্য আছে ধর্ম। ধন, মান, সুখভোগের পরিচয়ে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তার সেই পরিচয় হচ্ছে চরিত্রে, জীবনের ভাবদৃষ্টির উজ্জ্বলতায়। সেই দৃষ্টির আলোতে স্নাত উদ্ভাসিত হয়ে চলবে ব্যবহারিক যত নীতি। সে সব রীতিনীতি আচার-ব্যবস্থা সকলেরই চরম লক্ষ্য থাকবে—মানুষের মিলন; বহুর মধ্যে ব্যক্তিকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে তবে পাবে সে সার্থকতা।

বিবাদ-বিসম্বাদ ধর্মের মূল প্রেরণা নিয়ে কোথাও বাধে নি, যত বেধেছে তার নীতি বা তন্ত্রের প্রয়োগ ও প্রচার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করতে থাকে।...ধর্ম বলে মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয় ভাবে

অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়, ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"—(কালান্তর)

বৃষ্টির জল স্বচ্ছ নির্মল, কিন্তু মাটিতে পড়লেই তার বিশুদ্ধি যায় ঘুচে। ডোবা-পুকুর নদীনালার বিশেষ বিশেষ আধারে প'ড়ে বিকৃতি তার বাড়ে কমে। চিরকালই তেমনি প্রেরণাতে থাকে ধর্মের অকৃত্রিম আদর্শের রূপ—ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তার বিশেষ বিশেষ বাস্তব বিকৃতি।

মূল ধর্মের নীচেই রয়েছে স্থূলতর বাস্তব প্রয়োজনে সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি কেজো ব্যবস্থাতন্ত্র বা আচার-বিচারের উপধর্মগুলি। বাস্তব অবস্থার উপর যুক্তি, তর্ক, স্তরভেদ, গাণিতিক গণনা, ভোট—কত কি রয়েছে এই সব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাধারা, ভৌগোলিক সংস্থান এবং খাদ্যাখাদ্য, আবহাওয়ার উপরেও তার নীতিবৈচিত্র্য নির্ভর করে। মানুষের এই সব ব্যবস্থাতে যতই খুঁটিনাটি এবং ত্রুটি থাক্, মূলে সবই সেই ধর্মপ্রেরণার সঙ্গে সংগত হয়ে চলবে, তবেই প্রমাণিত হয় তার মূল্য; তবেই হয় সবদিকে মঙ্গল।

মূল ধর্মের মান এখনও প্রত্যেক ধর্মে ঠিকই আছে। কিন্তু নানা দেশ ও সমাজের উপধর্মগুলি তার কাছে পৌছতে পারছে না। পৌছবার চেষ্টা চলছে সেই কত না পথে।

পৃথিবী যত দিন একান্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে উপায়েই হোক, তত দিন উপধর্মের আধিপত্য চলতে পেরেছে, বাধা পায় নি কোথাও। পরে দেখা গেল, বিস্তৃততর পৃথিবীর আদান-প্রদানের কর্মক্ষেত্রে এসে বেধে গেল তাদের মধ্যে প্রবল সংঘাত। এই সংঘাতে পৃথিবী জর্জর। সংঘাত যেখানে নেই সেখানেও জানা নেই—কবে কোন্

অছিলায় নিদ্রিত সর্প ফণা তুলে উঠবে। মূল ধর্মের বিশুদ্ধির প্রতি তত দৃষ্টি নেই, উপধর্ম বনাম যত 'ইজ্‌ম্'-এর জয় নিয়েই সবাই রণে মত্ত। এখন কারো ধর্ম মন্ত্রে তন্ত্রে, ভাতের হাঁড়িতে; কারো ধর্ম কোর্‌বানি আর কল্‌মাতে; এ ছাড়া আরও ধর্ম আছে—জাতীয় রক্তের শুদ্ধি রক্ষায়, অতলান্তিক সনদে, শ্রেণী-সংগ্রামিক নববিধানে।

এই করে দিনে দিনে সমাজের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ক্রিয়াকাণ্ড এবং আন্দোলনগুলিই এখন ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছে। এমন কি, প্রত্যেক ধর্ম পরিচিত হচ্ছে রাষ্ট্রিক, সামাজিক নামে। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে, ধর্মসাধনার নূতন একটি ইঙ্গিত করলেন সাংস্কৃতিক যোগের দিকে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা—নানাবিধ বিষয়ের চর্চা এ পথের ক্রিয়াকাণ্ড।

কিন্তু শুধু জ্ঞান-সঞ্চয়, জ্ঞান-বিস্তার বা তার আনুষঙ্গিক নানা কর্ম করাই ধর্মসাধনার সব নয়। ধর্মের প্রধান সার্থকতা মানবপ্রীতিতে। কবি তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে 'শান্ত শিবমদ্বৈতম্' রচনাটিতে বলছেন, "আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।...শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয় কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ।"

সাধারণত নিজের প্রতি মমত্ব-বোধ থেকেই আমরা স্বার্থের পূজা করি। নিজের বেদনা দিয়েই পরের বেদনা বোঝা আমাদের উচিত ছিল। এই সহজ যুক্তির পথ ছেড়ে স্বার্থ যেখানে বিকৃতির পথে ধাবিত, সেখান থেকেই সংসারের

যত কিছু বিদ্বেষ বিরোধের সৃষ্টি। কিন্তু শুধু যে পরের স্বার্থেই আমরা বিমুখ তা নয়, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধেও আমরা অনেকে জড়তায় আলস্যে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি। একের কাছে অন্যের স্বার্থের স্বীকৃতির জন্যই বাধে সংগ্রাম। কিন্তু মনে রাখা চাই, সে স্বীকৃতি পরের কাছেই শুধু নয়, নিজের কাছেও দরকার, কারণ আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থের বোধ জাগ্রত ও সুস্পষ্ট নেই বলেই দশ জনের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে এক জনের স্বার্থবুদ্ধি অত্যুগ্র হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছে। সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যেই আছে প্রকৃত শান্তি।

স্বার্থের স্বীকৃতি চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। সে স্বার্থ নিজের এবং পরের। তাঁর আহ্বান মানব-বোধের কাছে। তিনি সাংস্কৃতিক পথের ঐতিহাসিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাচ্ছেন, মানুষের আদরের জিনিস হয়ে কালের দরবারে যা টেকে, তা বৈষয়িক প্রভুত্ব বা হিংসা-দ্বন্দ্ব-খ্যাতি নয়; আত্মউদাসীন বা আত্মসর্বস্ব স্বার্থ, এ দুয়ের কোনোটাই নয়; টেকে মানব-বোধের বিষয়গুলি। মানুষকে দূর কালের দূর দেশের মধ্যে দেখে দেখে সেই বোধ যে কেমন করে জেগে উঠে, নিজের ক্ষেত্রে তার একটি দিনের উপলব্ধির কথা, কবি লিখেছিলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে। "খ্যাতিভোলা দিন" এই শিরোনামযুক্ত পত্রখানি ১৩৪৭ সনে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

কবির খ্যাতিভোলা এই বেদনাবোধের প্রসার হলে জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে। বৈষয়িক ব্যবস্থানীতি এবং আচরণও সেই অনুযায়ীই সংশোধিত হবে। তা স্বার্থদ্বন্দ্বহীন হবে, সর্বকালের সর্বলোকের স্বার্থের জিনিস হবে। তখনই সবকিছু তার সত্য ও স্বাভাবিক পরিণতির পথ পাবে। তখন সকলের মধ্যে যে মন্ত্রের উপলব্ধি জাগবে, সেইটিই কবির মতে সত্য-ধর্মের মন্ত্র "সোঽহং"। বর্তমানেরই জীবনযাত্রাকে সমবেদনায় স্নিগ্ধ ও সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য পুরাকালের প্রতি এই যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিঅনুশীলন, এইটিই ছিল কবির বিচিত্র সাধনপথের শেষদিক্‌কার একটি ইঙ্গিত।

(৪)

এই চিন্তা ও কর্মগত পটভূমিকার উপরেই রবীন্দ্রনাথের "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"-এর সাধনা প্রতিষ্ঠিত এবং সেভাবেই তাকে দেখতে হবে। তা হলে হয়তো বোঝা অনেকটা সহজ হবে, কী উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বভারতী গড়েছিলেন এবং কী অর্থেই বা তার আদর্শঘোষণাপত্রে কবি লিখেছিলেন,—

"And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science, and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, and other civilisations may be pursued along with the culture of the West, with true spiritual realisation, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the one Supreme Being who is Santam, Shivam, Advaitam."

এই মন্ত্রটি মহর্ষিদেব উপনিষদ্ থেকে আহরণ করে তাঁর উপাসনা-পদ্ধতিতে সমাধানের মন্ত্রের শেষ পঙ্‌ক্তি রূপে রেখেছিলেন—

সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

এই মন্ত্রে তাঁর আরাধনা যেন পূর্ণতালাভ করেছে; শান্তিনিকেতনে তাঁর সাধনা-বেদীর উর্ধ্বে তিনি সেইজন্যই লিখিয়েছিলেন এই মন্ত্র।

তার পরে একদিন এল মহর্ষির সেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার ক্ষণ। মনে কী ব্যাকুলতা ও চিন্তাভার নিয়ে কবি সেদিন এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েছে নানা স্থানেই। একখানি পত্রে তিনি লিখছেন :

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম।...এখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র পূর্ব্বের চেয়ে আরও অনেক বিস্তীর্ণ হইয়াছে সে কথা শুনিয়াছেন। হয়ত দুঃসাহসের কাজ করিয়াছি—বিশেষত আমার এই কাজে দেশের লোকের সম্মতি ও সহায়তার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতেছি আমার ভাগ্যে দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস মৃত্যুর পূর্ব্বে বিরামের কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে না।

অবকাশ মত কখনও কখনও আশ্রমে আসিয়া যদি দেখা দিয়া যান তবে আমরা সকলেই আনন্দলাভ করিব। ইতি—৬ই বৈশাখ ১৩২৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রখানি শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ মহাশয়কে লিখিত।

প্রমোদবাবু তখন কুচবিহার স্কুলের শিক্ষক। ইতিপূর্বেই কবির আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকমণ্ডলীতেও একবার যোগদান করেছিলেন। মধ্যে কিছুদিন অন্যত্র ছিলেন। সেই সময় এ চিঠি লেখা। শান্তিনিকেতনের সেবাতেই তাঁর বাকী কর্মজীবন কেটেছে। অধ্যাপনার সঙ্গে কবির জীবদ্দশায় এক সময় তিনি স্কুল বিভাগের (পাঠভবনের) অধ্যক্ষ এবং আশ্রম সচিবের দায়িত্বও পালন করেন।

কবির "প্রয়াস মৃত্যুর পূর্বে বিরামের কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়নি",—এতদিনে তা উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এল।

শুধু রাষ্ট্রের উপর বা ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে ভার দিয়ে হাতপা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের সাহায্যার্থে সকলকেই তৎপর হতে হবে। বিশ্বভারতীর আদর্শ, কর্মব্যবস্থা, আর্থিক ভিত্তি, কর্মী ও শিক্ষার্থী, সকল বিষয়ই দেখবার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, এটি একটি আশ্রম, কবির আদর্শ-সাধনপীঠ।

সুতরাং এর দায়িত্ব বহু রকমের। দেশবাসীকে সারাক্ষণই মনে রাখতে হবে তাঁদের প্রতি কবির সেদিনকার উদ্বেগপূর্ণ উপরোক্ত বাণী।

যদি একটু 'বিরামলাভের' অবকাশ কোন দিকে আজ ঘটে থাকে, তবে সেই অবকাশে আমরা যেন দেখি, একদিন এ প্রতিষ্ঠানের জন্য কবি কী করে গেছেন। তার আনুপূর্বিক ইতিহাস এখনই উদ্ধারের প্রয়োজন।

বিশ্বভারতীর সরকারী প্রতিষ্ঠা

বিশ্বভারতীর সরকারী প্রতিষ্ঠা

ছুটির আশ্রম। লোকজন, ছাত্র-ছাত্রী রোজই দলে দলে চলে যাচ্ছে চারদিক ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ নিরিবিলি হয়ে আসছে। শান্ত অবসরে আশ্রমের একটি অপরূপ সত্তা আত্মপ্রকাশ করছে।

শান্তম্‌-কে দেখেছি। দেখেছি উষার ললাটে শুক-তারায়,—ধূমল হিম আবরণে ঘেরা, শরতের কাশের শুভ্রতায়। আর অনুভব করেছি শুচিশুভ্র ঝরা-শিউলির সৌরভে। ধীরে ধীরে জ্যোতি-রেখা দীপ্ত হয়ে উঠছে। শিহরণ আনছে সারা দেহে-মনে। পাখীর কল-ঝঙ্কারে জয়গীতি বেজে উঠেছে, ঘণ্টারবে আহ্বান উঠছে জাগরণের,—বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, এক যুগ থেকে আরেক যুগে প্রভাতের সেই এক শান্ত মূর্তি।

এ শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের প্রভাতের রূপ। আজও দেখছি, কতদিন দেখেছি। আশ্রমিকগণ বের হতেন প্রাতভ্রর্মণে। বাইরের প্রকৃতিতে দেখতেন এই 'শান্তম্‌'কে আর দেখতেন উত্তরায়ণের বারান্দায় স্তব্ধ শান্ত সমুজ্জ্বল মূর্তি, বাহিরে-অন্তরে 'শান্তমে'রই অপূর্ব উপলব্ধি নিয়ে বসে আছেন আশ্রমের 'গুরু দব'।

ভোরের আবছায়ায় উপাসনা দ্বারা স্থিরচিত্ত হয়ে কাজে যেতেন সবাই; দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলার উপাসনায় আবার সেই 'শান্তম্‌'কে প্রণতি জানাতেন গভীরভাবে। 'শান্তম্‌' এমনিভাবে তার সুন্দর এবং কল্যাণরূপ নিয়ে চিরদিন আশ্রম-প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত রয়েছেন, স্থির রয়েছেন অন্তরে অন্তরে। এটি হচ্ছে শান্তিনিকেতনের স্বভাব-চিত্র; এ সম্বন্ধে বেশিকিছু বলাই বাহুল্য। এটি উপলব্ধির বিষয়।

শান্তিনিকেতনের আরেক রূপ রয়েছে সম্মুখে। তারও নানা কথাই ফাঁকে

ফাঁকে মনে না পড়ে যায় না। কথাগুলো আজ অনেকেই হয়তো ভাবছেন। বিশ্বভারতীর সরকারী উদ্বোধন হল। উৎসবে ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' এ মন্ত্র আইনের রাজ্যে গেল কি রইল, সে কথাটা বড়ো নয়। আশ্রমিকগণ তাকে এখানকার জীবনের মধ্যে চিরদিন যেন রক্ষা করেন। গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে পছন্দসই কথাটি হচ্ছে—'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'। আশ্রমের এই আদর্শ-ই হবে প্রধান। শিক্ষামন্ত্রী যদিও মৌখিক ভাষণে জোর দিয়েই বলেছেন, আমাদের অন্তরে সব সময়ে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'কে অম্লান রাখতে। কিন্তু লিখিত ভাষণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি বলেছেন, 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্' আদর্শকেই ব্যবহারে প্রচলিত রাখতে হবে। ভাষণের তৃতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে,— "I will appeal to every one of you that whenever you have any function you will never forget to start it with this proclamation of faith in the unity of mankind".—কারণ, এ মানব-ঐক্যের মন্ত্র।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, নানা অশান্তিতে উন্মত্ত বিশ্ববাসীর সকলের মধ্যে এই মন্ত্রগত আদর্শকে সঞ্চারিত করাই তো ভারতের প্রধান কাজ। নয় তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা,—সে-সব নিয়ে ভারতে এবং বিশ্বে যথেষ্ট লেন-দেন হয়ে গেছে, বর্তমানে কোনো দেশই এ-সব বিষয়ে পিছিয়ে নেই। ভারত স্বকীয় যা দিতে পারে এবং চিরদিন দিতে চেয়েছে, সে হচ্ছে এই 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। রাজনীতি শান্তি স্থাপন করতে অক্ষম হয়েছে, কূটনীতি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। এখন একমাত্র ভরসা এই আদর্শ। এই মন্ত্রের সাধনা মুখ্য করেই শান্তিনিকেতন এখনো 'আশ্রম' হয়ে আছে।

আজ কেউ-কেউ মন্ত্রটিকে মনে করছেন শুধু তিনটি শব্দের জোড়া-তাড়া একটা-কিছু। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য তাঁদের কাছে বাজে কাজ। আসল কাজ করবার এখন নাকি হাজার-কিছু পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের কাজের দৌড়কে একদিকে যেমন স্থলবিশেষে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর Hurdle

race-এর (হার্ড্‌ল্‌-দৌড়ের) উপমাটাও আশা করি অনেকে ভোলেন নি। কাজের দৌড়ের ঠোকা-ঠুকিতে আধুনিককাল উদ্ব্যস্ত হয়ে উদ্বাস্তু হলো। তাদের জন্যই 'Philosophy of Leisure' বক্তৃতার প্রয়োজন হয়েছিল। গানের সমের মতো 'শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌'কে রেখেছিলেন তিনি মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সম্মুখে ধরে। মানুষের সবকিছু কাজের সেই হবে বিশ্রাম ও নবারম্ভের শক্তি-কেন্দ্র। বারে-বারে মানুষের এই যাত্রাশেষ ও যাত্রারম্ভের লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম! ততঃ কিম! যেনাহং নামৃতা-স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌।—ইত্যাদি বাণীতেই সে প্রশ্ন কালে কালে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে! সেদিনের বিপুলায়তন কাজগুলি কালে কালে চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে না,—কিছুই তার নেই, আছে মাত্র ঐ মন্ত্রগুলি। কিন্তু তাই দিয়েই এক-একটা যুগের এক-একটা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার আজ মৌলিক পরিচয়; ওই কথাগুলিই বলে দিচ্ছে সেদিনের হাজার লোকের হাজার কাজের উদ্দেশ্য কী ছিল, সার্থকতা কিসে ছিল। এইজন্যই আজো আমাদের জানতে হবে, সকল কাজ একদিকে, আর, নবযাত্রার প্রারম্ভে কাজের আদর্শটির উপলব্ধি হচ্ছে আরেক দিকের বিষয় এবং সেটি প্রধান বিষয়।

শুধু ক'টি কথার মারপ্যাচ বলে যাঁরা এই দিককার গুরুত্ব হ্রাস করতে চাইবেন, তাঁরাই যে সব ঠিক করছেন তারই বা ঠিক কী?

সৃষ্টি ও সমবায় হচ্ছে বিশ্বভারতীর মুখ্য কাজ। একলা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে পুষ্টিলাভ করার পরে সে-কাজ কতদূর এগিয়েছে, খবর নিতে হলে এদিক দিয়েই নিতে হবে। বহু বিষয় ও লোকজনের সংগ্রহের পরিচয়ই সব নয়; তারমধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে কর্মীরা স্বাধীন সৃষ্টির পথে কতদিকে কত সমৃদ্ধি সাধন করেছেন এবং তার দ্বারা শান্তি, কল্যাণ ও একতার ভাবে বিশ্ববাসী কতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছে সেটাই হবে বড়ো কথা। সেটা যে পরিমাণে না ঘটবে, সেই পরিমাণেই কাজের ব্যর্থতা। 'শান্তম্‌ শিবম্‌' মন্ত্র আমাদের সেই সার্থকতার মাপকাঠিকেই প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক কর্মীর মনে সুস্পষ্ট করে

রাখবার মন্ত্র। আজ এ যদি স্তিমিত হয়ে থাকে, তবে যতই কাজ বাড়ুক, সে কাজের সমস্ত জৌলুস বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার চারপাশে সেই পরিমাণেই আঁধি সৃষ্টি করবে মাত্র।

সেদিনকার ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী আজাদ বার বার করে বলেছিলেন, 'শান্তম্ শিবম্' মন্ত্রটিকে এখানকার পাথরে পাথরে খোদাই করে রাখতে হবে, তাকে গাছে গাছে লিখে রাখা চাই ; আশ্রমের প্রত্যেক উৎসবে-অনুষ্ঠানে এই মন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে, কোনোক্রমেই যেন কোনখান থেকে এ মন্ত্র বাদ না পড়ে'। তিনি বোধ হয় জানেন না এবং শুধু তিনি নন, দেশবাসী কম লোকেই জানেন, আশ্রমের পাথরে পাথরে এখন না থাকলেও আশ্রমের ছাতিমতলার বেদির ঊর্ধ্বদেশে ফলকে এককালে লেখা থাকত এই মন্ত্র। সেই বীজ-মন্ত্রকে ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করাই বিশ্বভারতীর প্রধান দায়িত্ব। লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া নয়, গভর্নমেণ্টের কাছেও দরবার করা নয়, তার আপন সৃষ্টির দ্বারা, কাজের দ্বারা, প্রকাশের দ্বারা মন্ত্রকে প্রকট রাখতে হবে। তা ছাড়া অন্য যা কিছু, তাতে অনন্যসাধারণ কিছু থাকলেও তা এমন-কিছু নয়, যার জন্যে একটা 'আশ্রম' আবশ্যক, কি কোনো বিশেষ বিধানের আবশ্যক, বা অর্থবৃষ্টির আবেদন করা চলে। কারণ স্কুল-কলেজ, ছাত্র-ছাত্রী বা লোকজন, কল-কারখানা দেশ-বিদেশে হাজার হাজার পড়ে আছে। ঠাটে তারা আরো বড়ো, কাজের পরিমাণও তাদের আরো বেশি।

মনে রাখা চাই, কতকগুলি অতুলনীয় প্রতিভা অথবা কতকগুলি বিস্ময়কর গুণী বা বিদ্বানের দ্বারাই শান্তিনিকেতনের সার্থকতা আসবে তা নয়,—তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন চরিত্র-সৃষ্টির। এখানকারই বাণী—বাঙ্গালীর প্রতিভার অভাব তত নেই, যত বড়ো অভাব চরিত্রের। শুধু বাঙ্গালী নয়, মানব-সাধারণের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। সংযম, সাধুতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা, প্রেম ও সেবায় একচিত্ত হয়ে ক'টা কাজের পরিচয় আমরা দিয়ে থাকি, তাই নিয়ে চারিত্রিক উৎকর্ষের পরিচয়। আমরা আশ্রমের যোগ্য হব, জাতির এক-একটি অক্ষয় ভিত্তি-

স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াব,—আমাদের সেই চরিত্রের আলোতেই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' জীবনে-জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে বিরাজ করবে।

ভালো হল। এইভাবে মন্ত্রটিকে নিয়ে আলোড়ন ওঠাতে একটা বিশেষ লাভ হল এই যে, বিশ্বভারতী এ-মন্ত্র, অর্থাৎ স্বীয় আদর্শ সম্বন্ধে, নূতন ক'রে আরো সচেতন হলেন। যে-মন্ত্র নিহিত রয়েছে প্রাণে, তাকে কাজে সাধারণের সমক্ষে জাগ্রত রাখার দায়িত্ব এ থেকে আরো বৃদ্ধি পেল।

মহর্ষিদেবের সাধন-মন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথের কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দি'য় বিশ্বের মন্ত্র হতে হবে, সমস্ত ভারতবাসীই যেন সে বিষয়ে সচেতন থাকেন। কারণ, বিশ্বভারতী ভারতেরই বিশ্ব-রূপের প্রকাশ।

শেষ কথা, 'বিশ্বভারতী' নামটি। ওরি ভিতরে ধারা রক্ষার গুরুদায়িত্ব ইঙ্গিতে চাপানো আছে। সেটিও আজ ভালো করেই বুঝে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-'বিদ্যালয়' নাম দেননি, দিয়েছেন বিশ্ব-'ভারতী'—বিশ্বের জন্য বাণীর উৎস এখানে। এর বৈশিষ্ট্য যে ভারতের অন্যান্য ২৯টি গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, একথা সরকার পর্যন্ত সেদিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং সে বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা নিয়ে তাঁরা যে চিন্তা করছেন তাও বলেছেন শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব। কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্য কোথায়, সে-বিষয়ে শিক্ষার প্রণালী ও সাধনার আদর্শ এই দু' বিষয়েই সকলের অবহিত থাকা চাই। কবি বলেছেন,—"বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না, তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এতদিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।" (১৩২৬)

বলেছেন,—"বিশ্বভারতীকে আশ্রয় ক'রে একটি বাণী এসেছে তাকে কার্যে

পরিণত করতে হবে, জীবনে ব্যবহার করতে হবে, সে বাণীকে আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে আমাদের চিত্তকে অনুকূল করতে হবে;···অব্যক্ত বাণী মানুষের ইতিহাসে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়, সে কোনো বিশেষ যুগের নয়, সে সর্ব যুগের।···মানুষের ইতিহাসে একমাত্র যে-কথাটি চিরদিনই আছে আজকের যুগে সেই চির যুগের চিন্তাটি সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে হচ্ছে এই যে, মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যেই সার্থক। এই সত্য ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে।" (১৩২৯)

'বিদ্যা'র স্থলে 'ভারতী' শব্দটি গ্রহণে সূচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাম্য সেই সংস্কৃতির বাণী, সেই মানব-মিলনের আদর্শ যা বিশ্বের মধ্যে বিস্তৃত, কিন্তু যার ভিত্তি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর। এখন ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা কী তা আলোচ্য।

দ্বিধাশূন্যভাবে আমাদের জানতে হবে, সেটি আস্তিকতা। একটি সর্বব্যাপী অখণ্ড সত্তার বিচিত্র বিকাশ এই বিশ্ব,—এই তার মূল তত্ত্ব। নাস্তিকতা এ সত্তারই অন্তর্গত একটি অপূর্ণ স্তরবিশেষ। তাকেও একদিন এই অখণ্ডতায় পূর্ণতা লাভ করতে হবে,—এই অর্থেই তারও বৈশিষ্ট্যটিকে একটি মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। ম্লেচ্ছ, যবন কতকগুলি শ্রেণীবাচক শব্দ মাত্র। কারো প্রতিই কোনো অন্যায়ের কথা ভারতীয় শাস্ত্রে লেখে না। সমদৃষ্টি তার সর্বোচ্চ সাধনা। তার মধ্যেও ইতিহাসে যে সাম্প্রদায়িক অন্যায় অবিচারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা সাময়িক এবং তা ভারতীয় সংস্কৃতিবান সমাজে নিন্দিত। রাজনৈতিক স্বার্থ-সংঘর্ষ ধর্মের অঙ্গ করে দেখার বিষয় নয়। বড়ো আস্তিক দৃষ্টির সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও প্রেমের আলো জনসাধারণেরও মণি-কোঠায় তলে তলে প্রজ্বলিত ছিল বলেই-না ভারতে অহিংস আন্দোলনের প্রসার এবং তার থেকে আমাদের এই নূতন সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, সে কথাও নিশ্চয়ই এস্থলে আমাদের স্মরণ করতে হবে। ভারতের সেই সার্বভৌম আস্তিকতাকেই রবীন্দ্রনাথ আরো সার্বজনীন ব্যবহারে আনবার পথ করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। এজন্য সে আস্তিকতা তার মৌলিক বেদ-উপনিষদ্গত উদার মানবতার রূপ

পেয়েছিল আধুনিকতায় লৌকিক ও পৌরাণিক পৌত্তলিকতা ছেড়ে। আস্তিকতার সেই বিশ্ব-মানবীয় ব্যাখ্যা মেলে কবির 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। সেই ধর্মের ব্যাবহারিক রূপ তাঁর এই বিশ্বভারতী।

কেবল মুক্ত বায়ুতে অধ্যাপনা, নৃত-গীত, সভা করা, ছবি আঁকা, নাটক করা ইত্যাদিতে বিশ্বভারতীর সবকিছু পর্যবসিত নয়। এর বিশ্বনৈতিকতার উৎস যে-সাধনায়, তা 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতমে'র সাধনা। আধুনিক কালে তার প্রেরণা থেকেই পেয়েছি আমরা 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাণীটি। শান্তি, কল্যাণ এবং একতা-র অখণ্ড একটি ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও ব্যবহার অভিসিঞ্চিত থাকলেই সেখানে সমস্ত বিশ্বের নীড় সৃষ্টি হতে পারে, তার মিলিত প্রভাবই স্বভাবতঃ সে নীড়কে সৃষ্টি করে। কিন্তু আইন-কানুনে এই দুটি মন্ত্রই অস্বীকৃত ও অনুল্লিখিত হওয়ায় কর্মীদের কর্মেও এ দু' মন্ত্রের প্রভাব শিথিল, এমনকি অচল হতে পারে, এমন সম্ভাবনা কিছু রয়ে গেল। সেদিকে যেন আমরা সচেতন থাকি।

'যত্র বিশ্বং' মন্ত্রটি সকলেরই প্রিয়। দেখা যাচ্ছে, আধুনিক কালে এইটিই অনেকটা সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এবার এই মন্ত্রের ইতিহাসটি দেখা যাক। এরও অন্তরের কথাটি কিন্তু 'অদ্বৈতম্'ই। তবে প্রত্যক্ষত এটি আস্তিকতাবাচক নয় বলে এর অনুরাগীর সংখ্যা বেশী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা একান্তভাবে এটিকেই চান তাঁরা কি জানেন যে, বিশ্বভারতী স্থাপনের দিনে ভারত-ঐতিহ্যের এই বৈদিক মন্ত্রটি সংগ্রহ ও গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন পরম নৈষ্ঠিক রক্ষণশীল সমাজের একজন ঈশ্বরবাদী হিন্দু। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি তাঁরই লেখা 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি। গুরুদেবের প্রয়াণের দু' মাস বাদে তিনি ১৩৪৮ সনের আশ্বিনের প্রবাসীতে ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন: "আশ্রমের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণে দ্বিজেন্দ্রনাথ।

ইহা মনে করিয়া ভাবিতাম হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। এই আর্যাবর্তের মধ্যে যে সংস্কৃতির উদ্ভব, তাহা অনন্যসাধারণ।

"আশ্রমটি ক্রমশঃই বড় হইয়া উঠিল। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইল। গুরুদেব মূলতঃ ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান নাই। উহা ছিল তাহার বাহ্য রূপ। তিনি বিশেষভাবে উহা দ্বারা বিশ্বের সহিত ভারতের যোগ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি যখন 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' এই বেদবাক্যটি তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলাম, তখন তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায় ও আদেশে বিশ্বভারতীর বার্ষিক উৎসব-সভায় তাঁহার সংকল্প-বাক্যের মধ্যে উহা পাঠ করা হয়। কেহ উপহাস করেন, করুন, কিন্তু তথাপি বলিব গুরুদেব সমগ্র পৃথিবীর সহিত বিশ্বভারতীর এইরূপই একটি যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হইত আমরা যেন শান্তিনিকেতনের নামে কোনো পরিচ্ছিন্ন স্থানে নই, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাস করিতেছি। জাতি ধর্মদেশনির্বিশেষে জগতের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। সকলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী। জগতে যাঁহারা সত্য-সত্যই মনীষী, জ্ঞানী ও বিশ্ব-হিতৈষী, তাঁহাদের সহিত ভাব-বিনিময়ে গুরুদেব যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সমগ্র আশ্রমবাসীকে তিনি তাহার ফল উপভোগ করাইয়াছেন। বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকসমূহকে আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার মূল উদ্দেশ্যও ইহাই যে তাঁহাদের সংসর্গে পূর্ব-পশ্চিমের সংকীর্ণতার ক্ষয়ে সত্য ও উদার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। টাকা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না। মনে হয়, প্রধানত নিজের মহিমায় তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও অন্যের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হইত না।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই লেখাতেও পাই রবীন্দ্রনাথ আস্তিক, নাস্তিক কাউকে তাচ্ছিল্য করেন নাই—তাঁর বিশ্বনৈতিকতা ছিল সত্য,—তাতে বিশ্বের সব-কিছুরই একটি প্রাণময় আশ্রয় ছিল। এই পণ্ডিত ব্যক্তি ঈশ্বরবাদী হিন্দু;

সংস্কার-নিষ্ঠার গণ্ডি টেনে শুধু স্বদেশ, স্বজাতিতে তিনি তাঁর সাধনাকে আবদ্ধ রাখেননি,—সহজে তিনি বিশ্বজনের সমাজে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেমন করে সকলকে তিনি আপনার মধ্যে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়' প্রবন্ধে এই কথাটিই বড়ো হয়ে ফুটে উঠেছে। এইটি হচ্ছে শান্তিনিকেতনের 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্" শীর্ষক আস্তিকতার ফলশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ বুঝে তদুপযোগী বেদবাণী চয়ন করে শাস্ত্রীমশায় যে বিশ্বভারতীর সংকল্পবাক্যমালা রচনা করেছিলেন, তার শেষ স্তবকে রয়েছে আস্তিক-নাস্তিক ছাড়িয়েও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত সত্যার্থীদের প্রতি প্রেমালিঙ্গনের এই বাহু-প্রসারণ মন্ত্র ঃ

"সেয়মুপাসনীয়া নো বিশ্বভারতী
বিবিধদেশগ্রথিতাভি
বিচিত্রবিদ্যাকুসুমমালিকাভিরিতি হি
প্রাচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চেতি সর্বেৎপ্যুপাসকাঃ
সাদরমাহূয়ন্তে ॥"

প্রকৃত ঈশ্বরবাদ যে কী এবং সেই ঈশ্বরবাদের পাশাপাশি নিরীশ্বরবাদেরও সসম্মানের স্থান এবং উন্নতির সুযোগ অব্যাহত রেখেই যে হাজার বিচিত্র বিরুদ্ধতার মধ্যেও সুসংহত একের বিকাশ লোকসমাজে পূর্ণতর করে তোলা যায়, এইটি জীবনে দেখাবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বাক্য ও কর্মের সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এই বিশ্বভারতী। গোড়াতেই তাকে স্পষ্ট করে সকলের সম্মুখে তুলে ধরে দিয়ে গেছেন কবি একটিমাত্র কথায় ;—সেই আদর্শ নির্দেশক মন্ত্রটি যে কী, অতঃপর তা আর বলা বাহুল্য। ভারতীয় সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে মানব-সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট এক আদর্শের বাস্তব রূপায়নে ব্রতী হয়েছেন ; রবীন্দ্রনাথ ধর্ম, বিশেষ করে আস্তিক ধর্মকে সম্মুখে রেখেই তাঁর নিজস্ব কর্ম-যোগের দ্বারা বিশ্ব-সমাজকে গড়বার কাজে রেখে গেছেন তাঁর বিশ্বভারতী

প্রতিষ্ঠান। একটির আওতায় গিয়ে আরেকটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়,—এইটুকুই যা বলবার কথা।

একটি বিষয় আমাদের ভালো লাগছে যে, যা হবার হয়েছে; ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় সচেতন রয়েছেন। মন্দের যাতে প্রতিরোধ হয়, তিনি সেই চেষ্টা করে চলেছেন। হিতৈষীদের নানাভাবের সহায়তা, সাধক ও শিক্ষার্থীগণের সেবা, সাধনা সমস্ত জয়যুক্ত হবে,—এই আশা ক'রেই আজ আমরা যাত্রারম্ভে বলছি—শুভমস্তু।

পরিশিষ্ট

এক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র

দুই

শান্তিনিকেতনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ

তিন

নন্দলাল বসু মহাশয়ের মন্তব্য

পরিশিষ্ট

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র

আপনারা সভার সাজ সজ্জা, গান ও নৃত্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বেশ হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আশ্রমজীবনের আরেকটি দিক আমি দেখেছি, যেটি অনেকের কাছে আনন্দদায়ক, সুতরাং উৎসব নামের যোগ্য অন্যদিক দিয়ে।—যেমন অনেক ছেলে সার্কাস করত, সার্কাসের কঠিন tricks বা কসরৎ বা কৌশল দেখাত—যথা আগুনের চক্রের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া। তৎকালে 'দ্বিজেন গুণ্ডা' নামে ছাত্রদলে পরিচিত একটি ছাত্র এই রকম করত। ছাত্রছাত্রীরা ছোরাখেলা শিখত ও দেখাত। তনয়বাবুর কন্যা (এখন বোধ হয় নন্দলাল বাবুর পুত্রবধূ) এ বিষয়ে দক্ষ ছিল। একবারকার ছোরাখেলার প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ তাকে এই মর্মের কথা বলেন—'ওগো বীরাঙ্গনা, কাউকে মেরো না কিন্তু।' আসামের বর্ত্তমান ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌শান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ভাইঝি (রাধামাধব বাবুর কন্যা) একটিও বেশ ছোরা খেলত। রাধামাধববাবু অনেক দিন বাসা ভাড়া নিয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর কন্যার নাম বোধ হয় গীতা। একজন শিক্ষক, নাম বোধ হয়, মনমোহনবাবু, লাঠিখেলা ও নানা রকম কুস্তি শেখাতেন। তাতে ছাত্রদের উৎসাহ ছিল।

জিউজিৎসুও কিছুদিন বেশ চলেছিল।* অধ্যাপকদের মধ্যে গৌরবাবু বেশ শিখেছিলেন আর শিখেছিলেন আজিমগঞ্জের একজন বলিষ্ঠ ছাত্র (স্বর্গীয়

*জিউজিৎসু শিক্ষার্থী ও ক্রীড়াপ্রদর্শকদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা অমিতা-দেবীর ও নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা যমুনা দেবীর এবং শিক্ষক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামও করা যেতে পারে। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনমোহন দের কথা বিশেষ ভাবেই বলা চলে। কারণ, এই সব বিষয়ের প্রধান কর্মী ও সংগঠক তিনিই ছিলেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

পূরণচাঁদ নাহারদের বোধ হয় জ্ঞাতি, নীচু বাংলার ওদিকে থাকতেন)। কবি একবার রায়বেঁশে খেলোয়াড় আনিয়ে তাদের খেলা দেখেছিলেন উত্তরায়ণে (যেখানটাতে প্রতিমা বৌমার বাগান ও রথীবাবুর খাস্ আফিস হয়েছে)।

কবির নাটকগুলির অভিনেতাদের মধ্যে জগদানন্দবাবুও ছিলেন। হয়তো আপনারা তা পরে লিখেছেন। যতটা মনে পড়ে, তিনি লক্ষেশ্বর সেজেছিলেন।

নটীর পূজার প্রথম অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওটি কানে-শোনা Sermon-এর চেয়ে উপদেশের চেয়ে বেশী effective ও impressive। আমার যত দূর মনে পড়ে, ঐ প্রথম অভিনয়ে ফ্রান্সের ও ইটালীর কলিকাতাস্থ কন্সালরা সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁদের দেশেও তাঁরা এমন চমৎকার অভিনয় দেখেন নি।...

শান্তিনিকেতনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ

আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে এসেছিলুম এখানে, সেই এই রকম সময়ে এই আমগাছেরই তলায়। সে সময় আমাদের গুরুদেব যিনি তিনি বলেছিলেন কয়েকটি কথা, ভুলিনি আমি কোনোদিন। আর আজ আমি যে কথা বলব তোমরাও ভুলবে না আশা করি।

গুরুদেব বলেছিলেন, 'অবন, আমি যখন না থাকব, তুমি এসে এদের ভার নিয়ো।' তখন ভয় পেয়েছিলুম, বলেছিলুম তা আমি পারব না, হবে না আমার দ্বারা, তুমি না থাকলে আমি কি আসতে পারব? কিন্তু পারলুম ত, এলেম ত ধ'রে সেই রাস্তা, এসেছি এখানে। এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল কিনা, তাই এমন হল।

এই আশ্রম, এখানে আমাদের জীবন কত দিন কী ভাবে কাটবে কে জানে, তার জন্য ভাবনা নেই, যে কয়দিন চলে চলুক এই ভাবেই। যিনি চলে গেছেন,

তাঁর জন্য শোক ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ধর্মে নিষেধ। তাই ত আমি প্রথম কথাই বলেছি **আশ্রমের উৎসবগুলি যেন বন্ধ না হয়।** উৎসব চাই, মনের উৎসব বন্ধ হলে কাজ চলবে কী ক'রে? এ পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কত লোক আসছে কত লোক যাচ্ছে, দুঃখ ভেবে কী হবে, উপর থেকে তাঁর আশীর্বাদ পড়বে—দুঃখ ভেব না কিছু। অমৃত পরিবেশন ক'রে গেছেন তিনি এখানে, এই জেনে নির্ভয় হও—আনন্দে থাকো। **এই আনন্দলোক হচ্ছে আশ্রমেরই প্রাণলোক।** সে জায়গায় ঢুকতে পাবার চাবি যদি পাওয়া যায় তবে আর ভাবনা কী? সে চাবির সন্ধান আমি জানি। শিল্পী অনেক কিছু পারে, আমি দেখি যদি পারি তোমাদের সে চাবির সন্ধান দিতে।

এক এক সময়ে ভাবি, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। হয় তো এই-ই ঠিক সময়। জেনো, তোমরা সব তাঁরই পরিবার। অত বড়ো মহাপ্রাণের এই পরিবার—তাদের ভার আমি নেব, তাদের আপন ক'রে পাব এত পুণ্য আমার নেই। তবে ভরসা আমার, আশীর্বাদ আছে গুরুর, আর আছে তোমাদের অনুকম্পা।

এই ছায়া এই আশ্রয়নীড়, নিজের হাতে তিনি এই নীড় তৈরি করে গেছেন তোমাদের জন্য। এ যেন না ভাঙে কোনো দিন। তা যদি ভাঙে তবে এত বড়ো দুর্দৈব জগতে আর ঘটবে না। মহাকবির মহাপ্রাণের মানস সৃষ্টির চমৎকারী—এই রূপ, এ যদি মোছে ত সে আমাদের নিজেদেরই দোষে, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাবে।

এ বস্তু রক্ষা করবার একমাত্র উপায়—একপ্রাণ হয়ে এক দিকে এক ভাবে সবাই চলো একসঙ্গে। তবেই ফল পাবে। 'সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং' এই মন্ত্র ধ'রে থাকো। দেখো, তোমরা যাও পারুলবনে, শালবনে, দল বেঁধে যেতে হলে সবাইকে এক হয়ে যেমন যেতে হয় আবার একা একাও যেতে হয়। এই শান্তিনিকেতনে তেমনি একা একাই চলো আর এক সঙ্গেই চলো আনন্দ গেয়ে যাবে। এই স্থানটি থেকে কবি দিয়ে গেছেন আনন্দের উৎসবে মহা আহ্বান

সকলকে সমানভাবে। তাঁর আমন্ত্রণ এ চিরদিনের মতো, ভুলো না কোনোদিন। তাঁর অভাবে আনন্দ পাচ্ছ না তোমরা প্রাণে। জানি তা, বেদনা থাকবে, তা যাবে না কখনও, প্রকৃতিমাতার শীতল হস্ত সে বেদনার উপর পড়তে দাও। এই ত আমি, ভেবেছিলুম আর আসব না এখানে, আসতে পারব না, হয়ত সইতে পারব না বেদনা। সেই এলুম, কী রকম লেগেছে বলতে চাইনে, তবে এসেছি, এসে তবে সইতে পেরেছি, এসে দেখেছি ভালোই করেছি। এসেছি, সইয়ে নিয়েছি অনেকখানি দুঃখ, তবে তাপ দূর হয়েছে।

এখন বয়স নেই আমার যে, গাছ লাগিয়ে ফল খেয়ে যাই। নাই পেলেম ফল, ছায়া তো পেয়েছি। আশ্রমের এই ছায়া হতে কেউ না বঞ্চিত হয় এইটি যেন হয়। আমি যাঁকে সেবা করি, আমার এই দুই হাত জোড়া সেই শিল্প-দেবতার কাজে। তাই সব চেয়েও যে আমার নিকটের জন আজ, গুরুদেব যাঁকে নিজের হাতে তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন সেই রথীই আমার হল দক্ষিণ হস্ত। আর এক হাত আমার এদিকে ক্ষিতিমোহনবাবু, এঁদের উপরে শ্রদ্ধা রেখো, ইতস্তত কোরো না এঁদের মানতে, ঠিক পথে এঁরা তোমাদের নেবেন, নির্ভয়ে থাকো।

নিরানন্দ হওয়া কেন, সেই লোক নেই আর, এ কথা তো মন নেয় না আমার। তোমাদের প্রাণের শান্তি মনের আরাম তাঁর কাছ থেকেই আসবে, আসবে আসবে। আমাদের মাঝে যিনি একদিন ছিলেন তিনি নেই, এ কে বলবে? গানে কথায় যে তাঁরই সুর পৌছচ্ছে, মিলছে এসে যারা আছি তাদের সুরে, উথলে চলেছে অফুরন্ত প্রাণের ধারা। হায়, তোমাদের যে সান্ত্বনা দেব সেই আমিও তো কাঁদি, ভাষা খুঁজে পাই নে তোমাদের শান্ত করবার। কাজে মন দাও, কাজে মন বসাও। এই করতে করতে পেয়ে যাবে মনের বল।

তাই তোমাদের বলি "কাজ করে চলো, রথীকেও বলি কর্মকর্তা ভাই, কাজের মধ্যে ডুব দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের মন্তব্য

তুমি এ কথাটি বলবে, আমার নাম ক'রেই বোলো যে, এই উৎসব অনুষ্ঠান এবং সমগ্রভাবে শান্তিনিকেতনের শিল্পকলা-বিভাগ-সম্বন্ধে এসেছে আমাদের ভাববার সময়। অচিরেই—এখন থেকেই, আমাদের হতে হবে বিশেষভাবে সতর্ক, এই মনে ক'রে যে,—প্রতি জিনিসের আছে দুটো দিক। প্রাণ না থাকলে অঙ্গ অচল, বিদ্যুৎহীন যেমন বিজলিবাতির লাইন। গুরুদেব ছিলেন নিজেই সে প্রাণ,…মানে এ ক্ষেত্রের অনুপ্রেরণা; যে অনুপ্রেরণার থেকে দেখা দেয় নিত্য নতুন মহান সুন্দর 'শিল্প-উদ্ভাবনা', নিত্য নতুন আবেগময় উৎস। তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টি এবং উৎসাহ দিয়ে গুরুদেব সঞ্চারিত করতেন এই প্রাণকে,—প্রতি উৎসব ও শিল্প-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। আমরা যে-ই যত কিছু ক'রে থাকি, গুরুদেবের সৃষ্টিক্ষেত্রে এতদিন কাজ করেছি তাঁরই আনুষঙ্গিক হয়ে অনেকটা নির্ভাবনায়, অনেকটা যন্ত্রের মতো। পরোক্ষে বা অপরোক্ষে আমাদের সব প্রেরণাই এসেছে একরকম তাঁর কাছ থেকেই। এখন তাঁর অবর্তমানে সেই প্রাণকে যদি আমরা আমাদের তপস্যার আগ্রহে নিজেদের ভিতর বহন ক'রে এবং বাইরে বিলিয়ে দিয়ে না চলতে পারি, তবে সব জিনিসটাই হয়ে,—পড়বে যান্ত্রিকতা। প্রেরণায় বড়ো না হয়ে, সবটাই হয়ে পড়বে আঙ্গিক-প্রধান। সেই আঙ্গিকের কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার যার স্থানে কথাকলি, মণিপুরী, অজণ্টা, আর পৌরাণিক তন্ত্র-যন্ত্র ইত্যাদি। এরা সমগ্র দেশে যে আজ পরিচিত, সে শুধু গুরুদেবেরই প্রবর্তিত আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের ফলে। শান্তিনিকেতনের একটি ক্ষেত্রে এনে এক ক'রে এদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছেন গুরুদেব নতুন আবেগে নতুন সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা। তার আগে ক'জনই বা এদের নাম জানত! শান্তিনিকেতনের চিত্র-শিল্প, নৃত্য ও উৎসব ক্ষেত্রের সব সাজসজ্জা ও কাজে কর্মে মুখ্য ক'রে বেশী ক'রে চাই সেই প্রাণের অর্থাৎ আবেগময় উদ্ভাবনার জোগান। আঙ্গিকের জন্য আর সব ক্ষেত্র

পড়ে রয়েছে, আমরা তাদের দান চিরদিনই মেলাব এনে এখানে, আমাদের আশ্রমের সাধনার ক্ষেত্রে এবং তা আয়ত্ত করবার জন্যে সাধনাও করব একান্ত নিষ্ঠায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লোকে চাইবে শান্তিনিকেতনের কাছে প্রতিদিনই পর্বে পর্বে নতুন কিছু সৃষ্টি-প্রবর্তনা; সব-কিছুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সেই আবেদনটি ফুটিয়ে তোলাই যেন প্রধান লক্ষ্য হয় প্রতি উৎসব ও শিল্প-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে। তবেই বলার অধিকার পাব যে, আমরা শান্তিনিকেতনের, যে-শান্তিনিকেতনের স্রষ্টা আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।
